স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী

ও

সাহিত্য-বিচার

ডক্টর জয়গুরু গোস্বামী, এম. এ., পি-এইচ.-ডি.
ভাগবতশাস্ত্রী, ভক্তিবিদ্যাবাচস্পতি
অধ্যাপক, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

শৈলশ্রী লাইব্রেরী
২৩/১ কলেজ রো
কলিকাতা—৯

শ্রীবিমলকুমার মাইতি
শৈলশ্রী লাইব্রেরী
২৩।১ কলেজ রো
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৬

মুদ্রাকর
নিরঞ্জন দাস
নিউ শংকরনারায়ণ প্রেস
৯, কলেজ রো
কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

পরমারাধ্য গুরুদেব—

১০৮ শ্রীমৎ স্বামী সত্যাশ্রয়ী নিগমানন্দ

পরমহংসদেবের শ্রীচরণোদ্দেশে

গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিলাম।

দীন—

জয়গুরু

ভূমিকা

ডক্টর শ্রীমান জয়গুরু গোস্বামী সুখ্যাত গবেষক এবং সাহিত্যশাস্ত্রে পারঙ্গম বলে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে তাঁর দুটি গবেষণা-গ্রন্থ প্রস্তুত হয়েছে, তন্মধ্যে মুকুন্দদাসের উপরে রচিত জীবনী ও সাহিত্যবিচারঘটিত বেশ বড়ো মাপের গ্রন্থটি অনেকে পড়ে থাকবেন। এটিও তাঁর আর একটি পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা-গ্রন্থ। আমি পূর্বেই সেটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম, কারণ তাতে যুগপৎ তথ্যসমারোহ ও সাহিত্যরস পরিবেশিত হয়েছে। সাধারণতঃ গবেষণাগ্রন্থে এই দুই বিপরীত গুণের কদাচিৎ সমাবেশ দেখা যায়। পাণ্ডিত্য তাঁর হস্তামলক, তা তাঁকে কষ্ট ক'রে অর্জন করতে হয়নি। কিন্তু সরস, স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল বাগ্‌ভঙ্গিমার জন্য তাঁর পাণ্ডিত্য কোথাও অতি প্রকট হয়ে স্বাভাবিক সাহিত্য-প্রীতিকে আড়াল করেনি।

সম্প্রতি ডঃ গোস্বামীর আর একটি গবেষণাধর্মী সাহিত্যগ্রন্থ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। তাঁর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে আমি সেই গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছি। বইটির মুদ্রিত ফর্মাগুলি ধীরে ধীরে পড়া শেষ ক'রে মনে হ'ল, আমি আমার পরিচিত কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসকে নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করলাম। ভাওয়ালের এই অভিশপ্ত কবির দুঃখদুর্ভর জীবন আমাকে অনেক আগে থেকেই আকর্ষণ করেছিল। জীবন সম্বন্ধে কখনও হেডোনিস্ট, কখনও এপিকিউরিয়াস্, কখনও ভোগবাদী, কখনও নৈরাশ্যবাদী—স্বল্পশিক্ষিত গোবিন্দচন্দ্র দাসের এই দিক্‌টি আমাকে একদা চমকিত করেছিল। তাঁকে 'স্বভাবকবি' বলা হয়, বোধ হয় কবিত্ব ও কল্পনা তাঁর স্বভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল বলে। তাঁকে চেষ্টা ক'রে বা বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে কবি হতে হয়নি। কবিতা-রচনা তাঁর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক ছিল। একটু বেপরোয়া, প্রখর সত্যবাদী এবং অতিমাত্রায় আত্মসচেতন এই গ্রামীণ কবির ব্যক্তিগত জীবন বড় দুঃখপূর্ণ। সেই দুঃখের হোমানলে তিনি বাসনা-কামনাকে যজ্ঞহবিঃ স্বরূপ অর্পণ করেছিলেন। প্রতিদিনের বাস্তব জীবন, তার আলোছায়ার অসংখ্য চিত্রকল্প, আর একদিকে রয়েছে কল্পনার জগৎ, ভাবের শিল্পমূর্তি। এই দুটি বিসদৃশ ব্যাপারকেও তিনি সংযুক্ত করেছিলেন প্রবল প্যাসনের সাহায্যে। ডঃ জয়গুরু গোস্বামী এই প্রায়-অবহেলিত কবির জীবনী ও কাব্যকৃতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লিপিবদ্ধ ক'রে বাংলা

রোমান্টিক গীতিকবিতার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সংযোজনা করেছেন, এজন্য তাঁকে আমি অন্তর থেকে আশীর্বাদ জানাই।

এই গ্রন্থটি বেশ বিস্তারিত, এতে আছে বারোটি অধ্যায়, আর আটটি পরিশিষ্ট। এই আলোচনার প্রথম ছয়টি অধ্যায়ে কবির ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন-তথ্য সঙ্গতরূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু তথ্য লেখকের নিজস্ব পরিশ্রম-প্রসূত। ইতিপূর্বে সে সব তথ্য লোকচক্ষুর বাইরে আসেনি। কবি দরিদ্র ও অসহায় ছিলেন, প্রবল প্রতাপান্বিত রাজকর্মচারীর সঙ্গে এই নিঃস্ব কবিকে শূন্য হাতে লড়তে হয়েছে। সেদিন বড়ো কেউ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়নি। তিনি সত্য কথা বলেছিলেন, উপদ্রুত প্রজার হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, এ দেশ 'মগের মুল্লুক' নয় তা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। কবি হিসেবে তাঁর স্থান খুবই উচ্চে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ হিসেবে তিনি কত বড়ো, তার যথার্থ পরিচয় এর আগে পাওয়া যায়নি। ডঃ গোস্বামী অনেক দুর্জ্ঞেয় তথ্য পরীক্ষা ক'রে তাঁর কবি-জীবনের স্বরূপ নির্ধারণ করেছেন। এ গ্রন্থের শেষার্ধে কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য কোথায় নিহিত, তা' নিয়ে যে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হয়েছে, তাতে লেখকের সাহিত্য-বিচারবুদ্ধির কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেছে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবি-প্রকৃতি বিচিত্র বলে তাঁর কাব্যালোচনা বিশেষ সতর্কতার অপেক্ষা রাখে এবং বলাই বাহুল্য, লেখক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কবির রোমান্টিক চেতনার রূপ ও রীতি বিশ্লেষণ করেছেন। বহু গবেষণা-গ্রন্থের ভিড়ে এ গ্রন্থটি হারিয়ে যাবে না, তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

কলিকাতা

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ নিবেদন ॥

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ। এই যুগের যুগ-চেতনায় যাঁহারা দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইংরাজী জানিতেন না, কিন্তু তাহা তাঁহার প্রতিভা বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। এ যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় যাঁহারা পুষ্ট, তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে কতখানি প্রাচ্য এবং কতখানি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব পড়িয়াছে, তাহা নির্ণয় করা বড়ই দুঃসাধ্য। কিন্তু স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের (১৮৫৫-১৯১৮) সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে আছে ষোল আনাই এদেশীয়। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী এবং স্বভাবকবি ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে এই উভয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে যাঁহারা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছেন, আশীর্বাদ ও প্রশংসাধন্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন এবং নানাভাবে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়াছেন ; তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রধান এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থের একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে যে আশীর্বাদ-ধন্যে ধন্য করিয়াছেন, তাহাই আমার চলার পথে পাথেয়। তিনি আমার আচার্য। তাঁহার মধুর সান্নিধ্যে ও আশীর্বাদ লাভ আমার জীবনে একটি স্মরণীয় অধ্যায়। এই স্মরণীয় অধ্যায়ে বরণীয় স্মৃতিচারণায় তিনি আমাকে চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছেন।

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস "ভাওয়াল কবি" নামেই বেশি পরিচিত। কারণ 'ভাওয়াল তাঁহার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল তাঁহার প্রাণ'। অবশ্য "মগের মুলুক" এবং "প্রেম ও ফুল"- কাব্য প্রকাশিত হইলে তিনি পূর্ববঙ্গে "মগের মুলুকে"র কবি এবং পশ্চিমবঙ্গে "প্রেম ও ফুলে"র কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই উভয় পরিচয়ে পরিচিত এবং আপনাতে আপনি বিকশিত।' এই দুরূহ কার্য-সম্পাদনে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য ও প্রেরণা দিয়াছেন কবিপুত্র

শ্রদ্ধেয় শ্রীহেমরঞ্জন দাস মহাশয় এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী সবিতারাণী দাস। তাঁহাদের আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

"চারণকবি মুকুন্দদাস" গ্রন্থখানি রচনার সময়েই স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের কথা মনে জাগে। সৌভাগ্যক্রমে তৎকালীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রবীন্দ্র অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের আশীর্বাদ লাভ করি। তিনি উক্ত গ্রন্থে একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়া দেন এবং কথা-প্রসঙ্গে স্বভাবকবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করেন। সেই সময় কবিপুত্র হেমরঞ্জন দাসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটে এবং কবি ৺যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভ করি। ফলে, তখন হইতেই আমি তথ্য ও তত্ত্ব সংগ্রহ করি। এই কার্যে পশ্চিম বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর সহ-সচিব শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রদেব ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তিনি বহুকষ্টে "কস্তুরী" কাব্যখানি সংগ্রহ করিয়া আমাকে যেভাবে উৎসাহ দেন, তাহাতে আমি অনুপ্রেরণা লাভ করি। বঙ্গীয় কীর্তনবিশারদ শ্রীমৎ রুক্মিণীরঞ্জন গোস্বামী, ভক্তিরত্ন ও ভক্তিভূষণ মহোদয়ের নিকটেও আমি উৎসাহ ও আশীর্বাদ লাভ করি। ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থখানির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যাঁহারা শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুরলীধর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুশীল জানা, বিজয়গড়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ অপর্ণা দত্ত, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের সহাধ্যক্ষ শ্রীসমর চৌধুরী, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীঅমলেন্দু বিশ্বাস, অধ্যাপক কৃষ্ণলাল রায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীশঙ্কর দত্ত, ল্যাবোরেটারী অ্যাসিস্ট্যান্ট শ্রীরমেশচন্দ্র বণিক, ল্যাবোরেটারী অ্যাটেণ্ডেণ্ট শ্রীসত্যরঞ্জন রায়, আকাশবাণীর গীতিকার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রাক্তন টাইপিস্ট শ্রীনির্মল চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুযোগ্য স্টেনোগ্রাফার শ্রীদিলীপ গাঙ্গুলী, কবিশেখর কালিদাস রায়ের পুত্র শ্রীজয়দেব রায়, শ্রীখণ্ডের ঐতিহ্যবাহী ঠাকুর পরিবারের শ্রীল নিত্যনিরঞ্জন কবিরাজ, শ্রীল সীতানন্দ ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবনদাসের স্মৃতিভূমি দেনুড়ের সুযোগ্য ভক্ত সন্তান শ্রীভোলানাথ চৌধুরী, বড়বাজারের বিখ্যাত লৌহেতর ধাতু-ব্যবসায়ী শ্রীরামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মতলাস্থিত 'হার্ডসন পেণ্টস' প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা গৌরভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত, অনঙ্গমোহন হরিসভার সেবক শ্রীগোপীমোহন পাল, বনগ্রামস্থিত 'সাধুজন পাঠাগারে'র প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু, 'রবীন্দ্র লাইব্রেরী'র খ্যাতিসম্পন্ন প্রকাশক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং সুযোগ্য সহকারী

শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তী, নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাগচী, তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মী শ্রীদিলীপকুমার ভৌমিক এবং গরফা হাইস্কুলের সহ-প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ হালদার মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। আর এই দুরূহ কার্য-সম্পাদনে নিরলসভাবে সাহায্য করিয়াছেন গ্রন্থের ভবিষ্যৎ স্বত্বাধিকারিণী আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী অঞ্জলি গোস্বামী।

গ্রন্থখানির প্রকাশনায় অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিয়াছেন 'শৈলশ্রী লাইব্রেরী'র শ্রীযুক্ত বিমলকুমার মাইতি, শ্রীরঞ্জিতকুমার মহাপাত্র, সাহিত্যরসিক ও অভিজ্ঞ কর্মী শ্রীযুক্ত চিত্ত দে, শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী এবং নিউ শংকরনারায়ণ প্রেসের সুযোগ্য শ্রীনিরঞ্জন দাস। ইঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টা সত্ত্বেও যে সব ত্রুটি-বিচ্যুতি রহিয়া গেল তাহা সাহিত্য ও গোবিন্দ-অনুরাগী পাঠকেরা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিবেন, আশা করি। এই আশা ও বিশ্বাস লইয়া এবং গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করিয়া শ্রীমধুসূদনের ভাষায় বলি—

"গৌড়জন যাহে—
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

"সত্যাশ্রয়ী নিগমানন্দ"
১০নং নিউ সন্তোষপুর ফার্স্ট লেন,
কলিকাতা-৭৫

জয়গুরু গোস্বামী
অধ্যাপক,
বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ,
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

সূচিপত্র



স্বভাব কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস

প্রথম অধ্যায়

॥ কবি-পরিচিতি ॥

ঊনবিংশ শতাব্দী মহাকাব্যের যুগ হইয়াও গীতিকাব্যের যুগ। এই যুগে বাংলার গীতিকবি ও স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৫-১৯১৮) ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত জয়দেবপুরে[১]

---

১. জয়দেবপুর—নারায়ণগঞ্জ হইতে কিঞ্চিদধিক ৩০ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ ভাওয়াল পরগণার জমিদারবংশের নিবাসভূমি। প্রসিদ্ধ ভাওয়াল মোকদ্দমার জন্য 'ভাওয়ালে'র নাম সকলের কাছে পরিচিত ও পরিজ্ঞাত। এই বংশের স্বনামধন্য ও বদান্য জমিদার বগলানারায়ণ রায় ও রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রমুখ পরোপকারী ও বিদ্যোৎসাহী বলিয়া পরিচিত। ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিরাট অট্টালিকা, মন্দিরগুলি ও এই বংশের শ্মশানের স্মৃতিসৌধ বা মঠগুলি বিশেষ কীর্তিবহ। শুধু তাহাই নহে, ভাওয়ালের অন্তর্গত 'নাগরী' গ্রামে ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত পর্তুগীজদের একটি গীর্জাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় এক সময়ে এই ভাওয়াল জমিদারীর প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। বার ভুঁইয়ার অন্যতম ফজলগাজী ভাওয়ালের অধিপতি ছিলেন। ভাওয়ালের প্রসিদ্ধ জঙ্গল ঢাকা জেলার 'টাঙ্গাইল' মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত 'মধুপুর' জঙ্গলের পূর্বাংশ। ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত সুবৃহৎ 'বেলাইবিলের' বর্গফল ৮ বর্গ মাইল, পূর্বে ইহা একটি নদী ছিল এবং স্থানীয় ভূস্বামী খটেশ্বর ঘোষ ইহা হইতে ৮০টি খাল কাটিলে ইহা ক্রমে বিলে পরিণত হয় বলিয়া কথিত। স্থানীয় লোক-সঙ্গীতেও এই ঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"খাইডা ডোঙ্কা ছিল রাজা মহাতেজা কায়েতের কুলে।
নানা স্থানে স্থানে শুভক্ষণে পুষ্করিণী কাটিল।
'বেলাইবিল' শুষ্ক করি নিজ প্রতাপ দেখাইল।
ভাই অদ্ভুত কাহিনী ॥"

জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা ও মানবতা-বোধের নবজাগরণের মূলে বাঙ্গালী কবিগণের প্রতিভা অতুলনীয়। তাঁহারাই 'স্মৃতি দিয়ে স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা' এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশকে "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত" অভিমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছেন, 'মরাগাঙে' জাতীয়-জাগরণের বান আনিয়াছেন এবং 'নব-ভারতের নব-জাগরণে'-র ডাক দিয়াছেন। ফলে শৌর্যে-বীর্যে-জ্ঞানে-গরিমায় সাধনা-আরাধনায় বাঙ্গালীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ইতিহাসে এই গৌরবময় অধ্যায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। জীবনে যখন জাগিয়াছে মর্ত্যপ্রীতি ও মনুষ্যপ্রীতি, সাহিত্যে তখনি পড়িয়াছে তাহার প্রতিবিম্ব। এই দিক হইতে দেখিতে গেলে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মধু-হেম-নবীনচন্দ্র, 'ভোরের পাখী' বিহারীলাল, শতাব্দীর কবি রবীন্দ্রনাথ, 'ছন্দের যাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ, কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল, 'ভারতের শেক্সপীয়ার' গিরিশ ঘোষ প্রভৃতি দিকপাল কবি ও সাহিত্যিকগণ যেমন অতীতের অধঃপতিত ও আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীর দেহে-মনে-প্রাণে নব-উদ্দীপনার সুর জাগাইয়া ঐকতানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি কবি গোবিন্দ-দাস গণ-দেবতার জাগরণের জন্য, ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য নূতন সুরে, নূতন ছন্দে ঘুম-ভাঙ্গানির গান গাহিলেন। এই সুর-স্বাতন্ত্র্যের জন্যই কবি গোবিন্দদাস "স্বভাবকবি" রূপে বাংলাসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্ব হইতেই এই গোবিন্দদাস দেশাত্মবোধক মহামিলনের বাণী প্রচার করেন। আবেগের তীব্রতা ও সুগভীর জীবনবোধের আন্তরিকতাই তাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক কথায় তাঁহাকে বলা চলে—স্বভাবকবি ও স্বদেশ-প্রেমের মহাকবি।

বাংলাসাহিত্যে নব-জাগরণের মঙ্গল শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাই—

ষোড়শ শতাব্দীতে প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-র[২] আবির্ভাবে এবং উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে। ফলে যে সাহিত্যে এতকাল 'কানু ছাড়া গীত' ছিল না, সেই সাহিত্যে দেখা গেল—'মানুষ ছাড়া গীত' নাই, অর্থাৎ "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই।" শুধু তাহাই নয়, "কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা" ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং "দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা"র মধ্য দিয়া সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আর নিখিলের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না স্মৃতি বিজড়িত প্রীতি 'একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে সকল প্রেমের স্মৃতি'। তাই দেখি, দেবীর কাছে খেয়া-ঘাটের পাটনীর প্রার্থনা—রাজ্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, মুক্তি বা মোক্ষ নয়, শুধু "আমার সন্তান সুখে থাকে যেন দুধে ভাতে।" স্বর্গ মানুষের আকাঙ্ক্ষিত হইলেও ইহা কল্পিত। আর মুক্তি বা মোক্ষ স্বয়ং ভগবানই চান না—"আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে।" এমনি একটা সচেতনতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিবে এমন একজন কবির কথা, যাঁহার জীবন ঘটনা-বহুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, সারাজীবন দুঃখ-দৈন্যের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, অথচ আত্মপ্রত্যয়ে

২. শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু—১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাসন্তী সন্ধ্যার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শচী দেবী। বাল্যকালে 'নিমাই' এবং পরবর্তীকালে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু' নামেই বিশেষ পরিচিত। নবদ্বীপের বিখ্যাত বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন। ইহার দুই বিবাহ—প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। অল্পবয়সেই তিনি 'পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধ হন। গয়াতে গিয়া ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁহার 'মহাভাবের' প্রকাশ হয়। চব্বিশ বৎসর বয়সে কাটোয়ায় গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস ও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম গ্রহণ করেন। অতঃপর হরিনামই চৈতন্যের সার হইল। ফলে "সব অবতার সার, গোরা অবতার"—এই ভাবই প্রচারিত হইল। ১৫৩৩ খৃঃ এই অবতারের তিরোভাব ঘটে।

সমৃদ্ধ। তিনি আর কেহই নন, তিনি হইতেছেন—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস। তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে না পারিলেও কবিত্ব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। শরতের ঝরা শিউলি ফুলের মত তাঁহার ভাব ও ভাষা আপনি আসে আর আপন সৌরভে দশদিক আমোদিত করিয়া দেয়। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবি। 'কবিরে পাবে না কবির জীবন চরিতে'—ইহা সত্য হইলেও কবি গোবিন্দদাসের পরিচয় তাঁহার সৃষ্ট কাব্যের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কবিত্ব শক্তি যেমন ছিল স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি দুঃখ দারিদ্র্য ছিল তাঁহার জন্মগত। "হে দারিদ্র্য! তুমি মোরে করেছ মহান।"—বিদ্রোহী কবি নজরুলের[৩] মত 'দারিদ্র্য' কবি

৩. কাজী নজরুল ইসলাম—প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি—সাম্যবাদের কবি, সর্বহারার কবি। প্রথম যৌবনে 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখিয়া তিনি "বিদ্রোহী কবি" নামে পরিচিত হন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, ২৪শে মে বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি সৈনিক হন। সৈনিকরূপে তাঁহাকে 'নওশেরা', 'করাচী', মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করিতে হয়। ক্রমে ক্রমে তিনি হাবিলদার হন এবং প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের শেষে ১৯২১ খৃঃ দেশে ফিরিয়া আসেন। যুদ্ধযাত্রার পরিবেশে কাব্য স্ফূর্তিলাভ করে এবং তাঁহার অদম্য প্রাণ-শক্তির বলে কাব্যধারা বন্যার আকার ধারণ করে। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে বসিয়াই তিনি মহাকাব্য রচনা করেন। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় সেইগুলির প্রকাশে সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়িয়া যায় এবং অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি যশস্বী হইয়া উঠেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবযুগ' 'ধূমকেতু' 'লাঙ্গল' প্রভৃতি পত্রিকা রাজরোষে পড়িয়া অকালে বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার রচনা, প্রধানতঃ কবিতা, অফুরন্তভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে এবং পরপর পুস্তকাকারে বাহির হয়। সংগীত রচয়িতা হিসাবে তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার রচনা :—'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন'—ছোটগল্প। উপন্যাস—'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা'। নাটক—'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি'। কবিতাগ্রন্থ—'অগ্নিবীণা', 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট',

গোবিন্দদাসকে মহান করিয়াছে কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার কাব্যকে যে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যে উন্নীত করিয়াছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তিগত জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা, মর্মভেদী হাহাকার, বঞ্চিতবুকে পুঞ্জীভূত বেদনার এইরূপ মার্মিক প্রকাশ শুধু শতাব্দীতে নয়, পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীতেও বিরল বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে না। কাব্য-জীবনের পাশাপাশি বিরাজ করিয়াছে কবির সমাজ-জীবন-সাহিত্য। তাই তাঁহার দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত জীবনের ঘটনাবলীর সহিত পরিচিত না হইলে তাঁহার কাব্যের তাৎপর্য সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাইবে না। কারণ তাঁহার কাব্য-প্রেরণা আসিয়াছে দুঃখের পঞ্চ প্রদীপ হইতে। সেই পঞ্চদীপের পঞ্চারতির মধ্যেই কবির জীবন-দেবতা উজ্জীবন মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহাই কবির কাব্য-জীবনের জীবন-রহস্যের জীয়ন-কাঠি।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে ছিল বাংলার সর্বক্ষেত্রে এক নব-চেতনার যুগ। ১৮৫০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী-প্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, শ্রীমধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ দিক্‌পাল সাহিত্যিকগণের প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে একটা প্রচণ্ড গতি সঞ্চারিত হয়। বাংলা সাহিত্যের এই গৌরবময় যুগে এবং গৌরবময় পরিবেশে কবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাব। 'যা কিছু

'বিষের বাঁশি', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'সন্ধ্যা', 'সর্বহারা' প্রভৃতি। ১৯৬০ খৃঃ তিনি ভারত সরকার কর্তৃক "পদ্মভূষণ" উপাধিতে ভূষিত হন। প্রায় বাইশ বৎসর পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী থাকিয়া ১৯৬২ খৃঃ ৩০শে জুন নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা দেবী পরলোকগমন করেন। কবির দুই পুত্র—কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ; শেষোক্ত জন কিছুদিন পূর্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। আর ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকা শহরে কবি পরলোকগমন করেন।

স্ববশে তাই তো স্বদেশ'—ইহাই ছিল গণ-জাগরণের প্রত্যক্ষ ফল। কবি গোবিন্দদাস ছিলেন এই প্রত্যক্ষ ফলের পরীক্ষিত অথচ অবহেলিত খাঁটি বাঙ্গালী কবি। কাব্য সাধনায় তিনি ছিলেন অপরাজেয় সৈনিক, সারস্বত সাধনায় নিরলস কবি। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কবি কখনও তাঁহার কাব্য-সাধনা হইতে বিরত হন নাই বা একদিনের জন্যও কর্তব্যভ্রষ্ট হন নাই। ইহাই তাঁহার কবি-জীবনের বৈশিষ্ট্য—বলিষ্ঠ পুরুষকারের পরিচয়। 'তরীখানি বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে'—এই কথাই কবি সহস্র বাধা বিঘ্নের মধ্যেও নিজেকে এবং সেই সঙ্গে দেশবাসীকে স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিয়াছেন—'তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি জুড়ব না।' অতএব—

"ধৈর্য ধর ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক।
শতদিকে শত দুঃখ আসুক আসুক॥"

—ইহাই স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবন-সাধনা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে প্রভাবিত অনেক কবি বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশেষতঃ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে উন্নীত করবার পথে এক নবযুগের সূচনা করে। অথচ এই যুগেই গোবিন্দদাস ছিলেন—'Like a star that dwelt apart'—স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে একক উন্নত শীর্ষে সমুজ্জ্বল কবি। আধুনিক কবিতায় যে বস্তুতান্ত্রিকতা এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর আমরা বড়াই করি, গোবিন্দদাস তার অগ্রদূত। তাঁহার অনাবিল কবি-প্রাণের সহজ স্পর্শে তাঁহার কাব্যলক্ষ্মী প্রাণময়ী ও রূপময়ী হইয়া উঠে। তিনি ভঙ্গী দিয়া চোখ ভোলান নাই এবং গিল্টিকরা চাকচিক্যময় সভ্যতায় কোনরূপ পালিশমাখা কথা বলেন নাই, যাহা তাঁহার কাছে সত্য, যাহা তাঁহার কাছে সুন্দর, সেই শ্রেয়-প্রেয়কেই তিনি সহজ

সরল ভাষায় তাঁহার কাব্যে পরিবেশন করিয়াছেন। অবশ্য ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ[৪] কথিত "Emotions recollected in tranquillity"—সার্থক গীতিকবিতার জন্য প্রয়োজন বটে, কিন্তু গোবিন্দদাস সেই মানসিক প্রশান্তি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়াই তিনি প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার কাব্য তাঁহাকে যত বড় করিয়াছিল, তিনি তাহার চেয়েও বড় কবি ছিলেন। দুঃখে শোকে বিচলিত অথচ কর্তব্যে দ্ররিষ্ট, নিন্দা-আঘাতে আত্মস্থ, প্রেমে দীপ্ত পরিপূর্ণ মানুষ ছিলেন তিনি। তাই ইংরাজী সাহিত্যের বা ইংরাজ কবির কোন প্রভাব তাঁহার উপর পড়ে নাই। কিন্তু বাংলাদেশকে, বাঙ্গালীকে ও বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তিনি মনে প্রাণে ভাল-বাসিতেন। এইজন্য স্বদেশবাসী তাঁহাকে "স্বভাবকবি গোবিন্দদাস" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা স্মরণীয়:—"তাঁহাকে যে স্বভাবকবি বলা হয়, তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার কবি-প্রেরণা কোন

---

৪. ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, উইলিয়ম (Wordsworth, William) (১৭৭০-১৮৫০ খৃঃ)। বিখ্যাত ইংরাজ কবি। জন্ম—কাম্বারল্যাণ্ডে। ১৭৯১ খৃঃ বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৭৯০ খৃঃ "An Evening Walk" নামক এক ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রথম রচনা। তাহার পর বহু কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইনি ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজকবি হইয়াছিলেন। ইংরাজ স্বভাবকবিদের মধ্যে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের স্থান অতি উচ্চে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৭ খৃঃ মধ্যে রচিত। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'অ্যান ইভনিং ওয়াক' (১৭৯০ খৃঃ), 'ডেসক্রিপটিভ স্কেচেস' (১৭৯৩ খৃঃ), 'লিরিক্যাল ব্যালাড্স' (১৭৯৮ খৃঃ ২য় সং-১৮০০ খৃঃ) দি 'প্রেলিউড' (রচনা ১৮০৫ খৃঃ-প্রকাশ ১৮৫০ খৃঃ), 'দি অকসকারশন' (১৮১৪ খৃঃ)। এই সমস্ত রচনাই তাহাকে উনবিংশ শতকের ইংরেজী রোমাণ্টিক কাব্যধারার পুরোধা হিসাবে চিহ্নিত করে। কবিবন্ধু কোলরিজ ও ভগ্নী ডরোথির সাহচর্যে তিনি "প্রকৃতির কবি" হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন।

পোষাকী রোমান্টিক সংস্কার নহে, অনুপ্রাণ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই কবিত্ব তাঁহার প্রাণের স্বাভাবিক বিকাশ মাত্র।"[৫]

কবি গোবিন্দদাসের জীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি কবির কাব্যও বিচিত্র। তাঁহার বৈচিত্র্যপূর্ণ সুর বহন করিয়াই তাঁহার কবিতাগুলিও বিচিত্র হইয়া আছে। তিনি কখনও রবীন্দ্রনাথের মত কল্পলোকের যাদুকর ছিলেন না, তিনি ছিলেন বলিষ্ঠ বাস্তবতার কবি, বিদ্রোহী কবি এবং জীবন-সংগ্রামের নির্ভীক ভাষ্যকার। তাঁহার প্রায় সব কবিতাই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। জীবনে যাহা দেখিলাম এবং যাহা বুঝিলাম—তাহা লইয়াই তাঁহার কাব্য। প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াই কবির কাব্য ও জীবন। দুঃখ, দারিদ্র্য, আঘাত—তাঁহার জীবনের নিত্য সহচর। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে জীবন সম্বন্ধে উদাসীন করিতে পারে নাই, জীবন তাঁহার কাছে কখনো নেতিবাচক হইয়া উঠে নাই, বরং জীবনের নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও পাঁকে পাঁকে তিনি জীবনকেই গ্রহণ করিয়াছেন। ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সব মিলিয়াই তিনি স্বীকার করিয়াছেন জীবনকে, বুঝিয়াছেন—জীবন শুধু সুন্দর এইজন্যেই যে তাহার অনেকটা মাধুর্য দিয়া ঘেরা। ফলে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু, প্রাণাপেক্ষা প্রিয় কন্যার মৃত্যু, সহোদরার মৃত্যু, অনাহার, অবিচার তাঁহার কাব্যের প্রেরণার স্থল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কাব্যাদর্শে অদ্ভুত জীবন-বোধের পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে। তাই কবির মানসিকতার স্বরূপটি ধরিতে না পারিলে, তাঁহার কবিতার মর্ম অনেক স্থলেই উপলব্ধি করা যাইবে না। দুঃস্থ ও নিরন্ন কবি

৫. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (৫ম সং)—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ-১৫৯।

আমাদের দেশে আগেও ছিল, এখনও আছে। কবি মধুসূদন[৬] এবং কবি হেমচন্দ্র[৭] তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্বভাবকবির মতো

---

৬ মধুসূদন দত্ত, মাইকেল—(১৮২৪-১৮৭৩ খৃঃ)। বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, আধুনিক বাংলা নাটকের জনক—মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮২৪ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী যশোহরের সাগরদাঁড়ী গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দাসী। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছাত্র ছিলেন মধুসূদন। পাঠ্যাবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া 'মাইকেল মধুসূদন' নাম লইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রবাস হইতে ফিরিয়া বেলগাছিয়া নাট্যশালায় রাম-নারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় (৩১শে জুলাই, ১৮৫৮) দেখিয়া তিনি মাতৃভাষায় নাটক রচনার সঙ্কল্প করেন। ফলে ১৮৫৯ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে তাঁহার 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়। মধুসূদনের মতো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত প্রতিভাশালী কবির হাতে বাংলা সাহিত্যের অনেক নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্যরীতি-সংগত নাটক ও প্রহসন, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, চতুর্দশপদী কবিতা এবং বিশেষ এক গদ্যরীতির প্রবর্তক হিসাবে তিনি বাংলাদেশে অমর হইয়াছেন। তাঁহার অমিত্রাক্ষর ছন্দ শুধু বাংলা কাব্যকে নয়, বাংলা গদ্যকেও শক্তিশালী করিয়াছে। তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'মেঘনাদবধকাব্য', 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য', 'বীরাঙ্গনাকাব্য', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলা কাব্যসাহিত্যকে অসাধারণ সমৃদ্ধি দান করিয়াছে। কিন্তু কবির ব্যক্তিগত জীবন বড়ই দুঃখে কাটিয়াছে। প্রেম, অর্থ ও যশঃ—এই তিনটি কবি আশানুরূপ লাভ করিতে পারেন নাই। বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই, ইংরাজী সাহিত্যে বড় কবি হইতে গিয়া শুধু অনাহারে, অনিদ্রায় ও কায়ক্লেশে দিন কাটাইয়া দেন এবং প্রচুর্যের মধ্যে মানুষ হইয়াও নিতান্ত অভাবগ্রস্ত অবস্থায় ১৮৭৩ খ্রীঃ, ২৯শে জুন, আলিপুরের প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে মারা যান।

৭ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীতে মাইকেল মধুসূদনের পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-ই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। হুগলী জেলার 'পুলিটা' নামক গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ, ১৭ এপ্রিল তাঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হিন্দু কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম যৌবনে তিনি শিক্ষকতা করেন। তারপর বি. এল্.

জীবনভর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা বোধ হয় আর কেহই ভোগ করেন নাই। জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি অমৃত পান নাই, পাইয়াছেন হলাহল বিষ। কিন্তু তিনি তাহা পান করিয়া "নীলকণ্ঠ" হইতে পারেন নাই, বিষের জ্বালা-যন্ত্রণায় এবং মর্মভেদী হাহাকারে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে যথাযোগ্য সম্মান পান নাই। কি ক্ষণে যে কবিবর হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"হায় মা ভারতি। চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই সে দরিদ্র হবে?"

কবি গোবিন্দচন্দ্র ও হেমচন্দ্র স্বয়ং এই কথার জীবন-সাক্ষী। কবি গোবিন্দচন্দ্র নিজে লিখিয়াছেন—"আমার জীবনে বিশেষত্ব কিছুই নাই। সংসারে অনন্ত অসংখ্য অকর্মণ্য জীবন কালসাগরে বহিয়া চলিয়াছে। কে তাহার খোঁজ লয়? তাহার উদ্দেশ্য কি ভগবান জানেন, কিন্তু তেমন নিরুদ্দেশ্য জীবন-কাহিনীগুলিতে কেহ আগ্রহ করে না। তবে আমার···ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বাঙ্গালার একটা মস্ত

পাস করিয়া, এক বৎসর মুন্সেফি করেন। মুন্সেফি ছাড়িয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে থাকেন। ওকালতিতে তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন, কিন্তু অর্থ সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বৃদ্ধ বয়সে অন্ধ হন। তখন তাঁহার খুবই অর্থকষ্ট হইয়াছিল। কবি ত্রিশ টাকা করিয়া সরকারী বৃত্তি পাইতেন, দেশের কোনো কোনো বদান্য ব্যক্তিও মাসিক সাহায্য করিতেন। কবির প্রথম গ্রন্থ 'চিন্তা-তরঙ্গিনী', পরে তিনি ক্রমে ক্রমে 'বৃত্রসংহার', 'ছায়াময়ী', 'আশাকানন', 'কবিতা-বলী' ও 'দশমহাবিদ্যা' রচনা করেন। 'বৃত্রসংহার'-ই কবির সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের উৎসর্গ রচনা ও সমালোচনা করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ, ২৪শে মে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি।

সাগর-জীবনের যোগ আছে,···। আমার জীবন-কাহিনী অতি সামান্য হইলেও লোকে শুনিলে শুনিতে পারে।···সাগর-সঙ্গম তীর্থ নহে কি? বাল্মীর কথা ছাড়িয়া দিয়া রাবণের দিগ্বিজয় পড়িলে অসম্পূর্ণ রহে না কি?"[৮]

স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের 'কবি-পরিচিতি' প্রসঙ্গে আসিয়া মনে পড়ে ফরাসী দেশের প্রথিতযশা শিল্পী বার্ণার্ড প্লেসি এবং কবি হপ্‌-কিনসের কথা। প্রথম জীবনে কবি হপ্‌কিন্সের প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন না হইলেও পরে স্বীকৃত হইয়াছে এবং তাঁহার কবিতাবলীতে সম্পূর্ণ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয়বস্তুর অবতারণা লক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-সমালোচকগণ তাঁহাকে আধুনিক ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের অগ্রদূত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর বার্ণার্ড প্লেসি তাঁহার সারাজীবন অক্লান্ত সাধনার পর যখন সফলতা অর্জন করিলেন, তখন তিনি সর্বহারা, নিঃস্ব, ভিখারী এবং ঋণের দায়ে জর্জরিত, কারাবন্দী। কারাগারের মধ্যেই তাঁহার মূল্যবান জীবনের দীপশিখা নির্বাপিত হইল। কিন্তু মৃত্যুর পর তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে চিনিল, জানিল এবং প্রতিভার সম্যক্ উপলব্ধি করিল। ফলে, তাঁহার স্মৃতিকে স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার একটি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিল। জীবিত অবস্থায় প্লেসির প্রতি দেশবাসীর চরম উপেক্ষা এবং মৃত্যুর পর তাঁহার মর্মরমূর্তি স্থাপন—অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাস লক্ষ্য করিয়া একজন দরদী ও মরমী কবি লিখিয়াছেন—

"When he was living he hungered for bread,
They gave him a statue when he was dead".

কিন্তু কবি গোবিন্দদাসের ভাগ্যে মর্মর প্রতিমূর্তিও মেলে নাই। শোকে-দুঃখে জর্জরিত, ব্যথিত, উৎপীড়িত ও নির্বাসিত কবি

---

৮. প্রকাশিত পত্র। কবির হিতাকাঙ্ক্ষী হেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে ব্রহ্মদেশ হইতে ১৩১৮ সনের ৭ই ভাদ্র লিখিত।

দ্বারে দ্বারে কৃপাপ্রার্থী হইয়াছেন, কিন্তু তিনি নিষ্ফল মাথা কুটে মরিয়াছেন। কবির শেষজীবনের কবিতাগুলিতে তাই একটা সকরুণ বিষণ্ণতা সঞ্চারিত হইয়াছে। অসুস্থ কবি মৃত্যুপথ হইতে ফিরিয়া আর্তস্বরে প্রশ্ন করিয়াছেন—'কেন বাঁচালে আমায়?' কখনও মৃত্যু-তীরে পৌছাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন—'দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়।' অনশনে, রোগে, শোকে মর্মপীড়িত কবি যশঃ, অর্থ, মান, সম্ভ্রম কিছুই লাভ করেন নাই। কেবল ছিন্নমূলের মত তাড়িত ও বিতাড়িত হইয়া কবি বঞ্চিত বুকে পুঞ্জীভূত বেদনা লইয়াই শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন। কথিত আছে, কোন 'আলালের ঘরের দুলাল'[৯] কবির মৃত্যুর পর তাঁহার শ্মশানের উপর একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। কবি এই কথা শুনিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী আমি মলে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।
আজ যে আমি উপোস করি
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকার দিবানিশি
ক্ষুধায় ছটফট।"[১০]

বাস্তবিকই কবি গোবিন্দদাসের একটি পূর্ণাঙ্গ এবং বাস্তব ছবি রূপায়িত হইয়াছে এই মর্মস্পর্শী কবিতাটিতে। কবিতাটি যেন কবির

৯. 'আলালের ঘরের দুলাল'—'টেকচাঁদ ঠাকুর' এই ছদ্মনামে প্যারিচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮ খ্রীঃ) রচনা করেন। ধনীর ছেলে অপরিমিত প্রশ্রয় ও স্নেহ পাইয়া কিরূপ স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, বইটিতে সেই কাহিনী ব্যক্ত হইয়াছে। 'সঙ্গদোষ বড় দোষ'—এই নীতি-শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কাহিনীটি রচিত।

১০. "আমার চিতায় দিবে মঠ"—'স্বদেশ-স্বরাষ্ট্র-সমাজ' শীর্ষক কবিতায়।

জীবনের ভাষ্য—জীবনের দর্শন! সারা জীবন ব্যাপী দুঃখ-দৈন্য, অনাহার অর্ধাহার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে করিতে বিদ্রোহী কবি জীবন-যাত্রায় একাকী অগ্রসর হইয়াছেন 'সত্যেরে করিয়া সম্বল'। কোন লোভ-প্রলোভন বা বাধা-বিপত্তিই তাঁহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। দারিদ্র্য যতই পীড়া দেয়, ক্ষুধায় দেহ যতই এলাইয়া পড়ে, ততই গোবিন্দদাস তাঁহার দুঃখের দেবতাকে চোখের জলে অভিষেক করিয়া লন। বৈষয়িক সুখের প্রলোভনে এবং বিরুদ্ধ শক্তির চাপে তিনি কখনও মাথা নত করেন নাই। চিত্ত ছিল তাঁহার 'ভয়শূন্য' এবং উচ্চ ছিল তাঁহার শির। এই শির প্রবল সামন্ত শক্তি এবং পারিবারিক অশান্তি নত করিতে পারে নাই। কবি অন্যায়কারী ও অন্যায় প্রশ্রয়কারী ব্যক্তিদের যেমন 'তৃণের' মত গণ্য করিতেন, তেমনি 'জীবনমৃত্যু, পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' হইয়া ন্যায় ও সত্যকে জীবনের ধ্রুবতারা বলিয়া মনে করিতেন। ফলে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা, ষড়যন্ত্রকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং ক্লীবতাকে মানিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি এক হাতে সংগ্রাম করিয়াছেন, অপর হাতে চোখের জল মুছিয়াছেন! সমসাময়িক সাহিত্যরথীদের উপর, এমন কি রবীন্দ্রনাথের মত এতবড় একজন মনীষীর কোনরূপ স্বীকৃতি না পাইয়াও গোবিন্দদাস এতটুকুও নিরাশ হন নাই। তিনি ছিলেন আশাবাদী কবি। তাই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া যাহা কিছু অবিচার, যাহা কিছু অসুন্দর, অন্যায়, যাহা কিছু অসত্য—সবার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করিয়াছেন। শুধু কঠোর বাস্তবধর্মিতাই নয়, তাঁহার কবিতায় ভাব, ভাষা ও ছন্দে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে বিদ্রোহী প্রাণের প্রচণ্ড সুর। সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, প্রেম, বিরহ, মিলন— এই সব দিক লইয়াই তিনি লিখিয়াছেন, কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার কবিতার মূল সুর যে বিদ্রোহ, বলা বাহুল্য তাহা অক্ষুণ্ণ আছে। 'কর্তব্য' শীর্ষক কবিতায় তাঁহার এই

মনোভাবের সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়—

"হলে হও খণ্ড খণ্ড
সৃষ্টি করি লণ্ড ভণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড কাঁপুক,
গম্ভীর গৌরব ভরা
মহাদণ্ডে ভেঙ্গে পড়া
কি আনন্দ, কি প্রচণ্ড সুখ !"

—যত বাধা, যত বিপদ আসুক না কেন, তিনি তাঁহার যাত্রাপথে আগাইয়া চলিবেন, পথ দেখিয়া ক্ষান্ত হইবেন না—ইহাই ছিল তাঁহার জীবন-সাধনা। প্রিয়ার ছলো ছলো আঁখি এবং ক্ষুধাতুর শিশুর বুকফাটা কান্নাও তাঁহাকে যেন পিছনে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিবে না।—

"ক্ষুধাতুর শিশুবক্ষে
উপবাসী নারী চক্ষে
চাহিয়া দেখ না তার ম্লান অশ্রুমুখ,
ফিরিয়া শুন না তার
অন্নবিনা হাহাকার
কাঁদিবে কাঁদুক।"[১১]

—(কর্তব্য—১৩১০ সাল)।

কবির জীবনের ছন্দও এই একই সুরে বাঁধা। অন্যায় ও অবিচারের

---

১১. ১৩৩০ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" কবিতাটির কয়েকটি ছত্রের সঙ্গে উপরি-উক্ত কবিতাটির ভাবগত আশ্চর্য মিল দেখা যায় :—

"পশ্চাতে চাব না মোরা   মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিব না দিক,
গুনিব না দিন ক্ষণ   করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।"

কাছে পরাজয় স্বীকার করার চেয়ে গৌরবময় মৃত্যুকে বরণ করা তাঁহার কাম্য ছিল। এমনিভাবেই বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস 'ফুলের মত নীরবে ঝরিয়া গিয়াছেন'।

কবি গোবিন্দদাস প্রায় শতবর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং বালক বয়স হইতেই কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি শৈশবেই পিতাকে হারান এবং ভাওয়াল রাজপরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হন। নানা কারণে তাঁহার লেখাপড়া হয় নাই, বিশেষ করিয়া পিতৃহীন হওয়ায় শিক্ষার শেষ সুযোগটুকু নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া লেখা-পড়ার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে চারণ-কবি মুকুন্দদাস[১২] এবং স্বভাব-কবি গোবিন্দদাসের মধ্যে একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। উভয়েই ঢাকা জেলার অধিবাসী এবং উভয়েই স্বভাবকবি ছিলেন। উভয়েরই লেখাপড়া বেশীদূর অগ্রসর হয়

---

১২. চারণকবি মুকুন্দদাস—"বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণকবি মুকুন্দ-দাস"—১২৮৫ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত "বানরী" নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—গুরুদয়াল দে, মাতার নাম শ্যামা-সুন্দরী। পিতৃদত্ত নাম—"যজ্ঞেশ্বর" বা যজ্ঞা। পরবর্তী কালে বৈষ্ণবগুরু রামানন্দ অবধূত কর্তৃক প্রদত্ত "মুকুন্দদাস" নামেই তিনি সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেন। বরিশালের উপকণ্ঠে কালীমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠনকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন "আনন্দময়ী আশ্রম"। এই আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়াই মুকুন্দদাসের সাধনা ও সিদ্ধিলাভ। তাঁহার জীবনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের সান্নিধ্যলাভ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মূলতঃ তাঁহারই প্রেরণায় উৎসাহে ও আশীর্বাদেই মুকুন্দদাস—'মাতৃপূজা', 'সমাজ', 'আদর্শ', 'পল্লীসেবা', 'সাথী', 'কর্মক্ষেত্র', 'ব্রহ্মচারিণী' ও 'পথ' নাটকগুলি লেখেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই নাটক-গুলি দেশে অসীম আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৩৪১ সালে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ এই পুরুষসিংহের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি মৃতদার ছিলেন এবং এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া যান। মদীয় প্রণীত "চারণ-কবি মুকুন্দদাস" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

নাই। দেশকে তাঁহারা এতদূর ভালবাসিয়াছিলেন যে মরণপণ সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। উভয়েই ছিলেন পুরুষসিংহ এবং দেশপ্রেমিক। তাই লেখা-পড়া না করাটা উভয়েরই জীবনে অভিশাপ আনে নাই, আনিয়াছিল আশীর্বাদ। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার[১৩] মুকুন্দদাস সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"কলেজে পা দিতে পারিলেই আর মুকুন্দ হইত না। শিষ্ট ভদ্র গৃহস্থ হইত, বরিশালের লোকেরাও চিনিত না।" কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। তাঁহার

---

১৩. মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত—(১৮৫৬-১৯২৩ খৃঃ)। বরিশালের প্রসিদ্ধ জননেতা, সাহিত্যিক, রাজনীতিক এবং অধ্যাপক। পিতা ব্রজমোহন দত্ত, মাতা প্রসন্নময়ী। জন্ম—১৮৫৬ সালের ২৫শে জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১২৬২ সাল, ১৩ই মাঘ); জন্মস্থান—বাটাজোড়। কথিত আছে, পটুয়াখালি মহকুমা অশ্বিনীকুমারের পিতা ব্রজমোহন দত্তের সৃষ্টি। অশ্বিনীকুমারের মাতা প্রসন্নময়ী তাঁহার মাতামহ রায় বাহাদুর রামলোচনের সংসারে প্রতিপালিতা। প্রসন্নময়ীর মাতুলদ্বয় হইতেছেন কলিকাতার তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ। এক অভিজাত পরিবারে ভারতের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে অশ্বিনীকুমার দত্তের আবির্ভাব—"দত্ত কারোর ভৃত্য নয়, সঙ্গে এসেছে।" কৃতিত্বের সহিত এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহাত্মা অশ্বিনীকুমার কিছুকাল বরিশালে আইন ব্যবসায় করেন, কিন্তু তাহা ভাল না লাগাতে অল্পকাল পরেই পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্য গ্রহণ করেন। পরে এই বিদ্যালয়টি কলেজে পরিণত করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দ্বীপান্তরিত হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই মহাত্মা মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর জনসেবায় ও লোকশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করায় দেশবাসী তাঁহাকে "মহাত্মা" নামে ভূষিত করেন। তাঁহার প্রণীত "ভক্তিযোগ", "প্রেম" ও "দুর্গোৎসব-তত্ত্ব" নামক পুস্তক-ত্রয় অপূর্ব ধর্মজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার উৎস এবং বাংলার সর্বত্র সমাদৃত। ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর কালীপূজার দেওয়ালী উৎসবে তাঁহার জীবন-দীপ নির্বাপিত হইলেও তাঁহার আদর্শ অনির্বাণ দীপশিখারূপে হাজার হাজার গৃহে প্রজ্বলিত হইল।

প্রতিভা যেমন ছিল সহজাত, তেমনি দারিদ্র্য ছিল জন্মগত। অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়। তাই তাঁহার কবিতা যেন বিয়োগান্ত জীবননাট্যের কাব্যরূপ। মুকুন্দদাসের যাত্রাগানও স্বাধীনতা-আন্দোলনের পটভূমিকায় লিখিত বাস্তব জীবনের নাট্যরূপ। অবশ্য মুকুন্দদাসের আর্থিক অবস্থা গোবিন্দদাসের মত ছিল না, তাঁহার দান ও সাহায্য ছিল সর্বত্র স্বীকৃত ও বিদিত। কিন্তু আসরে দাঁড়াইয়া অবস্থানুযায়ী গান রচনা করিয়া সুর সহযোগে মুকুন্দদাস যেমন গাহিতে পারিতেন, তেমনি পারিতেন গোবিন্দদাস শ্মশান 'শয্যায় শায়িতা সহধর্মিণী সারদাকে দেখিয়া স্মৃতির তাজমহল গড়িতে। যথা—

“সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূর্বে
জীবন গগন মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া,
অপূর্ব সুন্দরী ঊষা অপূর্ব সন্ধ্যায় ভূষা
পৃথিবীর দুই প্রাণে, উঠিছে প্লাবিয়া।
প্রেমদা পদ্মার কূলে কোমল শেফালী ফুলে
করিয়া বাসর শয্যা ডাকিছে আমায়।
সারদা চিলাই তীরে আম কাঠ দিয়া শিরে
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা বিছানায়।
নাহি নিশি নাহি দিন দু'জনেই নিদ্রাহীন
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী পানামা যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে।”

মুকুন্দদাসও মৃতদার ছিলেন, তবে গোবিন্দদাসের মত তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন নাই। এই দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র বংশধর শ্রীহেমরঞ্জন দাস[১৪] বর্তমানে জীবিত আছেন, যেমন আছেন মুকুন্দ-

---

১৪. শ্রীহেমরঞ্জন দাস—কবি গোবিন্দচন্দ্রের প্রথমাপত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর প্রায় সাত বৎসর পরে কবি বিক্রমপুরের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মণগাঁ' নিবাসী

দাসের একমাত্র পুত্র—শ্রীকালীপদ দাস[১৫]। উভয়েই স্বভাবকবি হওয়ায় উভয়ের মধ্যে স্বভাবগত ও প্রকৃতিগত বহু মিল লক্ষ্য করা যায়। গোবিন্দদাস যেমন অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় ভাওয়াল হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, মুকুন্দদাসও তেমনি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় বরিশাল[১৬] হইতে

৺মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কন্যা প্রেমদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। এই পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে মাত্র হেমরঞ্জন দাস জীবিত আছেন। বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলায় 'গড়িয়া'তে শ্রীরামপুর এলাকায় "প্রমোদাকুঠির" স্থাপন করিয়া পত্নীসহ বাস করিতেছেন। এই গ্রন্থ রচনায় তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। আমি তাঁহার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

১৫. শ্রীকালীপদ দাস—মুকুন্দপুত্র কালীপদ দাস বর্তমানে ২৪ পরগণায় সোনারপুর অন্তর্গত রাজাপুর অঞ্চলে "চারণপল্লীতে" পত্নীসহ নিতান্ত উপেক্ষিত অবস্থায় আছেন। তাঁহার এক পুত্র—বাদল দাস এবং কন্যা শেফালী জীবিত আছেন। মুকুন্দ দাসের এই নাতি-নাতনি ছাড়া আর আছেন এক দৌহিত্রী—শ্রীপুতুল দত্ত বণিক। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবিপুত্রকে এককালীন পাঁচশত টাকা ও মাসিক একটা ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা অভিনন্দনযোগ্য।

১৬. বরিশাল—বরিশালের প্রাচীন নাম—বাখরগঞ্জ। বাখরগঞ্জ জেলার সদর শহর বরিশাল 'কীর্তনখোলা' নদীর তীরে অবস্থিত এবং খুলনা হইতে জলপথে ১০৪ মাইল দূরে। মেল-স্টীমারে সাড়ে দশ ঘণ্টার পথ। নিসর্গ শোভায় সে অপরূপ। বরিশালের দিকে দিকে নদ-নদী জোয়ার-ভাঁটায় তারা চিরচঞ্চল আর দক্ষিণে সমুদ্র। নিয়ত গর্জনশীল বঙ্গোপসাগর। বরিশাল হইতে পটুয়াখালি, মাদারীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নানাস্থানে স্টীমার যাতায়াত করে। ইহা একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। এখানে 'ব্রজমোহন কলেজ' নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ অশ্বিনীকুমার দত্ত কর্তৃক স্বীয় পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত। বরিশাল অশ্বিনীকুমার দত্তের জন্মভূমি ও কর্মভূমি, চারণকবি মুকুন্দদাসের "যজ্ঞভূমি"।

বিতাড়িত হইয়া সুদূর দিল্লীতে[১৭] ইংরাজের কারাগারে কারারুদ্ধ হন। উভয়েই ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী ও গণতন্ত্রের দিশারী। প্রতিভার লগ্ন-শক্তিতে একজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ নট এবং আর একজন ছিলেন স্বভাবকবি। উভয়ের আবেগের গভীরতা, প্রকাশের স্পষ্টতা ও তীব্রতা এবং বর্ণনার প্রত্যক্ষতা এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। এই আবেগময়তার জন্যই উভয়ের দেশাত্মবোধক কবিতা ও সঙ্গীতগুলি সে যুগে বিশেষ উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহারা কেহই 'Saviour' বা 'অবতার' ছিলেন না, ছিলেন 'Liberator' বা 'মুক্তিদাতা'।

কবি গোবিন্দদাস প্রায় শতবর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করায় আমরা যেমন শতবর্ষ পূর্বের রাষ্ট্র ও সমাজের কথা ভাবিব, তেমনি লক্ষ্য করিব তাঁহার ঋষিজনোচিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টির প্রতি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি 'গরীব হইলেও, প্রতিভায় তিনি 'ধনী' ছিলেন। অতি অল্পবয়সেই তাঁহার কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটিয়াছিল, মাত্র তেরো চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় জয়দেবপুর স্কুলের "বিদ্যোৎসাহিনী সভায়" তিনি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। পরে ভাওয়ালের তদানীন্তন রাজা

---

১৭. দিল্লী—পাঞ্জাব প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ যমুনার তীরে অবস্থিত সুবিখ্যাত শহর। পূর্বে ইহা যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯১২ খ্রীঃ হইতে ইহা ভারতের রাজধানী। ১৯১১ খ্রীঃ পঞ্জাবের অধিকার হইতে ছিন্ন করিয়া ইহাকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয়। ইহা একজন চীফ কমিশনারের অধীন। এখানে প্রাচীন মুসলমান রাজাদের প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জুম্মা মস্‌জিদ ও কুতুবমিনার বিখ্যাত। আয়তন ৫০৭ বর্গমাইল ও জনসংখ্যা ৪ লক্ষ ৮৭ হাজার। এই দিল্লীকে 'পুরাতন দিল্লী' বলা হয়। ইহার অনতিদূরে 'নূতন দিল্লী' নির্মিত হইয়াছে। এই নূতন দিল্লীর মধ্যে বড়লাটের প্রাসাদ, ব্যবস্থাপরিষদ্ প্রভৃতি অবস্থিত। বর্তমানে দিল্লী এক আন্তর্জাতিক জগৎ।

কালীনারায়ণে[১৮]-র প্রতিষ্ঠিত "প্রজাহিতৈষণী" সভাতেও একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া কালীনারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পনেরো বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "প্রসূন"[১৯] প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটি বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। সারাজীবন কবি অজস্র কবিতাই লিখিয়াছেন, কবিতা তাঁহার তাপদগ্ধ দেহে মনেপ্রাণে শান্তি দিয়াছে। কবির কবিতার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় আজ আর সম্ভব নয়। তবে প্রায় হাজার খানেক কবিতার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। ১২৮৫ সালের বৈশাখ (এপ্রিল ১৮৭৮) মাস হইতে কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায়[২০] "বীণা" নামে 'নানাবিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেই "বীণা"-র পৃষ্ঠায় "ভাওয়ালের কবি" গোবিন্দদাসের কয়েকটি প্রাথমিক রচনার সন্ধান মিলিবে, মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাঁহার প্রথম কবিতা "একদিন"

---

১৮. কালীনারায়ণ রায়, রাজা (১৮১৮-১৯০১ খ্রীঃ)। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগণার জমিদার। ইঁহার পিতা গোলকনারায়ণ এবং পুত্র রাজনারায়ণ। ১৮৭৫ খ্রীঃ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯. প্রসূন—গোবিন্দদাসের রচিত কাব্যটি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি সম্বন্ধে সাহিত্যিক হেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—"বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে তাঁহার প্রথম পুষ্পাঞ্জলি" প্রসূন নামে একটি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তকের কথা জানিতে পারা যায়। তখন গোবিন্দচন্দ্র পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক যুবক, সবেমাত্র বিবাহ করিয়াছেন।"

২০. রাজকৃষ্ণ রায় (১২৬১-১৩০০ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বাংলা পদ্য অনুবাদ করিয়া এবং বহু নাটক ও প্রহসন লিখিয়া প্রভূত যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। সুনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি থিয়েটারে বেশ্যা অভিনেত্রী লইবার প্রথা উঠাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।

প্রথম বর্ষের (কার্তিক, ১২৮৫) "বীণা"তেই প্রকাশিত হইয়াছিল।[২১] সেই যে "বীণা"-য় প্রথম কবিতা প্রকাশিত হইল, তাহাই সত্তর বৎসর পূর্বে কবির জীবনে প্রথম সুপ্রভাত। তারপর সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কবির কাব্যলক্ষ্মী অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হইয়াছেন। তখনকার দিনে 'বীণা', 'বান্ধব', 'নব্যভারত', 'সৌরভ', 'Dacca Review', 'সম্মিলনী', 'প্রকৃতি', 'জন্মভূমি', 'নবজীবন', 'কৌমুদী', 'ভারতমিহির', 'আর্য্যকায়স্থপ্রতিভা', 'প্রতিভা', 'নারায়ণ', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের রচনার পাশে গোবিন্দদাসের কবিতা প্রকাশিত হইত।

গোবিন্দদাসের কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—আবেগের তীব্রতা (Intensity of emotion)। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন —"রচনার প্রধান গুণ সরলতা ও স্পষ্টতা"। গোবিন্দদাসের কাব্যে ইহা সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। পত্নীপ্রেমই তাঁহার কাব্যের প্রধান উপজীব্য হইলেও এই প্রেমে কোন ভাববিলাসিতা ছিল না, ছিল ইন্দ্রিয়াসক্তির উদ্দামতা। আর ছিল জীবনবাদী বলিষ্ঠতা, ভোগবাদী পৌরুষ এবং তান্ত্রিক সুলভ বীরাচার। তিনি লিখিয়াছেন—

"আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ,
অমৃত সকলি তার মিলন-বিরহ।
বুঝি না আধ্যাত্মিকতা
দেহ ছাড়া প্রেমকথা
কামুক লম্পট ভাই যা কহ তা কহ"।

—এই বিশুদ্ধ 'হেডোনিষ্ট'[২২] কামসংহিতা উনবিংশ শতাব্দীর Mid-

---

২১. রাজকৃষ্ণ রায়—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৪-১৫।

২২. এই মতে ঐহিক সুখই একমাত্র সত্য।

victorian কবি, পাঠক ও সমালোচক কেহই মনে-প্রাণে মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, এই ভাব বাংলার শিক্ষিত সমাজ-জীবনের পক্ষে অনুকূল ছিল না বলিয়া কবি-প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন হয় নাই। জীবিতকালে কবি যেমন দুঃখ, দৈন্য ও নির্যাতনের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন, তেমনি মৃত্যুর পরেও তাঁহার স্মৃতির প্রতি কোনরূপ শ্রদ্ধা-নিবেদন, এমন কি তাঁহার কবিতাসমূহের মুদ্রণ প্রভৃতি কিছুই করা হয় নাই। যথার্থ প্রতিভার অধিকারী হইয়াও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে তিনি বর্তমানে প্রায় বিস্মৃত। বড় দুঃখে কবি লিখিয়াছেন—

"এতটুকু ভালবাসা একটি স্নেহের ভাষা
এক ফোঁটা আঁখিজল কোথাও না পাই।
সত্যই এ বসুন্ধরা কেবলি রাক্ষস ভরা,
দয়ার সে দেবতারা এজগতে নাই!
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।"

কবির প্রার্থনা রাজ্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, মুক্তি বা মোক্ষ নয়, তাঁহার শুধু প্রার্থনা—'এতটুকু ভালবাসা', 'একটি স্নেহের ভাষা' এবং 'এক ফোঁটা আঁখিজল'। কবি সারা জীবনে তাহাও পান নাই। মরীচিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, উল্কার ন্যায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছেন—জীবনের মরুভূমিতে মরূদ্যানের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কেবল কবির 'জীবনের ফুল বড় হয়ে ফুটে মরণের উদ্যানে'। অথচ গোবিন্দদাসের মত বাংলা সাহিত্যে দুঃসাহসিক কবি বড় একটা মেলে না। তাঁহার বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী, স্পষ্ট ভাষণ ও বিদ্রোহী-মনন এক সময় বাংলাসাহিত্যে যথেষ্ট সাড়া জাগাইয়াছিল। এই পরিচয়ের একমাত্র সাক্ষী তাঁহার কাব্য, যাহা 'ব্যথার ফসল' হিসাবে চিহ্নিত। কবি গোবিন্দদাস তাঁহার কবিতার মধ্যেই আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, উন্মোচিত করিয়াছেন বাঙ্গালী হৃদয়খানি এবং

অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

"দয়ার সে দেবতারা এ জগতে নাই।
মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই।"

বাংলাসাহিত্যে স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের কাব্য-সাধনার সঠিক মূল্যায়ন আজও হয় নাই। আজও বাংলার চির-অনাদৃত কবি বাংলা সাহিত্যে সমান উপেক্ষিত।

কবি গোবিন্দদাস বাংলাদেশের শেষ জাতীয় বাঙ্গালী কবি। বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস, ফুল-ফল, তরুলতা, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, পূজা-পার্বণ ও উৎসবের আনন্দই তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে শোভন-শ্রীতে মণ্ডিত করিয়াছে। গোবিন্দদাসের দেশভক্তি ছিল অপরিসীম। জন্মভূমির প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁহার দেশাত্মবোধক কবিতাবলী একসময় দেশবাসীকে স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা দিয়াছে। "স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এ দেশ তোদের নয়"—কবির এই গানটি একসময় পথের ভিখারী হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের মুখে মুখে ফিরিত। গানটি ছিল স্বদেশপ্রেমিক কবির মর্মকথা। তাই ভাওয়ালের পল্লীপ্রকৃতি, ভাওয়ালের জন-সাধারণ তাঁহার গ্রাম অপেক্ষাও প্রিয় ছিল। তাঁহার অনেক কবিতাতেই এই পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বার্ন্‌স্[২৩] যেমন নিজের গ্রাম্য ভাষাকে কাব্যে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, গোবিন্দদাসও তেমনি পূর্ববাংলার প্রাদেশিক ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ববাংলার অখ্যাত ফুল, ফল, লতাপাতা, গাছপালা, তরুলতা, পশুপাখী প্রভৃতির নাম ও সৌন্দর্যবর্ধন তাঁহার কাব্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া আছে।

---

২৩. বার্ন্‌স্, রবার্ট (Burns, Robert)—(১৭৫৯-১৭৯৬ খ্রীঃ)। স্কট্‌ল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি। ইহার ছোট কবিতাগুলি সঙ্গীতের ন্যায় সুমধুর এবং কতকগুলি ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ। ইহার লিখিত "The Cotter's Saturday Night" প্রসিদ্ধ।

'পিপি', 'কোড়া', 'সরালী', 'ক্যালেখ', 'কড়পাই', 'ডাহুক', 'টোপা-ঠালি', 'বেনুন', 'উদ্‌লা', 'খাড়াক্‌খাড়া', 'ওশোরায়', 'শুঁড়শুঁড়ি', 'মোচ্‌ড়ামুচ্‌ড়ি' 'আখট্', 'নাও', 'পাথালি', 'আগড়াগাছ', 'বউনা-গাছ', 'কীল-কুনি' (পিঠে খায় কীল কুনি), 'রগুচিতা ফুল', 'পেঁচ-পোঁছে', 'খৈল-গিলা', 'নীলা-নীলা বাতাস', 'চুলা', 'হেতালে, আম গাছে বৈয়ালো, সোণাপাখী ডাকলো',—'ডাগা', 'হাবা', 'উলুছন', 'নিলাজী বনে', 'কাফিলাগাছ', 'বিয়ারী', 'বহুরী', 'মায়রী'—কবির কবিতায় এইরূপ বহু গ্রাম্য শব্দ এমন সুন্দরভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে পল্লীর একটি অপরূপ সৌন্দর্য মনে জাগিয়া উঠে। গোবিন্দদাস যেন জাত-বাংলার কবি। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের[২৪] মত তিনি পরিচিত পরিবেশ ও পরিচিত মানুষ সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব কবিতার আকারে অবিরাম প্রকাশ করিয়াছেন, মিল, শব্দ-যোজনা ও ব্যাকরণসঙ্গত অলঙ্কারাদির দিকে সাধকের মত দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই ; যাহা মনে আসিয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[২৫] তাই বাংলাসাহিত্য ও গোবিন্দদাস' একটি স্মরণীয় ও বরণীয় অধ্যায়।

কবি গোবিন্দদাসের বংশ-কৌলীন্য বা অর্থ-কৌলীন্য ছিল না, ছিল এক অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা। এই প্রতিভা ছিল তাঁহার

---

২৪. কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৫৮-১৯২০ খ্রীঃ) স্বভাব-কবি ও বিখ্যাত কবি। প্রথমে কবি এলাহাবাদে ওকালতি করেন। পরে কলিকাতার অধুনালুপ্ত বিখ্যাত হাইস্কুল "শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা"-র প্রতিষ্ঠা করেন। 'গোলাপগুচ্ছ', 'অশোকগুচ্ছ', 'শেফালি গুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত কাব্যপুস্তক। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক এবং পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের প্রধান সুর জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন তন্ময় দৃষ্টি।

২৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—'গোবিন্দচন্দ্র দাস', পৃঃ-৪৬।

সহজাত। তাই কবিতা তাঁহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো আসিত। তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান তাঁহার 'যৌবন-স্বপ্নে'র কবিতা। এই কবিতাগুলি সরল কবিত্ব-মাধুর্য্যে এবং প্রেমবৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কবির মোট দশখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যথা—'প্রসূন' (১৮৭০) 'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুঙ্কুম' (১৮৯২), 'মগের মুলুক' (১৮৯৩), 'কস্তুরী' (১৮৯৫), 'চন্দন' (১৮৯৬), 'ফুলরেণু' (১৮৯৬) 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৫), 'শোক ও সান্ত্বনা' (১৯০১) এবং শোকোচ্ছ্বাস' (১৯১০)। গোবিন্দদাস যে 'সনেট'[২৬] রচনাতেও বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন, তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ 'ফুলরেণু' কাব্যটি। 'ফুলরেণু' সনেট কবিতার সমষ্টি 'শোক-সান্ত্বনা' এবং 'শোকোচ্ছ্বাস' ঠিক কাব্যগ্রন্থ নয়, 'কবিতা-পুস্তিকা' বলাই সঙ্গত। কবির সমগ্র কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে "মগের মুলুক" কাব্য-রচনার একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস রাজার সঙ্গে কবির লড়াই-এর ইতিহাস। এক সময় কবি দরিদ্র

---

২৬. 'সনেট'—একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতিকণা একটি বিশেষ গঠন-ভঙ্গীর মধ্য দিয়া সমগ্রতায় ফুটিয়া উঠিলে "সনেট" হয়। 'সনেট' কথাটি ইতালীয় 'সনেত্তো' (অর্থাৎ গীতিময় মৃদুধ্বনি) হইতে আসিয়াছে। ইতালীয় কবি পেত্রার্কা (১৩০৪-৭৪ খ্রীঃ অঃ) এই "সনেটে"র উদ্ভাবক। 'সনেটে' চৌদ্দটি পংক্তি থাকিবে—ইহার বিভাগ দুইটি। প্রথম বিভাগ—যাহাকে অষ্টপদী বা Octave বলা হয়, তাহাতে থাকিবে ভাবকল্পনার সংকেত, আর দ্বিতীয় বিভাগ—যাহাকে ষটপদী বা Sestet বলা হয়, তাহাতে থাকিবে সেই সংকেতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ। অষ্টপদীতে থাকে দুইটি চৌপদী বা quatrain এবং ষট্পদীতে থাকে দুইটি ত্রিপদী বা Tercet। চৌদ্দটি পংক্তি থাকায় কবি মধুসূদন 'সনেটে'-র নাম দিয়াছেন 'চতুর্দশপদী কবিতা'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে কবিতা চতুর্দশপদী হইলেই "সনেট" হয় না। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিহীন কবি গোবিন্দ দাস সনেট রচনায় পাশ্চাত্ত্য-রীতি অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার 'সনেট' বা 'চতুর্দশপদী' কবিতাবলী বাংলা সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ।

প্রজামণ্ডলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া ভাওয়াল রাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ফলে তিনি রাজ-পরিবারের বিরাগভাজন হন এবং দেশ থেকে নির্বাসিত হন। জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়া আজ পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী কবির ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। গোবিন্দ-চন্দ্রের জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা নির্মম দৈব বিড়ম্বনা। 'মগের মুলুক' ভাওয়ালের সামন্ত রাজার অন্যায়, অত্যাচার আর কলঙ্ক-কাহিনীতে পূর্ণ। ইহা একটি তীব্র বিদ্রূপাত্মক কাব্য-রচনা। কবির জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়ার সঙ্গে উক্ত কাব্যের সম্পূর্ণ যোগ রহিয়াছে। যদি কবিকে ও কবির জীবন-কথাকে জানিতে হয় তবে "মগের মুলুক"[২৭] সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকে জানিতে হইবে। আর জানিতে হইবে কবির হৃদয়বিদারক কবিতা—'আমার বাড়ী', 'নির্বাসিতের আবেদন', 'ভাওয়াল' এবং 'কালীয়দমন' প্রভৃতি কবিতা-গুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা। 'চন্দন' কাব্যে ছড়াইয়া আছে নির্বাসিত কবির অশ্রুমালা হাহাকার—

"ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ।
আমি তার নির্বাসিত সন্তান।"

(ভাওয়াল-চন্দন)।

এই সব কবিতাগুলি কবির লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত, উৎপীড়িত এবং নির্বাসিত জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ এক নির্ভরযোগ্য এ্যালবাম।

---

২৭. "মগের মুলুক"—ইহা একখানি ব্যঙ্গকাব্যে। দেবীপ্রসন্নের 'আনন্দ আশ্রমে' বসিয়াই কবি গোবিন্দদাস মাত্র পাঁচদিনে ইহা রচনা করেন। দেবী-প্রসন্নের চেষ্টায় 'মগের মুলুক' কলিকাতার 'প্রকৃতি' নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (৫ই ভাদ্র, ১২৯৯) হইতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হইতে থাকে এবং ২৩শে মাঘের সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। ফলে ভাওয়ালের প্রজাদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার-উৎপীড়নের বহু গোপন কাহিনী ইহাতে পরিপূর্ণভাবে উদ্ঘাটিত হয়। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে "মগের মুলুক" কাব্যটি প্রকাশিত হয়।

কবির সমগ্র কাব্যরচনার মধ্যে 'প্রেম ও ফুল' সবচেয়ে বেশী প্রশংসিত হইয়াছে। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পরেই কবির কবিখ্যাতি পদ্মাপার হইয়া গঙ্গার তীর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে কবি গোবিন্দদাস পশ্চিমবঙ্গে 'প্রেম ও ফুলের কবি' এবং পূর্ববঙ্গে 'ভাওয়াল কবি' বা 'মগের মুলুক' কবি রূপেই পরিচিত। আর এই দুই বঙ্গের সমষ্টিগত পরিচয় হইতেছে—"স্বভাবকবি গোবিন্দদাস"।

মূলতঃ ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বাংলা সাহিত্যে স্বভাব-কবিরূপে চিহ্নিত হইয়া আছেন। কবি ঈশ্বর গুপ্ত[২৮] সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি"। ইহা গোবিন্দ-দাস সম্পর্কেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভে বঞ্চিত এবং স্বদেশে উপেক্ষিত কবি গোবিন্দদাস শুধু খাঁটি বাঙ্গালী কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন বিদ্রোহী বাঙ্গালী কবি এবং স্বভাব কবি।

---

২৮. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২২৩-১২৬৫ বঙ্গাব্দ)—প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। কাঁচড়াপাড়ার হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাল্যকালে লেখাপড়ায় তাঁহার মন ছিল না। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল। তাঁহার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া যান, সেখানেও তাঁহার তাদৃশ লেখাপড়া হয় নাই। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। পত্নী দুর্গামণি সুশ্রী ও বুদ্ধিমতী না থাকায় তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের হয় নাই। তিনি ঠাকুরবাড়ীর যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় ১২৩৭ বঙ্গাব্দে সাপ্তাহিক "সংবাদ প্রভাকর" বাহির করেন। ১২৩৯ বঙ্গাব্দে সংবাদপত্রটি উঠিয়া যায়। পরে তিনি ১২৪৫ বঙ্গাব্দে কানাইলাল ঠাকুরের সহযোগিতায় "সংবাদ-প্রভাকর"-কে দৈনিক আকারে বাহির করেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি ১২৫৩ বঙ্গাব্দে "পাষণ্ড-পীড়ন" পত্রিকা বাহির করেন। এই সময় গৌরীশংকর তর্কবাগীশ (গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য) "রসরাজ" নামে এক পত্র প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহিত কবিতাযুদ্ধে

প্রবৃত্ত হন। পরে দুইখানি কাগজই উঠিয়া যায়। তিনি ১২৫৪ সালে "সাধু-রঞ্জন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের গুরু। তিনি একজন খাঁটি ও শক্তিশালী বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তিনি রাজসভার কবি ভারতচন্দ্র এবং সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনকথা ও তাঁহাদের বহু লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন "প্রবোধ প্রভাকর", "হিতপ্রভাকর", "বোধেন্দু বিকাশ' প্রভৃতি তাঁহার রচিত গ্রন্থ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বংশপরিচয় ও শিক্ষা ॥

কবির বংশ-পরিচয়ের ইতিহাসও দুঃখ-দারিদ্র্যে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর ইতিহাস। তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহেশ্বরদী পরগণার একটি ক্ষুদ্র গ্রামে। এই গ্রামে ভোলানাথ দাস নামে কায়স্থ বংশসম্ভূত জনৈক গৃহস্থের বাস ছিল। তিনি ঋণের জ্বালায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যসঙ্কুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ ভাওয়াল-জয়দেবপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই ভোলানাথ দাস[২৯] গোবিন্দচন্দ্র দাসের পিতামহ ছিলেন।

আজ প্রায় এক শতাব্দীর কথা। ভাওয়াল-জয়দেবপুর তখন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এবং পরিপূর্ণ শ্বাপদসঙ্কুল এক নিবিড় অরণ্যানী। ব্যাঘ্রভয়ে লোকে তখন সদাসর্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিত, রাত্রিতে উচ্চমঞ্চে শয়ন করিত এবং খুব প্রয়োজন ছাড়া বড় একটা কেহ বাড়ীর বাহির হইত না।[৩০] আবার লতাপুষ্পে শোভিত,

---

২৯. ভোলানাথ দাস—কায়স্থ বংশসম্ভূত ভোলানাথ দাস সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম—বুধাই দাস। ভোলানাথ দাসের দুই পত্নী—প্রথমা পত্নীর নাম গৌরমণি এবং দ্বিতীয়া পত্নীর নাম হরসুন্দরী। এই হরসুন্দরীর গর্ভে গোবিন্দদাসের পিতা রামনাথ দাসের জন্ম হয়। রামনাথ দাসের পত্নীর নাম আনন্দময়ী। এই আনন্দময়ীর সন্তান—কবি গোবিন্দদাস। ভোলানাথ দাস তাঁহারই পিতামহ।

৩০. প্রবাদ আছে যে, একশতবর্ষ পূর্বে জয়দেবপুরে একটি অতিকায় ব্যাঘ্রিনীর উপদ্রবে মানুষ সর্বদাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ব্যাঘ্রিনীটির বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে ভগ্ন প্রাচীর অথবা উন্মুক্ত দ্বার দেখিয়া গৃহে প্রবেশ করিত না, ডাকাতের মত দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। তাই তাহার নাম ছিল—"দুয়ারী বাঘিনী"।

দীর্ঘকায় গজারী প্রভৃতি বৃক্ষে পরিপূর্ণ, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর-সমন্বিত শৈলরাজি, দুর্ভেদ্য বনের ভিতর দিয়া প্রবহমান স্বচ্ছতোয়া চিলাই নদী পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহা ছাড়া, আছে নানা রঙ-এর নানা পাখীর কাকলি, নানাজাতীয় জলচরের বিহার লীলা এবং ছোটছোট জলাভূমি বা 'বিল'। আবার সবুজ ঘাসে-ভরা প্রান্তর, যাহার আকর্ষণে মানুষ পাগল-পারা হইয়া যায়। ভাওয়াল তাই প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। ইহারই অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী (১২৬২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা মাঘ) স্বভাবকবি গোবিন্দদাস এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামনাথ দাস এবং মাতার নাম আনন্দময়ী। তিনি তাঁহার রচিত "ফুলরেণু" গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
জয় জয় পুণ্যময়ী ধবলা 'চিলাই'
প্রকৃতি রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর
বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই।
এই দেবপুরবাসী—দেবতা আমার,
জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ',
'সারদা' প্রেয়সী পত্নী প্রেম পারাবার,
দুহিতা 'প্রমদামণি' তাহাদের সাথ।
হারাইয়া আর কত আত্মীয়-স্বজন,
হারায়ে সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর,
স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ,
খেদাইয়া দিছে মোরে দানব অসুর।
যে দেশে যেখানে ভাই, যে ভাবেই মরি
'জয়দেবপুর' বলি বলো 'হরি হরি'।"[৩১]

৩১. আত্মপরিচয়টি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা কবি-জীবনের এক বিচিত্র

—-কবির এই 'আত্মপরিচয়'ই যথার্থ বংশ-পরিচয়। ১৩০৩ সালে কবি এই 'আত্মপরিচয়'টি লেখেন, তখন তাঁহার বয়স বাহান্ন বৎসর। গোবিন্দদাসের দুই পত্নী—'সারদা' ও 'প্রেমদা'। সারদার মৃত্যুর পর কবি প্রেমদাসুন্দরীকে বিবাহ করেন। সারদার গর্ভজাত কন্যা 'প্রমদা' ও 'মণিকুন্তলা' কবির জীবিতকালেই পরলোক গমন করেন। কবির প্রথম পুত্র অর্থাৎ প্রেমদাসুন্দরীর প্রথম সন্তান 'অরবিন্দ'। এই পুত্র জীবিত নাই। বর্তমানে অরবিন্দের এক পুত্র এবং কবি গোবিন্দ-দাসের দুই কন্যা শক্তি[৩২] ও ভক্তি[৩৩] জীবিত আছেন। এই পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একমাত্র 'হেমরঞ্জন দাস' জীবিত আছেন।[৩৪]

ইতিহাস, কবি জীবনের এক নূতন পাঁচালী। কবি তাঁহার জন্মভূমি জয়দেব-পুরকে যে কত ভালবাসিতেন এবং তাহা হইতে নির্বাসনের বেদনা যে কত মর্মান্তিক—আত্মপরিচয়টি তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জয়দেবপুরের নাম পূর্বে "পীরবাড়ী" বলিয়া প্রচলিত ছিল। ভাওয়াল রাজবংশের পূর্বপুরুষ জয়দেব রায় এখানে বাসস্থান নির্মাণ করিয়া এবং 'বিনা সেলামী'তে ও 'বিনা জমা'য় অথবা অতি নামমাত্র জমায় জমি প্রদান করিয়া এক বিরাট লোকালয় গড়িয়া তুলিয়া ইহার নাম রাখেন—"জয়দেবপুর"। তাই "জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর' এবং "জয়দেবপুর' বলি বলো 'হরি হরি"—একদিকে স্বদেশপ্রীতি এবং অপরদিকে জমিদার 'জয়দেব রায়ে'র প্রতি জয়ধ্বনি কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসার নিদর্শন।

৩২. শক্তি—কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের দুই কন্যা—বড় শক্তি এবং ছোট ভক্তি। শক্তির স্বামীর নাম—সতীশচন্দ্র মিত্র। তাঁহার চার ছেলে, দুই মেয়ে। বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুরে বাস করেন।

৩৩. ভক্তি—গোবিন্দ দাসের ছোট কন্যার নাম ভক্তি। তাঁহার স্বামীর নাম শ্রীহরিপদ ভৌমিক। তাঁহার এক ছেলে, দুই মেয়ে। বর্তমানে বর্ধমান জেলায় বাস করেন।

৩৪. হেমরঞ্জন দাসের স্ত্রীর নাম সবিতারাণী দাস। সাক্ষাৎকালে কবিপুত্র বললেন, তাঁহার একটি নাবালক পুত্র আছে, নাম শ্রীবিশ্বজিৎ দাস, বয়স দুই বৎসর।

'হেমরঞ্জন দাস' কবির তৃতীয় পুত্র, প্রথম পুত্র 'অরবিন্দ' (ভোলা) এবং দ্বিতীয় পুত্র শরদিন্দু (বরুণ)। আর 'চিলাই' নদী কবির জীবনেতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই নদীর তীরস্থ শ্মশানেই কবি তাঁহার প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে অশ্রুজলে বিদায় দেন ঃ—"

'সে দেশে চিলাই তীরে, বিধৌত রজত নীরে,
আজিও শ্মশান শয্যা আছে সারদার।'

—এই 'সারদা'র মৃত্যুর পর ভাওয়াল-জয়দেবপুরে কবি তাঁহার শ্যালক শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিতেন। রাজবাড়ার দীঘির পশ্চিম পাড়ে যে বাড়ীটি, তাহাই গোবিন্দদাসের জন্মস্থান—জন্মভিটা। এই বাড়ীটিই পরে গোবিন্দদাস তাঁহার পিসতুতো ভাই ভগবানচন্দ্র ঘোষের নামে লিখিয়া দেন। কিন্তু সারাজীবন কবির মনে জাগে মাইকেল মধুসূদনের সেই কথা—"রেখো মা দাসেরে মনে এই মিনতি করি পদে"। ভাওয়ালের 'মোহনরূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ' কবির নিকট 'স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী' রূপে প্রতীয়মান। ভাওয়াল যেন কবির নিকট স্বর্গের নন্দন কানন এবং মর্ত্যের অমরাবতী। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া কবি যেন জন্মভূমির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিপুণ শিল্পীর ন্যায় তুলির দুই-একটি টানে রেখাচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

"শত স্বর্গ শত কাশী, তার চেয়ে ভালবাসি,
অই যে অরণ্যপূর্ণা জননী আমার,
শত গঙ্গা হতে ভাই, পুণ্যতোয়া ও চিলাই,
কত ঘাট ওর তীরে মণি-কর্ণিকার।"

'ভাওয়াল' কবির নিকট স্বর্গের চেয়েও প্রিয়, তাহার প্রতিটি ধূলিকণা কবির নিকট অমৃতকণা—একদিকে জন্মভূমি, অপরদিকে জননী। আর এই দুই পরিবেশে লালিত-পালিত হইয়াছেন স্বভাবকবি গোবিন্দদাস। 'ভাওয়াল' যেন কবির শৈশবের স্মৃতিভূমি, যৌবনের



সস্ত্রীক কবি পুত্রের সঙ্গে লেখক (বামে)

লীলাভূমি এবং বার্ধক্যের বারাণসী। প্রাণতুল্য প্রিয় এই ভাওয়ালের প্রশংসায় কবি তাই পঞ্চমুখ ঃ—

"জননী দুহিতা নারী, যত কিছু সে আমারি,
সে আমার যাগযজ্ঞ, সে আমার ধ্যান।
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান।"

শয়নে-স্বপনে নিশি-জাগরণে কবির একমাত্র ধ্যান ছিল 'ভাওয়াল'। তাই রূপে-রসে-গন্ধেভরা ভাওয়াল-প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য স্বভাব-কবির উপযুক্ত লীলা-নিকেতন।

স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবন-কোঠির একদিকে ছিল দারিদ্র্য এবং অপরদিকে ছিল কবিত্ব। কিন্তু দারিদ্র্য কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই, প্রতিহত করিতে পারে নাই, বাধা দিয়াছে মাত্র। জন্মাবধি দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, আর করিতে হইয়াছে অন্যায়-অত্যাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। তাই স্বভাবকবির আর এক পরিচয় 'বিদ্রোহী' কবি। বৈষয়িক সুখের আকর্ষণে ও প্রলোভনে তিনি কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই, আপোষমূলক মনোভাব দেখান নাই। তাই শৈশবে পিতৃহীন অবস্থায় একদিন যাঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ঘটনাচক্রে তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে কবির পিতা রামনাথ দাস মহাশয় পরলোক গমন করেন। যাত্রালগ্নের প্রথমেই কবি 'অনাথ' হইলেন, অথচ দরিদ্রের সংসারে তখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতামহ, পিতামহী ও মাতা বর্তমান ছিলেন। আর তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর জগশ্চন্দ্র দাস (জগদ্বন্ধু দাস) তখন ছিলেন সূতিকাগারে। রামনাথ দাস একমাত্র উপার্জনক্ষম হওয়ায় তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র পরিবারটি অর্থ-সংকটের চরম সীমায় গিয়া পৌঁছাইল। এইরূপ অবস্থায়

'পরিত্রাতা'রূপে আবির্ভূত হইলেন ভাওয়ালের ভূস্বামী কালীনারায়ণ রায়। তিনি প্রথমে এই পরিবারকে মাসিক চার টাকা সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন এবং পরে কতক নিষ্কর জমি প্রদান করেন। ফলে দরিদ্র পরিবারে পিতৃহীন বালক গোবিন্দদাসের লেখাপড়ার প্রশ্নই উঠে নাই। তাই কবিত্ব শক্তিতে গোবিন্দদাস অসামান্য হইলেও বিদ্যাশিক্ষায় অতি সামান্য ছিলেন।

অষ্টম বৎসর বয়সে গোবিন্দদাসের অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ হয়। কবিগৃহের অনতিদূরে তাঁহার পিতার জ্ঞাতি-সম্পর্কান্বিত এক নিঃসন্তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাস করিতেন। অপুত্রক ছিলেন বলিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই বালক গোবিন্দদাসকে পুত্রস্নেহে ভালবাসিতেন, কাছে রাখিতেন। এই গৃহেই কবির বিদ্যাশিক্ষার প্রথম পাঠ সূচিত হয়।[৩৫] তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের শ্যালক নন্দরাম ঘোষ সেখানে বাস করিতেন। জয়দেবপুরে তাঁহার খ্যাতি ছিল সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য। এই নন্দরাম ঘোষ মহাশয়ই বালক গোবিন্দচন্দ্রকে সর্বপ্রথম 'ক', 'খ' লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের অনুগ্রহে গোবিন্দদাস রাজবাড়ীতে রাজদুহিতা কৃপাময়ী দেবীর সঙ্গে কলাপাতায় লেখা অভ্যাস করেন। কৃপাময়ী দেবীর শিক্ষক ছিলেন—শ্রীকালীনাথ

---

৩৫. গোবিন্দদাসের লেখাপড়া নানাকারণে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। জানা যায় যে, কবি বিদ্যাশিক্ষায় অতি অল্প সময়ই অতিবাহিত করিতেন। লেখাপড়া অপেক্ষা খেলাধূলায় তাঁহার প্রবল আসক্তি ছিল। তাঁহার একটি অপ্রকাশিত পত্রে ইহার সমর্থন মেলে "নন্দরাম ঘোষের নিকট আমি লিখিতাম আর জ্যাঠা মহাশয়ের গরুর চাকর (রাখাল) 'জাগা' চাঁড়ালের সঙ্গে গিয়া গরু রাখিতাম। গরু চরাইতে আমি বড় আনন্দ অনুভব করিতাম।" কবির জীবনে ইহা শাপে বর হইয়াছে। স্বভাবকবির পক্ষে প্রয়োজন ছিল ভালভাবে প্রকৃতিকে দেখা এবং চেনা।

মিত্র। কিন্তু গোবিন্দদাসের লেখাপড়া কৃপাময়ী দেবীর নিকটই হইয়াছিল। কৃপাময়ী দেবী ভ্রাতৃস্নেহে নিজের হাতে ধরিয়া গোবিন্দ-দাসকে হাতের লেখা শিখাইতেন এবং পড়াইতেন। অবশ্য এই স্নেহ গোবিন্দদাসের ভাগ্যে বেশীদিন টেকে নাই। কারণ দুঃখে যাহাদের জীবন গড়া তাহাদের আবার সুখ কিসে? অল্পদিনের মধ্যেই কালীনাথ মিত্র মহাশয় পরলোকগমন করেন। তখন গোবিন্দ দাস জয়দেবপুর বাজারের 'মঙ্গল পাল' এবং 'রতন সরকার' নামে দোকানদারগণের নিকট লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করেন। এইখানে "বর্ণমালা" এবং "ধারাপাত"-এর পাঠ তিনি শেষ করেন। কিন্তু কৃপাময়ীর অপার স্নেহ-প্রীতির কথা কবি কোন দিন ভুলেন নাই। উত্তর-জীবনে গোবিন্দদাস তাঁহার "প্রেম ও ফুল" কাব্যে লিখিয়াছেন—

"আজিও কি আছে মনে ভোলনি ভগিনি
হাতে ধরে শিখায়েছ আদরে আপনি।
কেবল তোমার স্নেহে, আজো প্রাণ আছে দেহে,
কৃপাময়ী করুণার তুমি নির্ঝরিণী!"

কবি গোবিন্দদাসের আর একজন সহপাঠীর নাম ছিল বসন্তকুমার দে। উত্তরকালে বসন্তকুমার কবির দলের একজন বিখ্যাত সরকার হইয়া-ছিলেন। দীনবন্ধু ও রজনীকান্ত নামে গোবিন্দদাসের আরো দু'জন সহাধ্যায়ী ছিলেন। পরবর্তী জীবনেও কবি ইহাদের মধুর সান্নিধ্য ও সাহচর্যের কথা ভুলিতে পারেন নাই। "প্রেম ও ফুল" কাব্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"বসন্ত প্রাণের ভাই, দু'বছর দেখা নাই
আজি যে দেখিতে তোরে কত আকিঞ্চন।
কোথা সত্যভামা, বিন্দু, প্রীতির পবিত্র ইন্দু
দেখিলে সিন্ধুর মত উথলিত মন।
কোথা ভাই দীনবন্ধু, রজনী এখন।

কবির পড়াশুনা বিষয়ে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। এই কালীনারায়ণ রায়ের একটি সখের কবিদল ছিল। এই কবিদলের সরকার রামদয়ালের নিকট গোবিন্দদাস লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহার পর কবি গোবিন্দদাসের লেখাপড়ার সাময়িক বিরতি ঘটে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময় জয়দেবপুরে কোন বিদ্যালয় ছিল না। রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের[৩৬] বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনে রাজা কালীনারায়ণ জয়দেবপুরের রাজবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য কবি গোবিন্দদাসের আগ্রহ, বায়না বা জিদ বাড়িলে এবং অবশেষে কান্নাকাটি করিতে থাকিলে প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীপ্যারীমোহন গোস্বামী[৩৭] রাজবাড়ীতে যাইয়া রাণী সত্যভামার নিকট আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন। তখনকার দিনে পাঠশালার বেতন ছিল 'আধ আনা'। এবং 'শিশুশিক্ষা' প্রথম ভাগের দাম ছিল এক আনা। সামান্য এই অর্থের সংস্থানও কবি-পরিবারের তখন ছিল না। ফলে রাণী সত্যভামা এই জন্মদুঃখী বালকের বিদ্যাশিক্ষার

---

৩৬. রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী (১২৬৫-১৩০৮ বঙ্গাব্দ)—ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত জয়দেবপুরের জমিদার ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী। ইনি সঙ্গীত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবিরাজ কৃষ্ণ রায় ইঁহারই অর্থানুকূল্যে সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিবিধ সৎকার্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

৩৭. শ্রীপ্যারিমোহন গোস্বামী ছিলেন কবির পিতার গুরুপুত্র এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের মধ্যম মাতুল। ইনি বিদ্যোৎসাহী ও পরোপকারী ছিলেন। রাজপরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় এবং কবির সংসারের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ অবহিত হওয়ায়, রাণী সত্যভামা তাঁহার কথানুযায়ী কবির শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যয়ভার বহন করেন।

জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং রাজবাড়ীতে আনিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। এইভাবেই গোবিন্দদাসের শৈশবকাল ও শৈশব-শিক্ষা[৩৮] অতিবাহিত হয়। এই সম্বন্ধে একখানি অপ্রকাশিত পত্রে কবি গোবিন্দদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়—"রাজপরিবারের সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন। এবং কৃপাময়ী কনিষ্ঠ সহোদরের মত আমাকে ভালবাসিতেন। স্কুলে যাওয়ার সময় বেলা অধিক হইলে, রাজকুমারকে যখন রাণী খাওয়াইয়া দিতেন, তখন আমার হাতেও এক এক গ্রাস ভাত মাখিয়া দিতেন। রাণীকে মা এবং কৃপাময়ী দেবীকে ভগিনী বলিয়াই জানি।"

এই রাজপরিবারের কথা গোবিন্দদাস কোনদিনই ভুলিতে পারেন না। ভাগ্যচক্রে রাজপরিবারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ হইলেও কবি জননী জন্ম-ভূমি রাণী সত্যভামা এবং কৃপাময়ী দেবীকে[৩৯] চিরকাল মনে রাখিয়াছিলেন। রোগে এবং শোকে-দারিদ্র্যে বিপর্যয়ে কবি-জীবনে এই মধুর মূর্তিটি একমাত্র সান্ত্বনা ও রক্ষাকবচ।

ছাত্রবৃত্তি স্কুলে পড়িবার সময় গোবিন্দচন্দ্রের কবিত্বশক্তির উন্মেষ ঘটে। মাত্র তেরো চৌদ্দ বৎসর বয়সেই তিনি জয়দেবপুর স্কুলের 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'য় স্বরচিত কবিতা নিয়মিত পাঠ করিতেন।

---

৩৮. গোবিন্দদাস তাঁহার শৈশবশিক্ষা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—গণিত শাস্ত্রে তিনি নিতান্ত অপটু ছিলেন। এইজন্য শিক্ষকের নিকট অনেক শাস্তি পাইয়াছিলেন। সেই সময় বাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় মোট নম্বর দেখিয়া ফল নির্ধারণ করা হইত। গণিতে অকৃতকার্য হইয়াও কৃপাময়ী দেবীর প্রভাবে তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং যথাসময়ে সেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন।

৩৯. কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—"কৃপাময়ী দেবীর স্বামী বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাজপরিবারের এই সকল স্নেহ ও মমতার কথা এখনও স্মরণ করিতে আমার শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয়।"

—অপ্রকাশিত পত্র।

কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণে ইহাই ছিল প্রথম অধ্যায়। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় ছাড়িবার পর রাজা কালীনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত 'প্রজাহিতৈষিণী সভা'তে-ও গোবিন্দচন্দ্র নিজের লেখা একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিল রাজা কালীনারায়ণ রায়ের প্রশস্তি এবং তাঁহার প্রতি কবির শ্রদ্ধা-নিবেদন। ভাওয়ালকে কবি কতখানি ভালবাসিতেন, জন্মভূমি যে 'স্বর্গপুরী', প্রজারা যে রাজ-ভক্ত এবং রাজপরিবার যে জনগণের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর, তাহার পরিচয়ও পাওয়া যায় এই কবিতায়।

"দ্বেষ নাই হিংসা নাই, যেন সব ভাই ভাই
কেবলি স্নেহেতে মাখা ছিল পরস্পর।
ছিল সবে শান্তি সুখে, সতত প্রসন্ন মুখে,
শতদলে গাঁথা যেন শতদল থর।
কত ছিল ক্ষেত খোলা, শস্যপূর্ণ ছিল গোলা,
ইন্দিরার যেন সব মন্দির সুন্দর।
সবারি আছিল হাল, গোয়ালে গরুর পাল
দুধে ভাতে সকলেই পূরিত উদর।
আছিল নিঃসঙ্গ মনে, প্রিয় পরিবার সনে,
মা বোন সুন্দরী হ'লে নাহি ছিল ডর।
নিশীথে পতির বুকে, সতী ঘুমাইত সুখে,
কাড়িয়া নিত না কোন দানব পামর।
সে দেশে আছিল ভাই সুখে নারী নর।
সে দেশে আছিল ভাই দেব-নিকেতন,
ধার্মিক প্রজার প্রিয়, দেবোপম পূজনীয়,
সে দেশে আছিল রাজা কালীনারায়ণ।"

শতবর্ষ পূর্বে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের স্নেহ ও অনুগ্রহে পুষ্ট প্রজারা সুশাসনে কিরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন, কবি তাহারই এক মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কন

করিয়া 'প্রজাহিতৈষিণী' সভাতে উপহার দিয়াছিলেন। স্বভাবতঃই বিদ্যোৎসাহী রাজা কালীনারায়ণ রায় ইহাতেই খুশী হইয়াছিলেন এবং কবির প্রতিভা-স্ফুরণে উৎসাহিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গোবিন্দদাসকে ঢাকার নর্মাল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার জন্য মাসিক পাঁচটি করিয়া মুদ্রা ও বৃত্তি নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু গণিতে অপটু থাকায় এবং পারিবারিক ও অন্যান্য প্রতিকূল ঘটনা ঘটায় গোবিন্দদাস এই বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। অবশ্য এখানে তিনি কিছু সংস্কৃত ভাষাও শিখিয়াছিলেন।

অবশেষে ঢাকা নর্মাল বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কবি গোবিন্দদাস বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। পড়াশুনার ইচ্ছা থাকিলেও ঐকান্তিক ইচ্ছা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা তাঁহার কোনদিন ছিল না। ইহার জন্য যে ধৈর্য, অধ্যবসায় ও নিরলস সাধনার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার প্রকৃতিতে নাই বলিলেই চলে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত লোক, কোন কিছুতে বেশীদিন লাগিয়া থাকা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। শীঘ্রই ইহার প্রমাণও মিলিল। কালীনারায়ণ রায় গোবিন্দদাসের একাকীত্ব ও বেকারত্ব ঘোচাইবার জন্য তাঁহাকে ভাওয়ালের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রামে নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যালয়ে হেড পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

কিন্তু পণ্ডিতি বেশীদিন ভাল লাগে না। ধরা-বাঁধা নিয়মের গণ্ডীতে থাকিতে গোবিন্দদাসের মন চায় না। মন কি চায়, তাহাও কবি জানেন না। তাই মাত্র মাস কয়েক কাজ করিবার পর নিজের ইচ্ছায় ঐ চাকরি ছাড়িয়া তিনি ঢাকায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। এই ঘটনায় কালীনারায়ণ রায়ের মনে ব্যথা লাগিল। শিলালিপিতে আঁচড় পড়িল তথাপি তাহার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটায় রাণী সত্যভামা এই বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিলেন। কিন্তু বিদ্যালয়ে শব-ব্যবচ্ছেদের ভয়ে কবি কাহাকেও

কিছু না বলিয়া এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই—চিকিৎসা বিদ্যালয় তথা "মেডিকেল স্কুল" পরিত্যাগ করিলেন। নিজের দোষে গোবিন্দচন্দ্রের শিক্ষালাভ আশানুরূপ হইল না। এমন কি ইংরেজী শিক্ষার যে সুযোগটুকু তিনি পাইয়াছিলেন তাহাও অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। তবে ইংরাজী শিখিলে আমরা কবি গোবিন্দদাসকে একজন খাঁটি বাঙ্গালী কবিরূপে পাইতাম কিনা সন্দেহ।

মূলতঃ গোবিন্দদাস স্বভাবকবি, বাঙ্গালী কবি, গীতিকবি, তাঁহার সঙ্গে যেন অন্যান্যদের তুলনা হয় না। কারণ কবি বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি সকলেই ইংরেজী ভাষায় শিক্ষিত কবি, তাঁহাদের গীতিকবিতায় ইংরেজীর ভাবাদর্শ প্রতিফলিত। আর কবি গোবিন্দদাস যেন—

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে—
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।[৪০]

সুতরাং সাহিত্যের ঐকতানে এই সব রাজেন্দ্র-সমাগমে কবি গোবিন্দদাস যেন নিমন্ত্রিত হইয়াও উপেক্ষিত, সহজাত প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও যেন অবহেলিত! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে কবি গোবিন্দদাস ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ হইলেও ইংরাজী শব্দের প্রয়োগে অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

"সে জানে না ভ্রাতৃভাব
সে জানে না 'ফিরিলাভ'
পরপুরুষের ছায় দেখে ভয় পায়।
যায় না বাগান পার্টি,
ভেরি অগ্নি, —ভেরি ডার্টি
ইয়ারের ডিয়ারের চীয়ারে ডরায়!
কোণে বসে ভালবাসে শীলতা কোথায়?"

---

৪০. মাইকেল মধুসূদন দত্ত—মেঘনাদ বধ কাব্য, ৪র্থ সর্গ 'কবিগুরু বন্দনা।'

আর একটি সুন্দর অনুপ্রাসের উদাহরণ দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহারে আসিব—

"বাজছে কেমন বিজয় ব্যাণ্ড, নৃত্য করছে শ্যাকহ্যাণ্ড
কেমন গ্র্যাণ্ড অভ্যর্থনা অকূল জলধির।
তোমরা বটে আসল মানুষ, তোমরা বটে বীর।"

সত্যই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়ায় কবি তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান পান নাই। তাই তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের 'আসল মানুষ' এবং 'বীর' বলিয়া সম্বোধন করিয়া নিজেকে বলিয়াছেন—

"কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পূরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা

*　　*　　*

পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী।"

স্বল্প পরিসরে স্বল্পতম জীবনের করুণ অভিব্যক্তি কি সুন্দর। কি মর্মস্পর্শী। গিল্‌টিকরা চাক্‌চিক্যময় সভ্যতায় লালিত-পালিত না হওয়ায় তাঁহার কাব্য ও কবিতা ছিল কিঞ্চিৎ অমার্জিত, কিন্তু তীব্র আবেগ এবং গভীর আন্তরিকতায় অভিসিঞ্চিত তাঁহার কবিতার বৈশিষ্ট্য পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক বর্ণনা, গভীর দরদ ও বাস্তববোধ এবং প্রগাঢ় পত্নীপ্রেম। শুধু তাহাই নহে, কবিতার ভাব-ভাষা-ছন্দ-অলংকার প্রয়োগ-রীতিতেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন স্বাদ আনিয়াছে। তাই কবি গোবিন্দদাস ছিলেন উন্নতশীর্ষে সমুজ্জল এক নতুন যুগের নতুন মানুষ।

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্রোহী কবি গোবিন্দদাস

বাংলা কাব্য সাহিত্যে প্রধানতঃ তিনজন বিদ্রোহী কবির পরিচয় পাওয়া যায়—মাইকেল মধুসূদন, কবি নজরুল এবং গোবিন্দদাস। মাইকেলের নামের মধ্যেই আছে তাঁহার বিদ্রোহী সত্তা। চিরাচরিত ভাবধারা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহী মন লইয়াই তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, পয়ারের নিগড় ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, রূপ দিয়াছেন বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনার, নূতন ভাবে নূতন মনে গড়িয়াছেন পুরুষকারে জয়ী রাবণ ও মেঘনাদকে এবং দৈববলে জয়ী 'ভিখারী রাঘব' ও অনুজ লক্ষ্মণকে। তারপর, চির বিদ্রোহী কবি নজরুলের একহাতে বাঁধা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য। তাঁহার বিদ্রোহ—অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভণ্ডামি, গূঢ়তা ও ছলনার বিরুদ্ধে। 'জাতের নামে যারা বজ্জাতি' করে তাহাদের প্রতি ধ্বনিত হয় তাঁহার হুঁশিয়ার-বাণী, গীত হয় সাম্যবাদের জয়ধ্বনি—

"গাহি সাম্যের গান—
যেখানে মিশিয়াছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান খৃশ্চান।"

নজরুল কোন সম্প্রদায়ের কবি নন—সর্বহারা কবি, সাম্যবাদের কবি, সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কবি।

আর আজন্ম দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি হইতেছেন স্বভাবকবি গোবিন্দদাস। দারিদ্র্য যতই পীড়া দেয়, ক্ষুধায় দেহ যতই এলাইয়া পড়ে, ততই গোবিন্দদাস বিদ্রোহী হইয়া উঠেন এবং দুঃখের দেবতাকে বরণ করিয়া লন। মাইকেল আশার ছলনায় ভুলিয়া

অনাহারে-অনিদ্রায়-কায়ক্লেশে দিন কাটাইয়াছেন ; নজরুল দারিদ্র্যকে করিয়াছেন 'মহান' আর চিরসঙ্গী করিয়াছেন কবি গোবিন্দদাস। দারিদ্র্যের মধ্যেই গোবিন্দদাসের জন্ম এবং দারিদ্র্যের মধ্যেই জীবনের পরিসমাপ্তি। মাইকেলের জন্মভূমির প্রতি যে প্রার্থনা—"রেখো মা দাসেরে মনে এই মিনতি করি পদে" ও তাহাতে যে আন্তরিক স্বদেশপ্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, সেই একই প্রেরণায় নজরুল "কারার ঐ লৌহ-কপাট" ভাঙ্গিতে চাহিয়াছেন, আর বৃটিশের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—

"স্বদেশ স্বদেশ কচ্চ কারে, এদেশ তোমার নয়,
এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেন্ এই যে বাড়ী,
এই যে থানা জেহেলখানা—এই বিচারালয়,
লাট, বড়লাট তারাই সবে, জজ ম্যাজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোম্‌রা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়।"

'স্বদেশ' যে নাড়ীছেঁড়া ধন, ইহার জন্য হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে বীর শহীদরা যে জীবনের জয়গান গাহিয়া যান—তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবার মতন ক্ষমতা যেন বৃটিশ সরকারের নাই। তাই উপরি-উক্ত ছত্র কয়টির মধ্যে একদিকে যেমন কবির বৃটিশের সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে, অপরদিকে তেমনি স্বদেশ-বাসীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় তাহাদের সঠিক অবস্থা, স্থান ও মান সম্বন্ধে সচেতন করিবার প্রয়াস পরিস্ফুট।

আজন্ম বিদ্রোহী কবি অন্যায়ের সঙ্গে অত্যাচারের সঙ্গে কোন দিনই আপোষ করেন নাই। তিনি আজন্ম-বিদ্রোহী বীর, চির উন্নত যাঁহার শির। রবীন্দ্র সমসাময়িককালে গোবিন্দদাসই একমাত্র কবি, যিনি খ্যাতি, স্বীকৃতি ও সমর্থন না পাইয়াও অন্যায়ের সঙ্গে ও অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন, অন্যায়কারী ও অন্যায় প্রশ্রয়-

কারীকে 'তৃণসম' জ্ঞান করিয়াছেন। বৈষয়িক সুখের লোভে ও প্রলোভনে পড়িয়া নিজের আদর্শকে তিনি কোনদিনই বিসর্জন দেন নাই। তিনি জানিতেন—কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক, তার বিদ্ধ করার ক্ষমতা আছে। তাই অসাম্য, অত্যাচার, ভণ্ডামি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁহার জেহাদ। পরিণামে নিজের ক্ষতি হইবে জানিয়াও তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতেন এবং প্রতিকারের জন্য হাসিমুখে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট লাঞ্ছনা সহ্য করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অসম সাহসিকতার নিদর্শন। তিনি অতীতের স্মৃতিতে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহিতেন না, ঘরের কোণে কানাকানি করিতে ভালবাসিতেন না, বাক্‌সর্বস্ব পুরুষের মত কথার ফুলঝুরি সৃষ্টি করিতে চাহিতেন না। তিনি ছিলেন একান্ত বাস্তববাদী সংগ্রামী পুরুষ। বাঙ্‌লাকে ভালবাসিয়াই তিনি বাঙালীকে ভালবাসিয়াছিলেন। বাঙালীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ছিল অপরিসীম। অতীতের অধঃপতিত জাতিকে বাঙালী আবার জাগাইতে পারিবে, বহু অসম্ভব সম্ভব করিতে এবং বাঙালীর নেতৃত্বেই ভারত যে আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারিবে—এই বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এই আত্মপ্রত্যয়ে তাঁহার আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বাঙালীর ক্ষণিক দৌর্বল্য ও ভীরুতাকে যদি আঘাত করা যায়, তবে সেই আঘাতে বাঙালী মরিবে না, তাহার চৈতন্য হইবে এবং মোহ ছুটিয়া যাইবে। তাই তিনি বাঙালীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"নাহি বীর্য, নাহি তেজ,
উদরে গুষ্ঠিত লেজ,
বিলুণ্ঠিত পরপদে সকল সময়।
*　　*　　*
এমন পশ্চাদ্‌গামী
সদা ঘৃণা করি আমি,
রাখিয়া মারি ঝাঁটা যত মনে লয়।"

—বঞ্চিত বুকের পুঞ্জীভূত বেদনার ইহা একটি বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র, বাঙালীর প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা নয়, ইহা তাঁহার স্নেহের শাসন। সর্বপ্রকার দুর্বলতা, জড়তা ও ক্লীবতাকে দূর করিয়া পদে পদে পরাজয়, অপমান-লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে পদদলিত ও মথিত করিয়া বাঙালী যাহাতে অগ্রসর হইতে পারে—ইহা তাহারই আহ্বান। বাঙালীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য তিনি বিবেকানন্দের[৪১] 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' অভিমন্ত্রে উজ্জীবিত করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যের

---

৪১. স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২—১৯০২ খ্রীঃ) বাল্য নাম বিশ্বেশ্বর, আর বিদ্যালয়ে প্রবেশকালে পরিবর্তিত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। পিতা কলিকাতা সিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্ত। ১৮৮৪ খ্রীঃ ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন পাঠ করিয়া প্রথম জীবনে ইনি নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। পরে ঠাকুর রামকৃষ্ণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া আকৃষ্ট হন এবং ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণের তিরো-ভাবের পর ছয় বৎসর ইনি হিমালয়ে অবস্থান করেন। পরে তথা হইতে গমনপূর্বক মাদ্রাজে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে আমেরিকার চিকাগো শহরে 'Parliament of Religion' নামক ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করেন। ইঁহার তৎকালীন বক্তৃতায় আমেরিকাবাসীরা মুগ্ধ হইয়া যায় এবং মিঃ স্যাণ্ডস্‌বার্গ ও মাদাম লুই ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে আসিলে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ম্যাক্সমূলারের সহিত ইঁহার আলাপ হয় এবং মিস মার্গারেট নোবল (সিস্টার নিবেদিতা) ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি বেলুড় মঠ ও আলমোড়া ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং রামকৃষ্ণ মিশন গঠন করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ চিকিৎসার জন্য পুনরায় আমেরিকায় গমন করিয়া সান্‌ফ্রান্‌সিসকো নগরে ইনি একটি বেদান্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারী নগরীর ধর্ম-মহাসভায় যোগদান করিয়া ইনি বক্তৃতা করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া 'বেনারস ব্রহ্মচর্যাশ্রম', 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। শিক্ষা ও দর্শন বিষয়ে ইঁহার বহু গ্রন্থ আছে।

ও শক্তির পূজারী। যেখানেই তিনি শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন—তাহা দেবতা-নর-রাক্ষস যাহার নিকটেই হোক-না-কেন, সেইখানেই তিনি নিবেদন করিয়াছেন তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। তাই মাইকেলের মত তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদিত হইয়াছে পুরুষকারে জয়ী রাবণদের প্রতি, ঘৃণা বর্ষিত হইয়াছে—দুর্বল, স্বপ্নবিলাসী, দৈববলে বিশ্বাসী মানুষদের প্রতি, তাই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতি-বৎসল কবি মানুষের মত মানুষ না দেখিয়া, পুরুষকারে জয়ী চাঁদসদাগরের[৪২] মত মানুষ না পাইয়া অসুরদের স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতি-প্রীতি ও বীর্যবত্তার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"বিশ্ববাসীর আধিপত্য
লুটছ বটে স্বর্গমর্ত্য,
কার থাকলে সে সামর্থ্য নেয় না কহিনুর।

* * * *

সাবাস বাহাদুর তুমি হে, সাবাস বাহাদুর,
প্রতিশোধের প্রতিমূর্ত্তি শত্রুজয়ী শূর।"

এবং অসুরেরা যে দেবতাদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহার জন্যও কোন ক্ষোভ নাই তাঁহার মনে—"স্বর্গ হতে অমর স্বর্গ কলে' তুমি দূর"। কারণ অসুরদের বীর্য, শক্তি ও সামর্থ্য তাঁহাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে। তাই সর্বশক্তিমান ভগবানের নিকট তাঁহার প্রার্থনা রাজ্য নয়, ঐশ্বর্য নয়, মুক্তি বা মোক্ষ নয়, এমনকি

৪২. চাঁদ সদাগর—চম্পাই নগরের বিখ্যাত বণিক। ইঁহার পুত্রের নাম লখিন্দর। ইনি মনসা-বিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া লখিন্দর বিবাহ-রাত্রিতে সর্পদষ্ট হয়। পুত্রবধূ বেহুলা স্তব করিলে মনসা দেবী লখিন্দরকে বাঁচাইয়া দেন। চাঁদ সদাগর বাম হাতে পূজা দিয়া মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচার করেন। পুরুষকারজয়ী এই চরিত্রটি মধুসূদনকে আকৃষ্ট করিয়াছিল রাক্ষস রাজা রাবণের চরিত্র-অঙ্কনে।

বিপদে রক্ষা করাও নয়, তাঁহার শুধু প্রার্থনা—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধূলার তলে"। ইহা সকলের নিকট দুর্বলের আত্মসমর্পণ নয়—বীরের নিকট বীরের আত্মনিবেদন, মহত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

আরও অনেক কবিতাতেই তাঁহার এই শক্তিপূজার মনোভাব দৃপ্ত ভঙ্গিমায় ব্যক্ত হইয়াছে। কার্তিক সম্বন্ধে যে পৌরাণিক ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, কার্ত্তিক[৪৩] হইতেছেন বীরশ্রেষ্ঠ, দেব সেনাপতি। অসুর দলন করিয়া দেবতাদের অপসারণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশের শিল্পীরা কার্তিকের যে মূর্তি পরিকল্পনা করিয়াছেন, গোবিন্দদাস তাহার মধ্যে সেই বীরশ্রেষ্ঠ কার্তিককে দেখিতে না পাইয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

"কোথা তব বর্ম চর্ম, এই কি বীরের কর্ম ?
এ দেখি বিষম কৃপা 'কেরেপের' প্রতি,
কোথা বা সে মালকচ্ছ, সে বুঝি গয়াংগচ্ছ,
আগচ্ছ ঢাকাই ধুতি, ত্রিকচ্ছে বসতি।
বিজয় কিরীণ খুলে, এলবার্ট এলে তুলে,
পায়ে মেসফিল্ড জুতা ফুলবাবু অতি।

৪৩. কার্ত্তিক—শিবের পুত্র। ইনি কৃত্তিকাগণের স্তন্য দ্বারা পালিত হন বলিয়া ইঁহার নাম 'কার্ত্তিকেয়' হইয়াছে। দেবতাদের সেনাপতি হইয়া ইনি তারকাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম 'তারকারি'। শংকরের ঔরসে পার্বতীর গর্ভে দেবপীড়ক সন্তানের জন্ম হইবে জানিয়া দেবগণ রমণ-নিরত শংকর ও পার্বতীর সমীপে উপস্থিত হইলে শংকর উত্থান করাতে তাঁহার বীর্য মাটিতে পড়ে, কিন্তু পৃথিবী উহা ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। অগ্নি হইতে উহা শরবনে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা হইতে কার্তিকের উৎপত্তি। সেইখানে ইঁহাকে কৃত্তিকাগণ লালনপালন করেন। ইঁহার আর এক নাম স্কন্দ। ইঁহার পত্নীর নাম দেবসেনা।

কোথা সে পিঠের তূণ, কোথা সে ধনুকগণ,
কার্ম্মুক বহিতে হাতে নাহি কি শকতি ?
...(কার্তিকপূজা, ১৩০০)

কার্ত্তিককে এই ফুলবাবু বেশে পূজা করিলে পূজারীরা নির্বীর্য হইয়া পড়ে—

"এ বেশে তোমারে পূজি কি ফল আমি না বুঝি,
জন্মে শুধু কতকগুলি জড় পাপমতি।"

—কার্ত্তিক বীর, সুতরাং বীরবেশে তাঁহার আরাধনা করাই সমীচীন।[৪৪] কারণ বীরের পূজা করিলে, পূজারীও শক্তি সঞ্চয় করে। কবি বিদ্রোহী, তাই শক্তির পূজারী বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি লইয়া কবি বীরের পূজা করেন। শক্তি আছে বলিয়া কবি বিদ্রোহী— 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'। যার শক্তি নাই, সে কখনও বিদ্রোহী হইতে পারে না। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্য, অকল্যাণকে দূর করার জন্য, অসুন্দরকে ধ্বংস করার জন্য সাহসের

---

৪৪. কার্তিকপূজা সম্বন্ধে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। একবার এক সাহেব কলিকাতায় আসেন দুর্গাপূজা দেখিতে। একটি বড় পূজা-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া পূজা দেখিতেছেন এবং দেব-দেবীদের মাহাত্ম্য-বর্ণন মন্ত্রপাঠ শুনিতেছেন। কৌতূহলবশে পূজারীকে দুর্গামাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পূজারী বুঝাইয়া দিলেন যে, ইনি দুর্গতিনাশিনী, অসুরদলনী. মহামায়া। সাহেব দেবী দুর্গাকে বীরাঙ্গনা ভাবিয়া পূজারীকে পুরস্কৃত করিলেন। তারপর সাহেব লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পরিচয় জানিতে চাহিলে পূজারী যথাক্রমে ধনসম্পদের ও ঐশ্বর্যের দেবী এবং জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী বলিয়া অভিহিত করিলেন; সাহেব আরও খুশী হইয়া পূজারীকে পুরস্কৃত করিলেন। অবশেষে সাহেবের দৃষ্টি পড়িল ফুলবাবু-বেশে কার্তিকের দিকে। পূজারী বলিলেন—ইনি সৈনিক, যুদ্ধ করেন, দেব-সেনাপতি। সাহেব বলিলেন—ধুতি পাঞ্জাবি পরিয়া জামাই-সাজে যুদ্ধ করা যায় না। ইহা সৈনিক নামের অপবাদ। অতএব তোমার জরিমানা হইল। সাহেব দিয়াছিলেন পঞ্চাশ টাকা. জরিমানা করিলেন একশত টাকা।

প্রয়োজন, বীর্যের প্রয়োজন। তাই কবি মানে-প্রাণে চাহিয়াছেন বীর্যবান পুরুষের আবির্ভাব—

"পুরুষের হৌক আবির্ভাব তোমার গর্ভে নারী।"

বসুন্ধরা—বীরভোগ্যা-বসুন্ধরা। এখানে 'বীরহস্তে বরমাল্য' লইবার মধ্যেই আছে পুরুষকারের গৌরব। তাই ব্রাহ্মণ-শূদ্র বৃহৎ-ক্ষুদ্র মানুষের আসল পরিচয় নয়—মানুষের একমাত্র পরিচয় সে মানুষ, সুখেও আত্মহারা হয় না, দুঃখেও মুহ্যমান হইয়া পড়ে না, এইরকম একটা পুরুষকারের মানুষ। কবি গোবিন্দদাস এই মানুষকেই খুঁজিয়াছেন কাব্যের মধ্যে। যে রূপ রসের আধার, সেই রূপটি বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হইয়া উঠে না, তাহার মূলে এই বিশেষের মৃত্তিকার স্পর্শ থাকে। এই দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বলা যায় যে, ঊনবিংশ শতকের পরিবেশের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াও গোবিন্দদাস তাঁহার কাব্যকে শুধুমাত্র আনন্দ পরিবেশনের মাধ্যম করিয়া রাখেন নাই; তাহাকে গণদেবতার জাগরণে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। নিজের প্রাণটিও ছিল দেশের ও দশের জন্য উৎসর্গীকৃত। দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ্ হইতে মুক্ত করার জন্য দেশবাসীকে তিনি বিদ্রোহের মন্ত্রে, শক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত হইবার আহ্বান জানাইয়াছিলেন।

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে, এদেশ তোদের নয়,
কই সে শিল্প, কই সে কৃষি, কই সে যজ্ঞ, কই সে ঋষি,
কই সে পুণ্য তপোবনে ব্রহ্ম-বিদ্যালয়?

*   *   *   *

প্রতি জনের প্রতি বক্ষে, কোটি কোটি লক্ষে লক্ষে
কই সে তোদের দেশভক্তির দুর্গ সমুদয়,
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিসিন্ধু, কই সে বুকের রক্তবিন্দু,
স্পর্শ থাকুক দর্শনে তার শত্রুকুল ক্ষয়।"

মূলতঃ গোবিন্দদাস ছিলেন একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং সত্যের পূজারী। ন্যায়, সত্য, সাম্য ও স্বাধীনতার জন্য এক দিকে যেমন তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনি স্বদেশবাসীকে অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন—

"যারা আমার প্রতিবেশী, ভাই ভগিনী আমার দেশী,
যাদের কাছে বাঁধা আমি স্নেহ-ঋণের দায়,
যার রেণুতে দেহ গড়া, যার কোলে শেষ শয়ন করা,
তার করিলাম কোন্ উপকার প্রাণের মমতায় ?
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার দিন ফুরায়ে যায়।"

—মানুষের চিরকালের কামনা—'যেতে নাহি দিব', তবু 'যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'। জীবনের এই নিশ্চিত পরিণাম জানিয়াও কবি বলিয়াছেন, এই জীবন সংগ্রামের, এই জীবন পরোপকারের। জীবন দিয়া জীবনকে বুঝিতে হইবে, হৃদয় দিয়া হৃদয়ের মর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে—তবেই মিলিবে সত্যের সন্ধান। জীবনের পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে জীবনের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি—জীবন-সাহিত্য। কবি গোবিন্দদাস ছিলেন এই সমাজ-জীবন সাহিত্যের একজন নিপুণ রূপকার।

আধুনিক যুগ যন্ত্র-সমস্যার যুগ। এই যুগে 'ইহকাল পরকাল নষ্ট দারুণ দুরাশায়।' এই যুগে টাকাই খাঁটি, মানুষ ফাঁকি! মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় টাকার ভিত্তিতে। সমাজের উচ্চমঞ্চে যাঁহারা আসীন, তাঁহারাই আইনের ফাঁকে সদাচারের ভাণ করিতেছেন। কবির চোখে এই মেকী ধরা পড়ায় তিনি আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার ভুলত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

"চাই না ভণ্ড দেশহিতৈষী, ওরাই রক্ত শোষে বেশী,
ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের মতো বাতাস দিয়া দিয়া।

ধিক সে ওদের উচ্চ শিক্ষা, ধিক ওদের স্বদেশী দীক্ষা,
কিসে তরবে পরীক্ষা পশুর আত্মা নিয়া ?"

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় মারাত্মক ত্রুটি বিবাহে পণপ্রথার প্রচলন। এই পণপ্রথার জন্য বংলাদেশের কত মেয়েকে কত না নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে, কত পিতাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখে ? চারণ-কবি মুকুন্দদাসের ভাষায় বলা যায়—

"ছেলের বাপ বসে আছে পাঁচ হাজারের আশে।
মেয়ের বাপের ভাঙ্গা কপাল পথে বসে কাঁদে
ভাইরে, মানুষ নাইরে দেশে।"

আজও দেশে 'মানুষ'[৪৫] নাই, মনুষ্যত্ব অর্থের বিনিময়ে বিক্রীত। বিবাহে পণ-প্রথার প্রবর্তন এবং প্রচলন মানুষের প্রচণ্ড লোভ, তাহার স্বার্থপরতা এবং হৃদয়হীনতার পরিচয় বহন করে। আইন করিয়া এই প্রথা বন্ধ করা যাইবে না। কারণ যেখানে 'স্বার্থ বড় ক্রূর, লোভ বড় নিদারুণ', এবং 'স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণ বৃন্তে থাকে, পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে,' সেখানে আত্মোপলব্ধি, আত্মশুদ্ধি, সামাজিক চেতনা ও বিবেকের দংশন ব্যতীত এই প্রথা দূর হইবে না। তাই পণ-প্রথার মত এত বড়ো একটা অন্যায়ের মূলোচ্ছেদ করিতে হইলে নারীদেরই আগাইয়া আসিতে হইবে, বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে বলিতে হইবে "পণ দিব না, পণ নিব না"। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষে এই যে বন্ধন হইতে মুক্তির আন্দোলন, কবি গোবিন্দদাস "থাকুক আমার বিয়া" শীর্ষক কবিতায় পণপ্রথার বিরুদ্ধে নারীর মুখ দিয়া বহু পূর্বেই এই বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন—

৪৫. "সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননী
রেখেছো বাঙ্গালী করে মানুষ করোনি।"—রবীন্দ্রনাথ।

"বাবা থাকুক আমার বিয়া,—
চাইনা আমি এম.এ., বি.এ., কিনতে হয় যা টাকা দিয়ে
ছাগল গরুর মত যাদের ছেলের হাটে গিয়া,
সোনার চেইন, সোনার ঘড়ি, গর্ব যাদের গলায় পরি,
অমন পশু কিনবে নাক কানাকড়ি দিয়া।"

—বিবাহ একটি মাঙ্গলিক ব্যাপার, সংসার ও সমাজ রক্ষার একটি অপরিহার্য অনুষ্ঠান। এই শুভ অনুষ্ঠানে দুইটি হৃদয় ও দুইটি পরিবার একসঙ্গে মিলিত হইতে চায়, আর চায় জ্ঞাতি-কুটুম্বরা একান্ত করিয়া পাইতে। প্রীতি, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ভালবাসার মধ্য দিয়া এমন এক পরিবেশ গড়িয়া ওঠে যেখানে হৃদয় হৃদয়ের সহিত আলাপ করে, মন মনের সহিত মিলিয়া যায় এবং আত্মা আত্মার সহিত আপনার বিনিময় করিতে চায়। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির দ্বারা এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভযাত্রা সূচিত হয়। কবিকঙ্কণের ভাষায় বলা যায়—

"আহরিয়া বর আনি
কহিয়া মধুর বাণী
পণ বিনা করি সমর্পণ।"

মধ্যযুগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে 'পণ বিনা' কন্যা-সমর্পণের যে কথা বলিয়াছেন, আধুনিক যুগের কবি গোবিন্দদাস সেই কথা পালিত না হওয়ায় ক্ষোভে, দুঃখে, মর্মপীড়ায় ও সমবেদনায় বলিয়াছেন—

"এটা নয় সে রাজনীতি, রাজদ্রোহের নাই সে ভীতি,
এটা কেবল মোহের প্রীতি টাকারই লাগিয়া।"

সমাজে যাঁহার টাকা আছে তাঁহারই মেয়ের প্রতিপত্তি আছে শ্বশুর বাড়ীতে। রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি সবই যেন—এহ "বাহ্য, আগে কহ আর"। তাই দেখি 'দেনা-পাওনা' গল্পে রায়বাহাদুর তাঁহার ভাবী পুত্রবধূকে সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে গ্রহণীয় বলিলেও বিবাহের পূর্বে

পণের সব টাকা না পাওয়ায় 'বর সভাস্থ করা যাইবে না' বলিতে দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করিলেন না। অবশ্য বিবাহ হইলেও পরে দেখা গেল শ্বশুর বাড়ীতে কন্যার ভাগ্যে উঠিতে বসিতে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-অপমান জুটিতেছেএবং কন্যার উপর পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রখিতে হইয়াছে। অথচ যে কন্যা পিতা-মাতার স্নেহচ্ছায়ায় বর্ধিত হইয়াছে, মাতৃস্নেহে এবং ভাইবোনদের স্নেহ-ভালবাসায় পুষ্ট হইয়াছে, তাহার পক্ষে পিতা-মাতার, ভাই-বোনের দুঃখ-কষ্ট-লাঞ্ছনার প্রতি উদাসীন থাকা কি সম্ভব? তাই "দেনাপাওনা" গল্পে—নিরুপমা তাহার বাবাকে বলিয়াছে—"টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই! আমি কি একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম!" এই চিত্র বিচিত্রভাবে অঙ্কিত হইয়াছে কবি গোবিন্দদাসের কাব্যে। দেহের উপর মনের আধিপত্যটাই মানবিক। তাই যে মানুষটি তাহার প্রিয়জনদের মাঝখানে দুঃখ-দুর্দশার আগুন জ্বালাইল, পণের টাকা লইয়া তাহাদের পথে বসাইল, পরিবারের মধ্যে রোপণ করিল অশান্তির বীজ,[৪৬] সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ দিয়া সেই মানুষটিকে কিভাবে ভালবাসা যায়, কিভাবে শ্রদ্ধা করা যায়—হোক না সে স্বামী?

৪৬. এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বড় ব্যথায় "হৈমন্তী" গল্পের নায়কের মুখ দিয়া লেখক বলিয়াছেন—"যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে? সেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবী করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও যে তাহাদের মধ্যে একজন।

"যে কষ্টে তোমার দুর্গতি, ভজবো কি সেই পশুবৃত্তি
পূজব না হয় পশুপতি উমার[৪৭] মত গিয়া!"

এমন পশুবৃত্তির মানুষের সঙ্গে ঘর করার চেয়ে আজীবন সন্ন্যাসিনী হইয়া মহাদেবের[৪৮] আরাধনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়। আর তাহা সম্ভব না হইলে—

"রাজপুতনার[৪৯] মেয়ের মত, করব না হয় জহরব্রত[৫০],
তারাও নারী, মোরাও নারী, নারীর হৃদয় দিয়া।"

---

৪৭. উমা—গিরিরাজের কন্যা উমা, গিরিরাণী মেনকা তাঁহার মাতা। উমার সঙ্গে শিবের বিবাহ হয়। কৌলীন্য প্রথার বলি এই আট বছরের কন্যা উমা—"শ্বশুর ঘর কি জানে মোটে, কত বাকি তারি তরে?" ভারতবর্ষে মাতৃকা-পূজার ধারাটি বৈচিত্র্যপূর্ণ। সর্বপ্রথমে মাতৃকাশক্তি পৃথিবী—দেবীরূপে কল্পিতা হইয়াছিলেন। ক্রমান্বয়ে তিনি পার্বতী ও উমা দক্ষকন্যা সতী, দুর্গা, চণ্ডী ও কালিকারূপে প্রতিভাত হন। যদিও প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, দক্ষতনয়া সতীই শেষ পর্যন্ত গিরিরাজ হিমালয়ের গৃহে উমা বা পার্বতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে সতীর পূর্বেই উমার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪৮. মহাদেব—দেবাদিদেব মহাদেব, সতী, উমা, কালী, দুর্গা, প্রভৃতির কুলীন স্বামী। কুলীনের ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেও কানা, খোঁড়া, মদ্যপায়ী পাত্রের যে কত দাম, অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাহারই প্রতীকরূপে মহাদেবকে দেখানো হইয়াছে। বহুবিবাহ প্রথার ইহা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আসলে কৈলাসপতি মহাদেব হইতেছেন মহাভোগী ও মহাযোগী। সিদ্ধিদাতা মহেশ্বর—শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও লয়ের আশ্রয়ীভূত। মায়ের পদতলে শবরূপী শিব। যখন শিব মঙ্গলময়, তখন তিনিই মহাকাল।

৪৯. রাজপুতানা—আজমীর মাড়বারের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত ২০টি ভারতীয় রাজ্য ইহার অন্তর্গত। বর্তমানে ইহা স্বাধীন সার্বভৌম ভারত সরকারের শাসনাধীনে পরিচালিত। ইহার পরিমাণ ফল ১,২৯,০৫৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ১,১২,২৫,৭১২।

৫০. জহরব্রত—রাজপুতদিগের বীরব্রত বিশেষ। স্বদেশ রক্ষার্থ যুদ্ধে

কিন্তু জহরব্রতের উল্লেখ করিলেও মেয়েদের আত্মহত্যাকে কবি গোবিন্দদাস কোনদিন সমর্থন করেন নাই। মেয়েদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাবটার আতিশয্য দেখাইতে গিয়া জহরব্রতের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কবি তাঁহার চিঠিপত্রেও এই বিদ্রোহী মনোভাবের কথা সুযোগ পাইলেই ব্যক্ত করিয়াছেন। আসলে সমাজ দেহে দুষ্ট ক্ষতের মতো যে পণপ্রথা আজও বাঁচিয়া আছে, তাহার বিরুদ্ধে নারী-সমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করুক, ইহাই ছিল কবির ঐকান্তিক ইচ্ছা। আন্তর্জাতিক নারী-বর্ষে[৫১] কবির এই ইচ্ছা অনেকটা পূরণ হইয়াছে বলা যাইতে পারে। "দেনা-পাওনা" গল্পে

লিপ্ত কোন রাজপুত রাজার পরাজয় সম্ভাবনা থাকিলে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত রমণীগণ সতীত্ব রক্ষার্থে জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতেন, অতঃপর অবশিষ্ট পুরুষেরা অসি হস্তে যুদ্ধ করিয়া দেশরক্ষা অথবা মরণ বরণ করিতেন। রাজপুতদিগের আপৎকালের এই প্রাচীন প্রথাই 'জহরব্রত' নামে অভিহিত হইত।

৫১. আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ—নানা কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার উদ্দেশ্যে সেই সেই বিষয়ে মাঝে মধ্যে 'সপ্তাহ', 'দিন', 'পক্ষ', 'মাস' বা 'বছর' পালন করিবার যে রীতি আছে, ১৯৭৫ সালটি সেই রীতি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে। রাষ্ট্রসংঘের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বের নারী সমাজ অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই বৎসরটি কার্যকরী উপায়ে পালিত হইয়াছে। আইন করিয়া পণপ্রথা নিবারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং "পণ দিব না, পণ নিব না" এই দাবীতে আন্দোলন জোরদার করা হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক নারীবর্ষকে অসামান্য তাৎপর্যে ভূষিত করিয়াছেন জাপানী গৃহবধূ জুনকো তাবি। ১৯৭৫ সালে ১৬ই মে শুক্রবার ৩৬ বছরের শ্রীমতী তাবি ঝকঝকে দুপুরে ৮ হাজার ৮……৪৮ মিটার উঁচু এভারেষ্টের শীর্ষে প্রথম পদার্পণ করিলেন. পতাকা তুলিলেন জাপান ও নেপালের। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানাইলেন অভিনন্দন। বিশ্বের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মহিলা বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেষ্ট জয় করিবার মহৎ গৌরব অর্জন করিয়া বিশ্ব-ইতিহাসে একটি নূতন নজীর স্থাপন করিলেন।

রায়বাহাদুরের ছেলে যে কথা বলিয়াছেন, আজকের যুগে প্রতিটি বিবাহযোগ্য ছেলে যদি সেই কথা অর্থাৎ "কেনা-বেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব" —বলিতে পারেন, তবেই হয়ত এই পণ-প্রথার হাত হইতে সমাজ মুক্ত হইতে পারে।

আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার আর একটি অসঙ্গতির অনিবার্য পরিণতি নারীর পতিতা জীবনযাপন। দৈহিক পবিত্রতা ও শুচিবোধ নারীর সহজাত। সেইজন্য এই অমূল্য সম্পদের পবিত্রতা পার্থিব সম্পদের বিনিময়ে সহজে নারী নষ্ট করিতে চায় না। রবীন্দ্রনাথের[৫২] ভাষায় বলা হইয়াছে—

"জানি না করম লজ্জা শরম জানি না জীবনে সতীর প্রথা।
তা বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া সে কী কথার কথা।"—
(পতিতা)

---

৫২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, কবি সার্বভৌব। জন্ম—১৮৬১, ৭ই মে, মৃত্যু—১৯৪১, ৭-ই আগষ্ট। নিবাস জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, পরে শান্তিনিকেতন, বীরভূম। পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গীতিকবিতায় অদ্বিতীয়। বাল্যকাল হইতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং কৈশোর অতিক্রান্ত না হইতেই কবিখ্যাতি লাভ করেন। সন্ধ্যা-সঙ্গীত (১৮৮২) প্রকাশিত হইবার পর, এক সভায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজের গলার মালা পরাইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধিত করেন। সাহিত্যের সর্ববিভাগে তাঁহার দান বিপুল। গল্প, উপন্যাস, ব্যঙ্গকৌতুক, দিনলিপি, ভ্রমণ-কাহিনী, প্রার্থনা ও ধর্মোপদেশ, শিক্ষা, রাজনীতি ও দেশপ্রেম বিষয়ক প্রবন্ধ, শব্দ-ছন্দ ভাষা-তত্ত্ব, বিজ্ঞান, নাটক, গদ্যকবিতা, রূপকথা, রূপকনাট্য, প্রহসন—একজনের হাতে বাংলা গদ্য সাহিত্য এমন নানাভাবে আর কখনো পুষ্ট হয় নাই; কবিতায় ও গানে বাংলা কাব্যসাহিত্যকে তিনি একা সহস্রবর্ষের সমৃদ্ধি দান করিয়াছেন। তিনি তিন শতেরও অধিক গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'র জন্য তিনি 'নোবেল' পুরস্কার দ্বারা সম্মানিত হন।

এখন প্রশ্ন জাগে নারীর সতীত্ব কোথায়? দেহে না মনে? সতীত্ব বড়, না নারীত্ব বড়? প্রশ্ন জাগে কিসের আকর্ষণে নারী দেহব্যবসায়ী হইয়া উঠে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। দরদী ও মরমী কথা-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রও[৫৩] এই প্রশ্নের উত্তর দিতে

ঐ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ডকটর" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পর বৎসর ভারত সরকার তাঁহাকে 'নাইট' (স্যার) উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় এই উপাধি পরিত্যাগ করেন। ৬৮ বৎসর বয়সে তিনি চিত্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী মস্কো, বার্লিন, প্যারিস, নিউইয়র্ক, মিউনিক ও বার্মিংহাম প্রদর্শনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। প্রধানতঃ কবিগুরুর অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানানের সংস্কার সাধন করেন। দেশ-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীযুগের জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইনে বাংলার হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হয় তাহাতে তিনি 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের' সভাপতি হিসাবে তীব্র প্রতিবাদ করেন। শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়, বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন তাঁহার অসামান্য কীর্তি। মৃত্যুর চারি মাস পূর্বে, জন্মদিনের অনুষ্ঠানে পঠিত তাঁহার "সভ্যতার সংকট" ভাষণ ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে সত্য পথের ইঙ্গিত দিয়াছে। এক কথায় বলা যায় যে, মানুষ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কীর্তির চেয়ে বড় ছিলেন।

৫৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হয়। আর্থিক দৈন্যবশতঃ ইনি বেশীদূর পড়িতে পারেন নাই, এফ. এ পড়িতে পড়িতে ইনি পাঠ সমাপ্ত করিতে বাধ্য হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রেঙ্গুন গমন করেন এবং সেখানে অ্যাকাউন্টাণ্ট জেনারেল অফিসে একটি কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর কাজ ছাড়িয়া বাংলায় ফিরিয়া আসেন। চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে ইনি উপন্যাস রচনা করেন। এ সময় ইহার "কাশীনাথ" নামক উপন্যাসখানি রচিত হয়। চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে ইনি 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচনা করেন। 'রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে,—ইহার ছত্রিশ বৎসর বয়সে রচিত হয়।

পারেন নাই। তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, কিন্তু উত্তরও যেমন দিতে পারেন নাই, তেমনি সমস্যার সমাধানও করিতে পারেন নাই। তিনি শুধু বলিয়াছেন—"সব জিনিষের একটা সত্যকার অধিকার আছে। সমাজ উন্নত হয়ে যখন সেই সত্যকার সীমাকে লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করাই উচিত। সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।" সুতরাং ব্যবহারিক দিক্ দিয়া কেবলমাত্র বলা যায় যে, অনেকগুলি কারণের মধ্যে অর্থনৈতিক অসংগতি পতিতাবৃত্তির একটি বিশেষ কারণ। অন্য কারণগুলির মধ্যে অতৃপ্তি, লোভ, উপেক্ষা, জিঘাংসা ও শক্তি প্রয়োগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হয়তো কোনো পুরুষের প্রলোভনে পড়িয়া নারী তাহার সহগামিনী হইল। কিছুদিন পর

অন্যান্য উপন্যাস ইহার ছত্রিশ বৎসর বয়সের পরের রচনা। বাঙালীর সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলি ইনি অতি সুস্পষ্টভাবে ইহার উপন্যাসগুলিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। নারী যে অবজ্ঞেয় নয়, ইহা ইনি অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। নারীর মূল্য নিরূপণ করিতে ইনি 'নারীর মূল্য' নামক পুস্তকখানি ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। ছোটগল্প লিখিতেও ইনি সুনিপুণ। গল্প ও উপন্যাস রচনায় অপূর্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া ইনি লোকমুখে কথাসাহিত্য-সম্রাট আখ্যা লাভ করিয়াছেন। প্রথম মুদ্রিত রচনা 'কুন্তলীন পুরস্কার ১৩০৯ সন' পুস্তকের "মন্দির" গল্প। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "বড়দিদি" গল্পের জন্য সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত ইহাই প্রথম পুস্তক। পরে 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে', 'পরিণীতা', 'পণ্ডিতমশাই', 'পল্লীসমাজ', 'চন্দ্রনাথ', 'বৈকুণ্ঠের উইল', 'অরক্ষণীয়া', শ্রীকান্ত (১—৪ পর্ব), 'দেবদাস', 'নিষ্কৃতি', 'চরিত্রহীন', 'দত্তা', 'গৃহদাহ', 'দেনা-পাওনা', 'হরিলক্ষ্মী', 'পথের দাবী, 'শেষ প্রশ্ন', 'বিপ্রদাস' প্রভৃতি অনেক গল্প উপন্যাস পাঠকচিত্ত জয় করায় দরদী ও মরমী অপরাজেয় কথাশিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, ১৬ই জানুয়ারী ইনি পরলোকগমন করেন।

সেই পুরুষ যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তখন সমাজে আর তাহার স্থান হয় না। হয়তো নিজে উপার্জন করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিবার মতো শক্তিও তাহার নাই। তখন তাহার সামনে দুইটি পথ খোলা থাকে—এক আত্মহত্যা, দুই পতিতাবৃত্তি গ্রহণ। কারণ ভিক্ষান্নে জীবন-যাত্রা নির্বাহ সম্ভব নয়। ক্ষণিক পদস্খলনের জন্য নারী সমাজের কাছে ক্ষমা পায় না, কিন্তু যে পুরুষ তাহাকে পদস্খলনে প্রলোভিত করিল, সমাজের বুকে তাহার সগর্বে মাথা তুলিয়া চলিবার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইল না। গোবিন্দদাসের বিদ্রোহ এই একচোখা সমাজ-ব্যবস্থার উপর। তাই পতিতা নারীর মুখ দিয়া তাহার সর্বনাশকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন—

> "নাহি দগ্ধ কামানলে
> ক্ষুধায় জঠর জ্বলে
> বসেছি তোদের মুণ্ড খাইব আশায়।"

দেহ-ব্যবসাটা যেন তাহার প্রতিহিংসা গ্রহণের উপলক্ষ্য মাত্র। যে মানুষ তাহার সর্বনাশ করিল, যে সমাজ তাহাকে ঘৃণা করিল, উপেক্ষা করিল, তাহাদের বিরুদ্ধে সে তাহার সারা দেহমনে প্রতি-হিংসার অনল প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে—

> "কালান্ত মেঘের সম
> সেই প্রতিহিংসা মম
> মাখিয়া রেখেছি কেশে মহা তমসায়।"

গোবিন্দদাস স্বভাবকবি, কবিপ্রতিভা লইয়াই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্যই ছিল অন্যায়, অবিচার, অমানুষিকতা এবং অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। যে বিদ্রোহ শুধু ধ্বংসের আগুনই জ্বালাইয়া দেয়, যাহাতে সৃষ্টির দ্যোতনা

নাই, সেইরূপ বিদ্রোহ-ঘোষণায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন একদিকে বিদ্রোহী, অপরদিকে স্রষ্টা। বিদ্রোহের আগুনে অসুন্দরকে পুড়াইয়া সুন্দরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁহার একমাত্র কাম্য, তাঁহার সারাজীবনের সাধনা।

ভাওয়াল রাজপরিবার ও কবি গোবিন্দদাস

পূর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠতম জমিদার ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়। 'রাজা' তাঁহার ব্যক্তিগত উপাধি হইলেও এই রাজবংশ অতিপ্রাচীন এবং ঢাকার প্রধান 'হিন্দু জমিদার' বংশ বলিয়া ভাওয়াল জমিদাররা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তৎকালে পূর্ববাংলার গর্বের জন্য ঢাকার প্রসিদ্ধ থিয়েটার হলে লর্ড নর্থব্রুক[৫৪] রাজা কালীনারায়ণ রায়কে 'রাজা' সনদ প্রদান করেন। রাজা কালীনারায়ণ রায়ের ফটো দেখিলেই সুস্পষ্ট বোঝা যায়, তাঁহার চেহারা খাঁটি বাঙ্গালী ধরনের এবং তিনি চতুর ও হুঁসিয়ার লোক ছিলেন। তাঁহার দুই পত্নী—জয়মণি ও সত্যভামা। জয়মণি বড়, সত্যভামা ছোট। ইহা ছাড়া ব্রহ্মময়ী নামে রাজার আর এক পত্নী ছিল, তবে তার কথা বিশেষ জানা যায় না। একমাত্র কুলপ্রদীপ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ও একমাত্র কন্যা কৃপাময়ী দেবীকে রাখিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন রাজা কালীনারায়ণ লোকান্তরিত হন। এই রাজ-পরিবারের সঙ্গে কবি গোবিন্দ দাসের জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

---

৫৪. লর্ড নর্থব্রুক—(১৮২৬-১৯০৪ খ্রীঃ)। ১৮৭২-৭৬ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি ভারতের ভাইসরয় ছিলেন) ইহার শাসন সময়ে বাঙ্গলা এবং বিহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু ইনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া এই দুর্ভিক্ষ দমন করেন। বরোদার গাইকোয়ার মলহার রাওয়ের বিরুদ্ধে, বৃটিশ রেসিডেণ্ট কর্নেল ফেয়ারকে বিষ প্রদানের চেষ্টা করার অভিযোগ উপস্থিত হইলে লর্ড নর্থব্রুক এই ব্যাপারানুসন্ধান জন্য তিন জন দেশীয় এবং তিন জন ইংরাজ কমিশনারদের মতে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া পদচ্যুত করেন। রাজবংশ সম্ভূত একটি বালক সিংহাসনে স্থাপিত হয়। ইহার শাসন কালে স্বর্গত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজ অবস্থায় ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি আয়কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজা কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় ভাওয়াল রাজপরিবারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। মূলতঃ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পরিবার বংশধররাই ভাওয়ালে বহু দিন যাবৎ ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজবংশের ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন। ঢাকা ও ময়মনসিংহ উভয় জিলায় এই রাজবংশের প্রভাব পরিব্যাপ্ত। ঢাকায় রাজার একটি বাড়ী থাকিলেও তিনি সাধারণতঃ পল্লী ভবনে অর্থাৎ জয়দেবপুরে থাকিতেন। ঐ অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অসামান্য ছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ভাওয়াল এস্টেটের আয় ছিল প্রায় ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ৩৫৩ টাকা। রাজার সময় আয় ইহা অপেক্ষা বড় কম ছিল না। মাত্র ২১ বৎসর বয়সে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিব কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম—বিলাসমণি।[৫৫]

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্র ও তিন কন্যা। পুত্রদের মধ্যে বড়কুমার রণেন্দ্র, মেজোকুমার রমেন্দ্র এবং ছোটোকুমার রবীন্দ্র। আর কন্যাদের মধ্যে বড় ইন্দুময়ী, মেজো জ্যোতির্ময়ী দেবী এবং ছোটো তড়িন্ময়ী দেবী। জন্মকাল[৫৬] ধরিলে দেখা যায় যে, রাজা

৫৫. রাণী বিলাসমণি—বরিশাল জিলার বানরীপাড়া গ্রামে রাণী বিলাসমণি এক দুঃস্থ কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই ভগ্নী ও দুই ভ্রাতা। স্বামী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়। তিন পুত্র ও তিন কন্যা লইয়া বিধবা হন। মৃত্যুর পূর্বে রাজা যে অছিনামা ও উইল করিয়া যান তাহার ঠিক ঠিক সর্ত জানিতে পারা না গেলেও সর্বসম্মত ব্যাপার এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা রাণী তিন পুত্রের পক্ষ হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ২১শে জানুয়ারীতে তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত রাণী বিলাসমণি অছিরূপে সম্পত্তি চালাইতে থাকেন। রাণী বিলাসমণির মৃত্যুর পর তিন কুমার (রণেন্দ্রনারায়ণ, রমেন্দ্রনারায়ণ ও রবীন্দ্রনারায়ণ) বিধিমত সম্পত্তির মালিক হন।

৫৬. কুমারদের জন্মকাল—রাজেন্দ্রনারায়ণের সন্তানদের জন্মকাল নিম্নে উল্লেখ করা হইল:—ইন্দুমতী দেবী ১২৮৫ সালের কার্ত্তিক (১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের

রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় মেজো রাজকুমার। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠে বিখ্যাত "ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা"র[৫৭] নাট্যকাহিনী। এই কাহিনীই ভাওয়ালকে ও ভাওয়াল রাজপরিবারকে চিরকাল স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

আগষ্ট-সেপ্টেম্বর), কুমার রণেন্দ্র (বড়কুমার) ১২৮৯ সাল, ৪ঠা আশ্বিন, (১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর), কুমার রমেন্দ্র (মেজোকুমার) ১২৯১ সাল ১৪ই শ্রাবণ, (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই), কুমার রবীন্দ্র (ছোটকুমার) ১২৯৩ সাল, ২৯শে শ্রাবণ, (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট), তড়িন্ময়ী (কনিষ্ঠা কন্যা) ১৩০০ সাল (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ)। বিখ্যাত ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার নথিপত্র হইতে এই জন্মসন তারিখ উল্লেখ করা হইল।

৫৭. ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা ও মামলার রায়—ভাওয়াল-জয়দেবপুরের রাজপরিবারের উত্থান-পতনের, হাসি-কান্নার ও সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত এক বিচিত্র এ্যালবাম্। যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই ইতিহাস, তিনি হইতেছেন ভাওয়াল পরিবারের মেজোকুমার রমেন্দ্র নারায়ণ রায়। তিনিই বাদী, আর বিবাদীগণ হইতেছেন।

(১) শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায়-সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ—প্রধান বিবাদী। বিভাবতীদেবীর সহিত মধ্যম কুমারের বিবাহ হয়।

(২) শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। সরযুবালা দেবীর সহিত বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিবাহ হয়।

(৩) শ্রীমতী আনন্দকুমারী দেবী, তৎপক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার রায়সাহেব উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। আনন্দকুমারী দেবী ভাওয়ালের ছোটকুমার রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের সহধর্মিণী।

ইহা ছাড়া রাণী আনন্দকুমারী দেবীর দত্তকপুত্র-কুমার রামনারায়ণ রায় এই মামলার একজন বিবাদী।

মামলার মূল বিষয়—বাদী ভাওয়ালের মেজোকুমার ছিলেন কিনা? ঘটনার

ভাওয়াল-জয়দেবপুর হয়ত শুধু ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবে বাঁচিয়া থাকিত, কিন্তু রাজবংশের ইতিকথাই তাহার খ্যাতি ও পরিচিতি যে বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সামন্তপ্রথায়[৫৮] বহু রাজপরিবারের সৃষ্টি ও স্থিতি ঘটিয়াছে,

---

বিবরণে জানা যায়—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় স্ত্রী এবং কতিপয় আমলা ও আত্মীয়সমূহ হাওয়া বদলের জন্য দার্জিলিং গমন করেন। তথায় ১৮ই মে অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহার উপর বিষপ্রয়োগ করা হয় এবং তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া শ্মশানে নীত হইলে প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পড়িয়া শববাহীদল শব ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, পরে ফিরিয়া আর শব দেহটি খুঁজিয়া পান না। এদিকে কতিপয় নানা সন্ন্যাসী সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া বাদীকে বাঁচাইয়া তোলেন এবং নিজেদের সঙ্গে করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করেন। অবশেষে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সন্ন্যাসী বেশে ঢাকায় আসিয়া বাকল্যাণ্ড বাঁধের নিকট অবস্থান করেন। এই সময় অনেকে সন্ন্যাসীবেশে মধ্যম কুমারকে চিনিতে পারেন এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মে তারিখে জয়দেবপুরে এক বিরাট জনসভায় তাঁহাকে মধ্যমকুমার বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। ইহাতে বিচলিত হইয়া মধ্যমকুমারের স্ত্রী ও শ্যালক ষড়যন্ত্র করিয়া তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টর মিঃ লিণ্ডসেকে দিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুন ঘোষণা করিলেন "বাদী প্রতারক"। শুরু হইল বিখ্যাত "ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা"। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই মামলা চলে। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগস্ট (টি স্যুট নং ৩৮-১৯৩৫) ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জজ শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাবুর আদালতে এই মামলার রায় হয়। রায়ে বাদী মধ্যমকুমারের জয় হওয়ায় জয়দেবপুরের 'ঐতিহাসিক শোভাযাত্রা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকে।

৫৮. সামন্তপ্রথা—সামন্তপ্রথা বা সামন্ততন্ত্র হইল মূলত একটি নূতন সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার মূলে হইল জমি। এই জমিই হইল একমাত্র জাতীয় সম্পত্তি। এই জমিকে কেন্দ্র করিয়া দুইটি শ্রেণী গড়িয়া উঠিল। একদল জমির মালিক বা সামন্তপ্রভু, আর একদল যাহারা জমি কর্ষণ করে অর্থাৎ কৃষক। জমির মালিকরা জমি চাষ করিত না, চাষ করিত কৃষকেরা। কিন্তু মালিকানার গুণে

আবার এই প্রথা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের কীর্তিকথা, পরিবারের ইতিকথা কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু ভাওয়াল-জয়দেবপুরের কথা আজও লোকের মুখে মুখে ঘোরে। এইখানেই ইহার ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য। রাজবংশের সৌভাগ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই রাজবংশের বাসস্থান ছিল জয়দেবপুরে। ইহা ঢাকা হইতে বিশ মাইল দূরে ভাওয়াল পরগণার মধ্যে অবস্থিত। ইহা একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। ঢাকা হইতে ট্রেনযোগে এক ঘণ্টার পথ। রেল লাইন জয়দেবপুর গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ভাওয়াল রাজবাড়ী রেল লাইনের পূর্ব পার্শ্বে কিঞ্চিদধিক সিকি মাইল দূরে অবস্থিত। রেল স্টেশন রাজবাড়ী হইতে হাঁটা পথে প্রায় ১ মাইল হইবে। স্টেশন হইতে বাহির হইয়া খানিক উত্তর মুখে গেলেই গ্রামের প্রধান রাস্তা বা রাজবাড়ী রোড পাওয়া যায়। এই রাস্তা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বিত। এই রাস্তা ধরিয়া পূর্ব দিকে সিকি মাইলের একটু অধিক অগ্রসর হইলে বামপার্শ্বে রাজবাড়ী পাওয়া যায়। রাজবাড়ীর পূর্ব দিক দিয়া এক রাস্তা উত্তর মুখে যাইয়া পূর্ব দিকে মোড় ঘুরিয়াছে। খানিক উত্তর-পূর্বে যাইয়া এই রাস্তা অপর এক রাস্তার সহিত মিলিয়াছে। এই সম্মিলিত রাস্তা শ্মশান বাড়ী বা চিলাই নদীর তীরস্থ ভাওয়াল রাজপরিবারের শ্মশানঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। যে স্থানে উপরিউক্ত দুইটি রাস্তা মিলিয়াছে, তথায় স্বর্ণময়ীর[৫৯]

জমির কর্তৃত্ব ছিল সামন্তপ্রভুর হাতে। তাই জমি হইতে উৎপন্ন ধনের মালিক ছিল সামন্তপ্রভুরা। আর কৃষকরা ছিল জমির মালিক বা সামন্তপ্রভুদের দয়ার উপর নির্ভরশীল ভূমিদাস মাত্র। এইভাবে সমাজ বিভক্ত হইয়া পড়িল দুইটি শ্রেণীতে—ধনী ও নির্ধন। এই অসাম্যই ছিল সামন্ত সমাজের রীতি। ফলে সামন্তপ্রভুরা ক্রমে ক্রমে ধনশালী হইয়া সমাজের 'নেতা' বা 'রাজা' হইয়া বসিলেন।

৫৯. স্বর্ণময়ী দেবী—ভাওয়াল রাজবংশের পূর্ব পুরুষ—গোবিন্দচন্দ্র রায়। তাঁহার কন্যা স্বর্ণময়ী ছিলেন রাজা কালীনারায়ণ রায়ের বৈমাত্রেয় ভাগনী।

বাসস্থান 'নয়াবাড়ী' অবস্থিত। এই বাড়ীতে স্বর্ণময়ীর দৌহিত্র ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার ভাগিনেয়দের বাস।

"নয়াবাড়ী" রাজবাড়ী হইতে অর্ধ মাইলের কিছু বেশী ও শ্মশান-বাড়ী হইতে প্রায় একশত বিশগজ দূরে। রাজবাড়ী হইতে পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত 'চিলাই' নদীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম অংশ সোয়া মাইল দূর। এবং এইখানে "কালাই" সরদারের ঘাট রহিয়াছে। চিলাই নদীর সর্বোচ্চ বিস্তার অনধিক ৫০ গজ মাত্র, বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সময় নৌকা চলে না। অন্যান্য ঋতুতে হাতে ঠেলিয়া বা দড়ি টানিয়া নৌকা চালাইতে হয়।

প্রাঙ্গণসহ ভাওয়াল রাজবাড়ীর বিস্তার—দৈর্ঘ্যে ২২ গজ চেনের মাপে সাড়ে তেরো চেন ও প্রস্থে পাঁচ চেন, রাজবাড়ীর মাঝখানের বিস্তার একটু বেশী। রাজার সময়ে ভাওয়াল রাজবাড়ীতে দশটি "মহল"[৬০] ছিল, প্রত্যেক মহলে আড়ম্বরসজ্জিত বহুকক্ষ সমন্বিত দ্বিতল অট্টালিকা ছিল। গেটের সম্মুখে সদর মহল বা দালান। গেট ও বড় দালানের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত ডিম্বাকৃতি প্রাঙ্গণ ঘিরিয়া বাড়ীর রাস্তা 'দেউড়ী'তে[৬১] যাইয়া মিশিয়াছে। রাজপরিজন বড়

স্বর্ণময়ী বিবাহিতা হইলেও রাজবাড়ীতেই থাকিতেন। রাজারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। যে সকল কুলীন ঘরজামাই থাকিতে সম্মত হইতেন, তাঁহাদের সহিতই এই বংশের কন্যাদের বিবাহ দেওয়া হইত। স্বর্ণময়ীর দুই কন্যা কমলকামিনী ও মোক্ষদা। মোক্ষদা আগে মারা যান। এই কন্যা ও কন্যাদের সন্তানগণ সহ স্বর্ণময়ী ১৩০০ বা ১৩০৩ সাল পর্যন্ত রাজবাড়ীর এক অংশে বাস করিতেন। তারপর জয়দেবপুরে নদীর তীরে তাঁহার জন্য এক বাড়ী প্রস্তুত হইলে, সেখানে উঠিয়া যান। এই বাড়ী "নয়াবাড়ী" নামে অভিহিত। ১৯১৭ খৃঃ স্বর্ণময়ীর মৃত্যু হয়।

৬০. মহল—পুরী, বাসস্থান, সমগ্র বাসভূমির এক এক বিভাগ, জমিদারীর অন্তর্গত এক একটি গ্রাম, মৌজা, তালুক।

৬১. দেউড়ি—বহিষ্কার ফটক, সদর দরজা।

দালানে থাকিতেন। সাধারণতঃ রাজার জঙ্গলে শিকারের শখ লইয়া যে সকল শ্বেতাঙ্গ অতিথি রাজবাড়ীতে আসিতেন, তাঁহারা বড় দালানে থাকিতেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মায়ার সাহেব ম্যানেজার নিযুক্ত হইবার পর ইহা 'ম্যানেজার কোয়ার্টার্স' রূপে পরিগণিত হইতে থাকে।

বড় দালানের পিছনের আঙ্গিনায় কাঠের পাটাতনে টিনে ছাওয়া-মস্ত 'নাট-মন্দির'। নাট-মন্দিরে বাই-নাচ, থিয়েটার-যাত্রা বা কবি-গান হইত। নাট-মন্দিরের উভয় পার্শ্বে চৌতালা বাড়ী। উভয় তলায় অনেকগুলি ঘর। এই সকল ঘর সংলগ্ন অলিন্দে বসিয়া মহিলারা নাট-মন্দিরের গান শুনিতেন ও আমোদ-উৎসব দেখিতেন।

নাট-মন্দিরের উত্তরে আর একটি দোতালা দালান ছিল। ঐ দালানের নীচে যে তিনটি ঘর ছিল তাহার একটি ঠাকুরঘর, সেখানে প্রতিবৎসর জগদ্ধাত্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত। সেই উপলক্ষে গান হইত। আর একটা উপলক্ষ ছিল পুণ্যাহ—জমিদারী বৎসরান্ত ও নূতন খাতা আরম্ভ। এই উপলক্ষে ছোটবড় প্রজারা মিলিত হইত, টাকা পয়সাদি দিত এবং গান শুনিত। অন্য দুইটি ঘরের একটিতে ছিল সাজঘর আর একটিতে পূজোর ভাঁড়ার ঘর, উপর-তলায় রাজার বসিবার ঘর ছিল এবং আরও কয়েকটি ঘর ছিল।

এই দালানের পিছনে ছিল অন্দর মহল। ঐ সকল লইয়া একটি 'ব্লক' ছিল। উহা 'পুরান বাড়ী' বলিয়া পরিচিত। উহার পশ্চিমে আর একটি 'ব্লক' ছিল। উহাকে 'পশ্চিম খণ্ড' বলা হইত। উহাতে রাজা কালীনারায়ণ রায়ের ভগিনী কৃপাময়ী দেবী বাস করিতেন। এই কৃপাময়ী দেবীর কথা কবি গোবিন্দদাস কোনদিনই ভুলেন নাই, ভুলেন নাই তাঁহার স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার কথা। বিদেশে গিয়াও কবি কৃপাময়ী দেবীর কথা স্মরণ করিয়াছেন ঃ—

"ভগিনি, বিদেশে আজি স্বদেশের সনে,
তোমার (ও) মধুর মূর্ত্তি পড়িতেছে মনে।
করুণা কোমল প্রাণ, স্নেহের প্রতিমা খান,
চাহিতে করুণা করে নয়নে নয়নে।
হাসিয়াছ খেলিয়াছ, কত ভালবাসিয়াছ,
শৈশবের ভালবাসা ভুলিব কেমনে?
ভগিনি, তোমারে আজি পড়িতেছে মনে।"

—প্রেম ও ফুল

এই স্মৃতি-চারণায় রাজবাড়ীর কথা—ঐশ্বর্যের ও মাধুর্যের কথা এবং প্রেম ও প্রতাপের কথা আসিয়া পড়ে। কারণ রাজবাড়ীর পট-ভূমিকায় কবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাব ও তিরোভাব। তাই রাজবাড়ীর ভৌগোলিক অবস্থান, আয়তন, পারিবারিক ঐতিহ্য, ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার কথা জানিতে না পারিলে কবি গোবিন্দদাসের পরবর্তী জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ের কথা বুঝা যাইবে না।

রাজবাড়ীর পিছন দিকে একটি বাগান ছিল। উহা এখনও আছে। পূর্ব দিকে একটি রাস্তা নদী অভিমুখে গিয়াছে। পশ্চিমে একটি সুন্দর দীঘি। উহা দৈর্ঘ্যে ১/৪ মাইল এবং প্রস্থে ৬৬ গজ। উহা রাজবাড়ীর দৈর্ঘ্য ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়াছে। উত্তর দিকের বাগানের দিকের দরজা খুলিয়া মেয়েরা দীঘিতে যাইতে পারিতেন। এই দীঘির কথা স্মরণ করিয়া কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—'কে কাটে প্রজার তরে দীঘি-সরোবর'। দীঘির পূর্ব তীরে বাড়ীর মধ্যে বড় দালানের প্রায় ত্রিশ গজ উত্তর-পশ্চিমে 'মাধববাড়ী'[৬২] (গৃহ-

৬২. মাধববাড়ী—ইহা শুধু দেবমন্দির হিসাবে নয়, ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন রূপেও চিহ্নিত। এই বাড়ীর পিছনে একটি খোলা প্রাঙ্গণ আছে। উহার অন্যদিকে ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর 'রাজ-

দেবতাদের গৃহ) অবস্থিত। মাধববাড়ী দক্ষিণ দরজা গৃহ, উহাতে একটি দেওয়াল-ঘেরা ছোট উঠান আছে। উঠানের দক্ষিণ দিকে একটি দরজা আছে। মাধববাড়ীর প্রধান মূর্তি—'মাধব'। উহা প্রস্তরনির্মিত মূর্তি। অন্য একটি মূর্তির নাম—'জয় দুর্গা'। উহা কোন্ ধাতু-নির্মিত মূর্তি তাহা জানা যায় না। আরও একটি মূর্তি আছে, তাহা তারা মূর্তি। ঐ মূর্তির গৃহ মাধববাড়ীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। উহাকে মাধববাড়ীর অংশ বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার পৃথক্ উঠান আছে, দীঘির পূর্ব তীরে যে রাস্তা আছে, সেইদিকে ঐ উঠান খোলা। এই রাজবাড়ীর পূজাই 'ভাওয়ালের পূজা'—

"আত্মবলি দিয়া ভাই করেছ কি পূজা,
অসুর-মর্দিনী সে দেবী দশভূজা ?"

—ফুলরেণু

—পূজা শেষে 'ভাওয়ালে বিজয়া'—

"এস আজ বিজয়ার প্রেম আলিঙ্গনে,
মহাপ্রেমে বদ্ধ হই এস পরস্পর,
যা ছিল নীচতা স্বার্থ দ্বেষ হিংসা মনে,
এস সে মালিন্য গ্লানি করিয়ে অন্তর।"

—ফুলরেণু

কবির কাব্যকালে 'ভাওয়াল' যেন চন্দ্রের মতো—রাজপরিবার যেন সূর্য, তাহার দীপ্তিতে তাহা আলোকিত। রাজবাড়ী ও রাজপরিবারের সঙ্গে কবি গোন্দবিদাসের ছিল এক নিবিড় যোগাযোগ। তাই তাঁহার কাব্যে ভাওয়াল-জয়দেবপুরের কথা, রাজা কালীনারায়ণ রায়ের কথা, তাহার পরিবারবর্গের কথা এত বেশী তুচ্ছাতিতুচ্ছ

বিলাস' (একটি আধুনিক ধরণের বাড়ী) নির্মিত হইয়াছিল। বাড়ীটি মামলার অনেক রহস্যের সন্ধান দিয়াছে।

জিনিসও কবির চোখে বিস্ময় জাগাইত। রাজবাড়ীর বর্ণনায় তাই আমরা পাই—সমাজ, জীবন ও সাহিত্য।

রাজবাড়ীর মধ্যে নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি পারিবারিক ডিস্পেন্সারী ছিল, উহাতে একজন ডাক্তার থাকিতেন। রাজবাড়ীর মধ্যে খাজাঞ্চিখানা বা ধনাগারও ছিল। রাজবাড়ীর পূর্বের একটা ঘরে ফরাসখানা ছিল। অন্দরে অবস্থিত রন্ধন গৃহছাড়া বড় দালানের উত্তর-পূর্বদিকে একটি বাবুর্চিখানা ছিল। প্রথম বাহির-বাড়ীতে এবং পরে পুরান বাড়ীর ছাদে একটি ষ্টুডিও ছিল। তাহা ছাড়া নাটমন্দিরে নাট্যাভিনয়ের জন্য একটি রঙ্গমঞ্চ ছিল। মহিলারা অন্দরেই থাকিতেন, তাঁহারা পর্দানশীন বা অসূর্যম্পশ্যা ছিলেন। রেল স্টেশনে গেলে তাঁহাদের পর্দার আড়ালে রাখা হইত, ষ্টীমারে যাইতে হইলে তাঁহাদিগকে পাল্কীতে ঘাটে পৌঁছাইয়া দিতে হইত।

রাজবাড়ীর বাহিরে তোরণ দিয়া বাহির হইয়া আসিলেই সম্মুখে একটি ময়দান [৬৩] পড়ে। স্থানীয় ভাষায় উহাকে "চটান" বলা হয়। পূর্বে উহা একটি জঙ্গলা ও অসম ফাঁকা জায়গা ছিল। পরে "পোলো"[৬৪] খেলার জন্যে পরিষ্কার রাখা ও সমতল করা হয়। উহার উত্তর দিকে রাজবাড়ীর রাস্তা। উহার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে রাস্তা। ঠিক রাজবাড়ীর উত্তরে রাস্তার পরে চীফ অথবা ম্যানেজারের

---

৬৩. ময়দান—এই ময়দান একটি ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী। ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলার বাদী মধ্যমকুমার—রমেন্দ্রনারায়ণ রায় জয়দেবপুরে যাওয়ার পরে ১৯২১ সালে ১৬ই মে যে বিরাট সভা হয়, তাহা এই ময়দানেই হইয়াছিল। এই সভায় বাদীর আত্মীয় ও প্রজাগণ বাদীকে মধ্যমকুমার বলিয়া স্বীকার করেন এবং প্রজাগণ তাঁহাকে নজর ও খাজনা পূর্বানুরূপ সাধারণ ও প্রকাশ্যভাবে প্রদান করিতে থাকেন।

৬৪. পোলো (Polo)—এক প্রকার খেলা। এই খেলা হকি খেলার মত, প্রভেদ এই যে, ঘোড়ায় চড়িয়া এই খেলা খেলিতে হয়। প্রাচ্য দেশসমূহে বহুকাল যাবৎ এই খেলা প্রচলিত। ভারতবর্ষ পোলো খেলায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

অফিস, পশ্চিম দিকে দীঘির দক্ষিণে দেওয়ান-খানা। উহার দরজা রাজবাড়ীর রাস্তার দিকে ছিল। পরে ১৯০৫ সালে উহা মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। ঐ মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়টিকে একটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয় এবং উহার নামকরণ করা হয় "রাণী বিলাসমণি স্কুল"। উহার দক্ষিণে অপরদিকে স্কুল বোর্ডিং। উহাতে একটি বাঁধা পুষ্করিণী ছিল। তাহার দক্ষিণস্থ একটি জায়গায় যে আস্তাবলগুলি ছিল এবং রাজার মৃতুর পরে দ্বিতীয় কুমার চটানের দক্ষিণে যে আস্তাবল নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ৪০টি ঘোড়া থাকিত এবং সব রকমের গাড়ী থাকিত, তন্মধ্যে একটি রৌপ্যমণ্ডিত গাড়ীও ছিল। চটানের পূর্বের রাস্তার একটি স্থানে জয়দেবপুর ডিহি অফিস, দীঘির পশ্চিম পাড়ে খাস অফিস। রাজার সময়কার ম্যানেজার রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের[৬৫] বাসভবন ঐখানে ছিল। রেল স্টেশনের নিকটে দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ের কথা স্মরণ রাখিয়া রাজপরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতায় কবি গোবিন্দদাস 'রাজা কালীনারায়ণ রায়' শীর্ষক কবিতায় লিখিয়াছেন, 'তিনি ছাড়া তার ব্যায়ামে চিকিৎসালয় কে করে স্থাপন'। তাহা ছাড়া আছে 'হাট'। হাটের দক্ষিণে রেল লাইনের অন্য পার্শ্বে অতিথিশালা, হাটটিও

৬৫. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রায়বাহাদুর, বিদ্যাসাগর—ইনি ১২৫০ বঙ্গাব্দে ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বঙ্গসাহিত্যের চিন্তাশীল লেখকগণের অন্যতম। সংস্কৃত, ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রেও ইনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইনি বহুকাল ভাওয়াল রাজ এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। ইনি 'রায়বাহাদুর' ও সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। "বান্ধব" নামক পত্রিকাখানি ইঁহার দ্বারা পরিচালিত হইত। "প্রভাত-চিন্তা", "নিশীথ-চিন্তা", "নিভৃত চিন্তা" ইঁহার রচিত পুস্তক।

রাজার সম্পত্তি। সোমবার শুক্রবার হাট বসে। সাধারণতঃ যেরূপ থাকে এখানেও সেইরূপ দোকান, হোটেল, আবগারী দোকান ও থানা ছিল। পরিবারস্থ শব দাহ করিবার স্থান 'শ্মশান বাড়ী'তে রাজ-রাজেশ্বরী দেবী মূর্তি, যাহা 'বুড়াবুড়ি' নামে পরিচিত। এক জোড়া গাছের নিকট রাজবাড়ীর উপরেই জল সরবরাহের কারখানা। সেখানে দাঘি হইতে জল পাম্প করিয়া পুরান বাড়ীর ছাদের উপর অবস্থিত সাতটি ট্যাংক ভর্তি করা হইত। রাজার মৃত্যুর পূর্বে পিলখানা রাজবাড়ী হইতে দুই মাইল দূরবর্তী বোরদহতে অবস্থিত ছিল। পরে চটানের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি স্থানে 'পিলখানা' করা হয়। পিলখানার নিকটে মাহুতদের জন্য চালাঘর ছিল। পিলখানাটি ছিল একটি খোলা ইট বাঁধা জায়গায়। ১৯০৪ সালে সেখানে ২০টি হাতী ছিল। ১৯০৯ সালে যখন দ্বিতীয় কুমার দার্জিলিং-এ ছিলেন, তখন সেখানে ছিল প্রায় ১৬টি হাতী। প্রত্যেকটি হাতীরই নাম ছিল এবং প্রত্যেকটিরই একজন করিয়া মাহুত, একজন মেট এবং দুইজন মেসেল ছিল। রেল স্টেশনের দক্ষিণ-পূর্বে মিঃ স্ট্রান্সবেরী নামক এক ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে একটি চা-বাগান (রাজার সম্পত্তি) ছিল এবং প্রায় এক মাইল দূরে একটি বাগান ছিল। পরিবারের বাসস্থানের সঙ্গে যে বিভাগ ও গৃহাদি ছিল, তন্মধ্যে এইগুলিই প্রধান।

এই পর্যন্ত যে সমস্ত বিভাগের বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে মফঃস্বলের কর্মচারীর সংখ্যা গণনার মধ্যে না আনিয়াও কেবল কর্মচারীর সংখ্যার একটা আভাষ পাওয়া যাইবে। জয়দেবপুরে বহুসংখ্যক কেরানী, ভৃত্য, রক্ষী, আরদালি, দারোয়ান, মালী, পাচক, অতিথিশালার কর্মচারী, বড় দালানের কর্মচারী, ডিস্পেন্সারীর, ফরাসখানা ও অফিস সমূহের কর্মচারী, গান-বাজনার ওস্তাদ (রাজা সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন), পালোয়ান, সহিস, মাহুত, পূজারী, শিক্ষক, ডাক্তার ও অন্যান্য বহু বিষয় যাহার সমস্ত উল্লেখ করা সম্ভবপর নহে,

তৎসম্পর্কিত লোকজন ছিল। মফঃস্বলে ৪৪টি 'ডিহি' ছিল। প্রত্যেক ডিহিতে একজন নায়েব একজন কেরানী কখনও কখনও একজন ঠিকা কেরানী এবং একজন বা তুইজন পিয়ন ছিলেন।

এই পরিবারের ঢাকা নলগোলা নামক স্থানে বুড়ীগঙ্গার[৬৬] উত্তরে একটি বাড়ী আছে। রাজা এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কুমারেরা যখন শহরে আসিতেন, তখন বাড়ীতে থাকিতেন। শহরে তাঁহারা প্রায়ই আসিতেন। ঐ বাড়ীর রোখ চারদিকে, নদী উহার পিছনে। ঐ বাড়ীর প্রায় বিপরীত দিকে একটি আস্তাবল ও 'মোক্তার অফিস' নামক একটি অফিস অবস্থিত, ঐ মোক্তার অফিস ঐ পরিবারের আইন অফিস। নদীতে একটি বজরা ও 'মোতিয়া' নামক একটি স্টিমলঞ্চ থাকিত। সংক্ষিপ্ত আকারে ইহাই হইতেছে ভাওয়াল-পরিবারেব রাজ-ঐশ্বর্যের ইতিহাস। ইহার সঙ্গে আর একটি ইতিহাস আছে যাহা করুণ, বেদনাদায়ক ও মর্মস্পর্শী। সেই ইতিহাস হইতেছে—কবি গোবিদাসের সঙ্গে রাজপরিবারের সংঘর্ষ এবং রাজ-সংসারের সংস্রব বর্জন, অর্থাৎ কবির তুর্ভাগ্যের সূচনা। ব্যক্তিগত সুখের জন্য তিনি ইচ্ছা করিলে রাজপরিবারের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসায় চলিতে পারিতেন, অথবা তোষামোদ করিয়া নিজের নিশ্চিত উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ধাতটি ছিল অন্য ধরনের। তাই তাঁহার সংগ্রাম ছিল—আপোষহীন সংগ্রাম। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিতে তিনি জানিতেন না। কাল কি খাইবেন ইহাই যাঁহার ঠিক নাই, চাকরি ছাড়িয়া দিলে কি হইবে, ইহাই যে চিন্তা করে না, সেই মানুষ আর যাই হোক

৬৬. বুড়ীগঙ্গা—ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটি নদী। ঢাকা শহর এই নদীর তীরবর্তী। এই তীরে বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের কথা উল্লেখ করিতেই হয়। ইহার দৃশ্য সত্যই সুন্দর, বিশেষত বর্ষাকালে যখন নদী কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। ইহার জন্যই ঢাকাকে কেহ কেহ "প্রাচ্যের ভিনিস্‌" বলিয়া থাকেন।

'বুদ্ধিমান' নয়। সময় থাকিতে 'আখের' গুছাইতে কে না চায়? সমাজের পনেরো আনা লোকই তো এই শ্রেণীর। তাঁহারা গোবিন্দ-দাসকে 'পাগল' বা 'বোকা' বলিয়া উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেন—এই পাগলরাই হইতেছেন 'কবি, শিল্পী, দাতা, গায়ক ও সেবক। কবি গোবিন্দদাস হইতেছেন এই 'এক আনা' শ্রেণীর দলের লোক—যাঁরা অন্যায় করে না, অন্যায়কারীকে প্রশ্রয় দেয় না, কৃতজ্ঞ কিন্তু অন্ধ কৃতজ্ঞ নয়। পাঁকেই যে পদ্ম জন্মে তাহা তিনি জানেন। আর জানেন বলিয়াই তাঁহার বিহার পদ্ম বনে, বেত্রবনে নয়। সকলের কাছে দুর্বলের বিচারের বাধা নীরবে নিভৃতে কাঁদিলেও গোবিন্দদাস তার কেবল নীরব সাক্ষ্য নন—সরব সাক্ষ্য। পুরুষসিংহের মত গর্জন করেন, সর্বস্ব ত্যাগ করেন, আবার চোখের জলে প্রিয় জন্মভূমি সিক্ত করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। সারাজীবন কবি গোবিন্দদাস নিজেকে 'এক ঘাটে পূর্ণ করিয়া অন্য ঘাটে শূন্য করিয়া দিয়াছেন'—ইহাই তাঁহার জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী জীবন এই বৈশিষ্ট্যের ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। প্রিয়জন যতই প্রিয় হোক না কেন, অন্যায়কারী বা অন্যায় প্রশ্রয়কারী হইলে তাঁহাকে তিনি ক্ষমা করিতে পারিতেন না। দলে ভারী না হইলেও তিনি সত্যের পথে একক যাত্রী। তিনি নির্ভীক, সংগ্রামী, পরোপ-কারী, দরদী ও মরমী স্বভাব-কবি ছিলেন। আর এইজন্যই একান্ত প্রিয় ভাওয়াল-রাজপরিবারের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সংঘর্ষের পরিণামে নির্বাসন। সেই ইতিহাস আলোচনায় আসিবার পূর্বে আর একবার বলি—নির্যাতিত প্রজার জন্য কেহ না থাকুক, আছে অবহেলিত কবি গোবিন্দদাস, আছে তাঁহার 'মগের মুলুক'-কাব্য—যাহা যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচারীর প্রতি বলিষ্ঠ প্রতিবাদস্বরূপ বাঁচিয়া থাকিবে।

কবি গোবিন্দদাস ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, দেশ-প্রেমিক ও তেজস্বী কবি। আর ইহার জন্যই তিনি ভাওয়াল রাজ-

পরিবারের যেমন স্নেহভাজন ছিলেন, তেমনি ঘটনাচক্রে বিরাগভাজন হইলেন। রাজা কালীনারায়ণ রায় বৃদ্ধ হওয়ায় একমাত্র পুত্র ও ভাবী উত্তরাধিকারী নাবালক রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জন্য একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি ও অভিভাবক খুঁজিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার নজর পড়িল বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বাগ্মী কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপর।[৬৭] কালীপ্রসন্ন ঘোষ তখন ঢাকা[৬৮] জিলার ছোট আদালতে হেড ক্লার্ক এবং 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎকালে 'বান্ধব' পত্রিকা

---

৬৭. কালীপ্রসন্ন ঘোষের পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া রাজা কালী-নারায়ণ রায় আকৃষ্ট হন এবং ভাওয়ালে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস এই যে, তাঁহার মত একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আগমনে, স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের পশ্চাৎদপসরণ ঘটে।

৬৮. ঢাকা—নারায়ণগঞ্জ হইতে ১০ মাইল দূর। বুড়ীগঙ্গা নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত ঢাকা একটি প্রাচীন নগর। ঢাকা নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। ঢাকার অধিষ্ঠাত্রীদেবী ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু ঢাকেশ্বরী হইতে ঢাকা না ঢাকা হইতে ঢাকেশ্বরী নাম হইয়াছে তাহা বলা শক্ত। কিংবদন্তী যে সতী দেহ বিষ্ণুচক্রে বিচ্ছিন্ন হইলে তাঁহার কিরীটের "ডাক" এইস্থানে পতিত হয়। "ডাক" স্থানীয় শব্দ, পতিত হওয়ায় স্থানটি একটি উপপীঠ বলিয়া গণ্য হয় এবং ঢাকা নামপ্রাপ্ত হয় ও দেবী ঢাকেশ্বরী নামে পরিচিত হন। অন্যমতে ঢাকেশ্বরী দেবী "ঢাকা" বা গুপ্ত ছিলেন, মহারাজ বল্লাল সেন তাঁহাকে আবিষ্কার করিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন এবং পূর্বে "ঢাকা" ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ঢাকেশ্বরী হয়। কেহ কেহ বলেন, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন রাজমহল হইতে এই স্থানে রাজধানী লইয়া আসেন তখন তাঁহার শিবির হইতে ঢাক বাজাইয়া যতদূর পর্যন্ত তাহা শোনা গিয়াছিল ততদূর রাজধানীর সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছিল এবং এইজন্য শহরের নাম হয় ঢাকা। কেহ বা বলেন ঢাক নামক গাছ হইতে ঢাকা নাম হইয়াছে। আজকাল কিন্তু ঢাক গাছ ঢাকা শহরে বিশেষ দৃষ্ট হয় না। এখন ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র।

পশ্চিমবঙ্গের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার সমগোত্র ছিল, অর্থাৎ সমান মর্যাদায় প্রচলিত ছিল। ইহাতেই কালীপ্রসন্ন ঘোষের সৃজনী-শক্তির ও পরিচালনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রখর বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার কথা তখন লোকের মুখে মুখে ঘুরিত। তাহা ছাড়া, এক দিকে তিনি ছিলেন যেমন কুমারের পরিচিত, অপর দিকে তেমনি ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। কারণ কুমার ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারই সভাপতিত্বে জয়দেবপুরে 'সাহিত্য সমালোচনা' সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিচক্ষণ রাজা ভাবিলেন, একদিকে পুত্রের তত্ত্বাবধান, অপরদিকে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ—এই উভয় কার্যই ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা ভালভাবে চলিবে এবং তাঁহাকে পাইলে তিনিও সমস্ত দায়দায়িত্ব হইতে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। এই মনে করিয়া রাজা কালীনারায়ণ রায় একদিন ঢাকার "বান্ধব কুটীরে" তাঁহাকে দেখিতে যান। প্রথম দর্শনেই তিনি মুগ্ধ হন এবং নিজের অভিপ্রায় জানান। রাজার আমন্ত্রণে ঘোষ মহাশয় হেড ক্লার্কের চাকরি ছাড়িয়া ভাওয়ালে আসেন। রাজা কালীনারায়ণ তাঁহাকে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ ভাওয়ালের সর্বপ্রধান রাজকর্মচারী পদে নিযুক্ত করেন এবং কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার তত্ত্বাবধানে সমর্পণ করেন। অতঃপর নিশ্চিন্ত মনে বৃদ্ধ রাজা কলিকাতায় যাত্রা করেন এবং চক্ষু চিকিৎসা করাইয়া তথা হইতে তীর্থ পর্যটনে বাহির হন। বলা বাহুল্য, প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পুনরায় কর্তত্ব গ্রহণ করিলেও আর বেশীদিন বাঁচেন নাই, কর্তৃত্ব পুনরায় ঘোষ মহাশয়ের হাতে আসে।

এদিকে ঘোষ মহাশয়ের সর্বময় কর্তৃত্বে এবং রাজার অনুপস্থিতিতে ভাওয়াল রাজ্যে নানা বিশৃংখলা দেখা দিল। রাজকুমার বৃদ্ধ রাজার অনুপস্থিতির সময় ভোগবিলাসের উপযুক্ত সময় মনে করিয়া যৌবন-জল-তরঙ্গে গা ভাসাইয়া দিলেন। নিজে কোন রাজকার্য

পরিচালনা করিতেন না, এমন কি পরিদর্শনেও বাহির হইতেন না। সর্বদাই নেশায় বিভোর থাকিতেন। বৃদ্ধ রাজা ঘোষ মহাশয়ের হস্তে কুমারকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, আর কুমার যাবতীয় রাজকার্য পরিচালনার ভার ঘোষ মহাশয়ের উপর দিয়া পরম নিশ্চিন্তে বিলাসিতায় ডুবিয়া রহিলেন। এই সুযোগে কালী-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ভাওয়াল রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। ফলে তাঁহারই নির্দেশে ও ইঙ্গিতে রাজকর্মচারীরা অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিল। রাজা যেখানে মদে মত্ত, ঘোষ মহাশয় সেখানে ক্ষমতায় প্রমত্ত। রক্ষক ভক্ষক হইয়া উঠায় এবং প্রতিকারের কোন পথ না থাকায় রাজলক্ষ্মী বিদায় গ্রহণ করায় অবহেলার ফল শোচনীয়ভাবে দেখা দিল। শুরু হইল খরা আর মরা। রাজ্য জুড়িয়া দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার সীমা-পরিসীমা রহিল না। অসম্পূর্ণ রাজকার্য, অসমাপ্ত পরিকল্পনা আর বিচারের নামে প্রহসন নিত্যকর্মপদ্ধতি হইয়া দাঁড়াইল।

এইরূপ অবস্থায় দেশপ্রেমিক গোবিন্দদাসের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি রাজা কালীনারায়ণ রায়ের অনুপস্থিতিকালে কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি বা পার্শ্বচর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রজার দুঃখে অবিচলিত রাজাকে বিচলিত করিবার জন্য তিনি বারংবার অনুনয়-বিনয়, অভিযোগ-অনুযোগ করিতে লাগিলেন।[৬৯] কিন্তু এই শুভ প্রচেষ্টা ঘোষ মহাশয়ের কাছে বিষময় হইয়া উঠিল। নিজের

৬৯. "নিজের কাজ নিজেই করা কর্তব্য, অন্ততঃ সর্বোপরি সময় সময় তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন একান্ত আবশ্যক। সহস্র সহস্র লোকের সুখ, দুঃখ ও ন্যায়-অন্যায়ের বিচার ভার বিধাতা যাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসে, বিষয় সম্পত্তির ভারার্পণ করা যে বুদ্ধিমানের কার্য নহে, ইহাও তাঁহাকে সর্বদা বলিতাম। ক্রমে একথা কালীপ্রসন্নের কানে গিয়া পৌছিল।"
—গোবিন্দদাসের পত্র।

প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইয়া উঠিলেন। ছলে-বলে-কৌশলে কিভাবে গোবিন্দদাসকে জব্দ করা যায়—ইহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিল। এই অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়া কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—"আমাকে কিরূপে রাজার নিকট হইতে তাড়াইয়া, তাঁহার অনুগত ও বাধ্য লোক রাজার নিকটে আমার কার্যে নিযুক্ত করিবে, এখন তাঁহার সেই চেষ্টা হইল। কিন্তু আমার কোন ত্রুটি না পাইলেও অন্য কারণে তাঁহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল।" (পত্র)। অভীষ্ট-পূরণে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের কোন বিচার ঘোষ মহাশয়ের ছিল না। ক্ষমতা তাঁহাকে এত অন্ধ ও ঔদ্ধত্য করিয়া তুলিয়াছিল যে 'প্রজাপীড়ন' রাজকার্যের ভূষণ হইয়া উঠিল। রাজার অনুপস্থিতি এবং ঘোষ মহাশয়ের উপস্থিতি—এই সময়ের মধ্যেই রাজকর্মচারীরা, জ্ঞাতি-কুটুম্বরা এবং অনুগ্রহপুষ্ট স্তাবকেরা যাহা খুশী তাহা করিতে লাগিল। শাসনযন্ত্র পীড়নযন্ত্রে পরিণত হইল। প্রজার ধন-প্রাণ-মান বিপন্ন হইয়া উঠিল। এইরূপ অবস্থায় একটা ঘটনা ঘটিল যাহা ঘোষ মহাশয়ের পক্ষে 'পৌষ মাস' একং কবি গোবিন্দ-দাসের পক্ষে 'সর্বনাশ' হইয়া উঠিল।

পূর্বেই বলিয়াছি, কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে রাজ পরিবারের সম্পর্ক জন্মাবধি। অথচ যে ঘটনা এই সম্পর্কের মূলে আঘাত হানিল, তাহা অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ছাড়া আর কিছুই নয়। একদিন রাজা কালীনারায়ণ রায়ের আত্মীয় শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়) ও শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট) এবং জনৈক ব্যাঙ্গা খানসামা[৭০] একত্রে মিলিয়া

৭০. রাজা কালীনারায়ণ রায়ের প্রথমা পত্নী জয়মণি এবং কনিষ্ঠা পত্নী সত্যভামা। বড় শ্যামাচরণ প্রথমা রাণীর এবং ছোট শ্যামাচরণ কনিষ্ঠা রাণীর ভগিনী পুত্র। ব্যাঙ্গা খানসামা রাজভৃত্য হইলেও রাজা কালীনারায়ণ রায়ের প্রিয়পাত্র ছিল। বড় শ্যামাচরণ মফঃস্বল ডিহি কাছারীর নায়েব এবং ছোট

মদ্যপান করতঃ উন্মত্ত অবস্থায় রাত্রিতে জনৈক প্রজা বেচু শিকদারের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া কুমতলবে গৃহ-প্রাচীরে বারবার আঘাত করে এবং গৃহদ্বার খুলিয়া দিতে হুকুম করে। ইহাতে শিকদার পত্নী অত্যন্ত ভীতা হইয়া উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে থাকেন। ফলে গৃহভৃত্য বাধা দিতে আসিলে দুর্বৃত্তরা তাহাকে নির্মমভাবে প্রহার করিয়া পলায়ন করে।

বেচু শিকদার বাড়ী ফিরিয়া সব ঘটনা শুনিলেন এবং রাজবাড়ীতে যাইয়া দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী[৭১] মহাশয়ের নিকট আনুপূর্বিক সব বিবৃত করিলেন। দেবেন্দ্র কিশোর, বেচু শিকদারকে রাজার নিকট নালিশ করিতে বলিলেন। সেইমত পরদিন রাজ-

---

শ্যামাচরণ সদরের নাজীর ছিলেন। ইহারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী ও উচ্ছৃংখল ছিলেন। বেচু শিকদারের ঘটনার পুনর্বিচারে ইহাদের চাকরি চলিয়া যায়।

৭১. দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী—ময়মনসিংহ জিলার মুক্তাগাছার তদানীন্তন ভূম্যধিকারিণী ৺ভুবনময় দেবীর দত্তক পুত্র, দেবেন্দ্র কিশোর আচার্য চৌধুরী। তিনি সম্পত্তি হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়া রাজা কালীনারায়ণ রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে উপদেশ দেওয়ায়, তিনি ভাওয়াল রাজপরিবারে বাস করিতেছিলেন।

রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রকিশোর প্রায় সমকক্ষ ছিলেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে খুবই প্রণয় জন্মিয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রাজকার্যে অবহেলা করিতেন বলিয়া দেবেন্দ্রকিশোর তাঁহাকে সময় সময় অনুযোগ করিতেন।

. কবি গোবিন্দদাস দেবেন্দ্রকিশোরকে খুব ভালবাসিতেন। তাই তাঁহার কাব্য "ফুলরেণু" দেবেন্দ্রকে উপহার দেন এবং কাব্যের প্রথমেই জানান অন্তরের প্রীতি ও ভালবাসা—

"দেবেন্দ্র! দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি,
ত্রিদিব হইতে উচ্চহৃদয় তোমার,
চিরবসন্তের উহা পুষ্প-রাজধানী,
চিরফুল্ল ও নন্দনে মমতা মন্দার।"

দরবারে অভিযোগ উপস্থিত হইল। বিচারের ভার পড়িল কালী-প্রসন্ন ঘোষের উপর। ঘোষ মহাশয় শ্যামাচরণ-দ্বয়কে নির্দোষ বলিয়া এবং ব্যাঙ্গা খানসামার মাত্র পাঁচ টাকা অর্থদণ্ড করিয়া ন্যায়-বিচারের প্রহসন করিলেন। যে অপরাধে জেল, প্রচুর অর্থদণ্ড, শারীরিক নির্যাতন, সামাজিক শাসন, এমন কি নির্বাসন হইতে পারিত। অথবা লোকসমক্ষে অপরাধীকে ভৎ'সনা বা ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য করা যাইত—এই ক্ষেত্রে সেইসব কিছুই না হওয়ায় এবং গুরু পাপে লঘুদণ্ড হওয়ায় সমস্ত ভাওয়ালবাসীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। বেচুর কাতর ক্রন্দনে প্রজারা কাঁদিল, পশু-পাখী-কাঁদিল, যাহারা শুনিল তাহারাই কপালে করাঘাত করিল আর আকাশের দিকে চাহিয়া যেন বলিল—

"এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও আদি পিতা ভগবান্"।

—"ফরিয়াদ" (নজরুল)

—ব্যাকুলতাই ভগবান্‌কে পাওয়ার একমাত্র উপায়। কারণ ভক্ত যখন জাগান তখনই ভগবান জাগেন, তাই তো বলি—'ভক্তের ভগবান'। এই ভগবানের সব লীলা 'নরলীলা'[১২] রূপে প্রকটিত হওয়ায় মর্ত্য-বাসী গোবিন্দচন্দ্রের মধ্যে তাহার রূপ দেখা দিল। পতিতের ভগবান্ নির্যাতিতের পাশে মানবরূপে দাঁড়াইল। বেচুর ক্রন্দনে ও বিচারের প্রহসনে গোবিন্দচন্দ্রের হৃদয় বিচলিত হইল। তিনি এই মোকর্দমার পুনর্বিচারের জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন এবং প্রজাদের সংঘবদ্ধভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে

---

১২. "কৃষ্ণের শতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলায় হয় অনুরূপ।"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন—"যথাসময়ে আমি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। রাজাকে আমি অনেক বলিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছুই ফল হইল না। তখন রাজাকে বাধ্য করিয়া বিচার করাইবার জন্য আমার জিদ্ হইল। আমি জয়দেবপুরের আশনে কায়স্থ, ধোপা, নাপিত, চণ্ডাল প্রভৃতি সর্বজাতির ও সর্বশ্রেণীর লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়া তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলাম, আজ বেচুর বাড়ী যে ঘটনা হইয়াছে, অপরাধীরা যদি তাহার জন্য উপযুক্তরূপে দণ্ডিত না হয়, তবে কাল তোমাদের বাড়ীতে যে সেই কাণ্ড করিবে না, তাহার বিশ্বাস কি? ভবিষ্যতে নিজের মান-ইজ্জত রক্ষার জন্য, বেচুর বাড়ীর এই ঘটনার উপযুক্ত প্রতিকার করার জন্য, সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা কর্তব্য। সভা-সমিতি করিয়া জয়দেবপুরবাসী সকলকে এ কথা বুঝাইয়া এক দলভুক্ত করিলাম এবং সকলকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলাম যে, রাজা যদি পুনরায় ইহার ন্যায়বিচার না করেন, তবে আমরা নিজেরা ইহার বিচার-ভার গ্রহণ করিয়া ব্যাঙ্গা ও শ্যামাচরণদ্বয়কে উপযুক্ত শাস্তি দিব এবং ভবিষ্যতে আর কোন ভাওয়ালবাসী প্রজা যেন রাজবাড়ীর বিচারপ্রার্থী না হয়, তাহার জন্যও বিহিত উপায় অবলম্বন করিব।" (পত্র)।

যথাসময়ে এই 'বিহিত উপায়' অবলম্বন করা হইল। সংঘবদ্ধ প্রজারা কবির নেতৃত্বে রাজবাড়ীতে আসিয়া রাজার নিকট বিচার-প্রার্থী হইল। যে প্রজারা এতদিন কেঁচোর মত মাটির সঙ্গে মিশিয়াছিল, তাহারা আজ সর্পের মত ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে—ইহা দেখিয়া রাজা ভীত, সন্ত্রস্ত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। প্রজাদের অভূতপূর্ব সংহতি দেখিয়া এবং তাহাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা শুনিয়া রাজা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পুনর্বিচারের প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইলেন। ব্যাঙ্গা খান্সামা ইহা জানিতে পারিয়া রাজবাড়ী ত্যাগ করিয়া রাজা কালীনারায়ণের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু

প্রজা-সংহতির কথা টেলিগ্রাম মারফৎ জানিতে পারিয়া রাজা কালীনারায়ণ ব্যাঙ্গাকে প্রেরণ করিয়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে লিখিলেন যে, "শারীরিক শাস্তি ব্যতীত আর যে কোন শাস্তি উহাকে যেন প্রদান করা হয়।"

যথাসময়ে 'জনতার আদালতে' বিচার আরম্ভ হইল। এইবার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং কালীপ্রসন্ন—এই দুই জনে মিলিয়া বিচার করিলেন। বিচারের ফলে শ্যামাচরণদ্বয় চিরতরে কর্মচ্যুত হইলেন। ব্যাঙ্গার ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল এবং যতদিন তাহার সচ্চরিত্রতা প্রমাণিত না হয় ততদিন সে দক্ষিণে টাঙ্গ নদী, পশ্চিমে তুরগ নদী, পূর্বে ও উত্তরে চিলাই নদী—এই চতুঃসীমার মধ্যে ছাতা মাথায়, জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইতে পারিবে না, এইরূপ দণ্ডাদেশ হইল।

বিচারের রায়ে প্রজারা সন্তুষ্ট হইলেও গোবিন্দদাস মনে শান্তি পাইলেন না। বেচুর অপমানে তাঁহার মর্মস্থলে যে বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, অপরাধিত্রয়ের এই শাস্তি তাহা উপশম করিতে পারিল না। তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল প্রবল। বেচুর অপমানকে নিজের, তথা সমগ্র ভাওয়ালের প্রজাগণের, অপমান বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। তাই যেখানে অন্যায়ের ন্যায়বিচার হয় না, হয় বিচারের প্রহসন—সেখানে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়াই তিনি স্থির করিলেন।[৭৩] ১২৮৪ সনে ভাওয়ালের রাজগৃহের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

৭৩. "সেইদিন সেই মুহূর্তে সর্বসাধারণের সমক্ষে রাজার চাকরি ইস্তফা দিলাম।······আমার জিম্মায় রাজার যে সকল কাগজপত্র, টাকাকড়ি, নোট ইত্যাদি ছিল, তাহা ঐ প্রকাশ্য সভায় বুঝাইয়া, রাজার নিকট বাক্সের চাবি দিলাম। এই হইতেই জয়দেবপুরের চাকরি আমার ক্ষান্ত হইল।···প্রকারান্তরে কালীপ্রসন্ন ঘোষের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সে তাহার অনুগত লোক, রাজার নিকট আমার কার্যে নিযুক্ত করিয়া দিল।"—কবি গোবিন্দদাসের পত্র।

"যাই প্রিয় জন্মভূমি জননি আমার।
ভুলেছ কি গতকথা? আছে কি মা মনে?
সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি। তোমার তরে অকাতর মনে?
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সেদিন হায় করি চূর চূর,
পিশাচের প্রতিমূর্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোনার মুকুর।
কিন্তু—
এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা
মুছিত যদি মা তোর কলংক কালিমা।
যাই তবে জননি গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসি। মনে রেখ ভাই,
তোমাদেরি তরে সহি এত নির্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্বরের ঠাঁই।"[৭৪]

কবি 'বিড়ম্বিত' হইলেন আর ঘোষ মহাশয় আনন্দিত হইয়া বহাল তবিয়তে রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। এই সময় রাজা কালীনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হইল (১৬ই জুন ১৮৭৮)। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ 'রাজা' হইলেন বটে, কিন্তু মুকুট থাকিল কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের মাথায়। রাজকার্যে কুমারের শৈথিল্য ও অমনোযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগে কুমার, প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে কবি গোবিন্দদাসের নিকট হইতে কিছু বাধা বা সৎপরামর্শ পাইতেন, এখন তাহাও না থাকায় একেবারে 'বেপরোয়া' হইয়া উঠিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির একপক্ষ কাল পরে তিনি একখানি দলিল সম্পাদন-

---

৭৪. কবিতাটি রচনার বহু পরে, ১২৯২ সনে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পূর্বক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে ভাওয়াল রাজ্যে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করিয়া দিলেন।[৭৫]

---

৭৫. ১৩০৮ সনে ১৩ই বৈশাখ, রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ পরলোকগমন করিলে, তদীয় বিধবা পত্নী রাণী বিলাসমণি দেবী, ঢাকার দ্বিতীয় সাবজজ আদালতে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের নামে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষট্টি হাজার টাকার দাবীতে এক অভিযোগ করেন। উক্ত অভিযোগের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"বাদিনীর স্বামী…………শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই…… বিবাদীর অনুকূলে এক আমমোক্তারনামা সম্পাদন করিয়া দেন এবং……… বিবাদিকে কর্মচারীগণের নিকাশ গ্রহণ, খরচ বহাল বাজেয়াপ্ত ও হুজরী মফস্বলী, সমস্ত কর্মচারী বহাল ও বরতরফ করার ক্ষমতা ও অন্যান্য ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান করেন। এবং বিবাদী ক্রমে শাসন সংরক্ষণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বভার এবং ষ্টেটের আয়-ব্যয় ও তহবিলের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন।…………এই প্রকারে স্বামী মহাশয় ক্রমে বিষয় সম্পত্তি সম্পর্কিত কার্য ও স্টেটের আয়-ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা একেবারে পরিত্যাগ করেন এবং বিবাদীর প্রতি অচল বিশ্বাস স্থাপন করেন। এবং বাদিনীর স্বামী অসার দোষণীয় আমোদ-প্রমোদে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট এবং……পরিষদবর্গে পরিবেষ্টিত থাকেন এবং তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, পূর্বে তিনি যে খাজাঞ্চিখানায় সুমার দস্তখত করিতেন তাহা হইতে……… ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।"

—রাণী বিলাসমণি দেবীর মুদ্রিত অভিযোগের প্রতিলিপি

প্রবাসে গোবিন্দদাস

ভাওয়াল রাজপরিবারের কর্মত্যাগ—অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদ হইলেও ইহা কবি গোবিন্দদাসকে স্বদেশ-ত্যাগে বাধ্য করিয়াছিল। একদিকে অন্নচিন্তা, অপরদিকে পত্নীচিন্তা—এই দুই চিন্তাই কবিকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে কবির বিবাহ হয়। জয়দেবপুরেই তাঁহার পত্নী সারদা সুন্দরীর পিত্রালয়। কবি যেমন স্বদেশপ্রেমিক, তেমনি ছিলেন পত্নীপ্রেমিক। সারদা একদিকে গৃহলক্ষ্মী, অপরদিকে সৌন্দর্যলক্ষ্মী। কবির নিকট সারদা যেন সম্পর্কে স্ত্রী, সৌহার্দ্রে ভ্রাতা, ভক্তিতে কন্যা, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় সেবী, সম্পদে শোভা, ব্যয়ে শযঃ, অর্জনে লক্ষ্মী, রোগে ঔষধ। পত্নীহারা কবি যেন মণিহারা ফণী। কবির সারদা যেন বিহারীলালেরই[১৬] সারদা। বিহারীলাল প্রিয়াকে অমর করিয়া

---

১৬. কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী—(১৮৩৫-১৮৯৪)। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগুরু। কলিকাতার নিমতলা অঞ্চলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্তী। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। বাল্যকাল হইতেই গান ও কবিতার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তাঁহার সবচেয়ে বড় নেশা ছিল সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদনা করা। 'পূর্ণিমা' পত্রিকার তিনি ছিলেন সম্পাদক। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। এই পত্রিকায় তাঁহার অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পত্রিকার নাম—'সাহিত্য সংক্রান্তি'। ইহাতে তাঁহার 'প্রেম প্রবাহিনী' কাব্য প্রকাশিত হয়। তারপর, ১০৬৭ খ্রীষ্টাব্দে "অবোধ বন্ধু" পত্রিকার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত থাকেন। এই পত্রিকায় তাঁহার 'নিসর্গ সন্দর্শন', 'বঙ্গসুন্দরী', 'বন্ধু বিয়োগ' প্রভৃতি কাব্য মুদ্রিত হয়। এই

রাখিয়াছেন "সারদামঙ্গলে",[৭৭] গোবিন্দদাস করিয়াছেন "প্রেম ও ফুল"[৭৮] এবং "কুঙ্কুমে"[৭৯]। উভয় কবির কাব্যেই প্রকাশ

পত্রিকার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ বালক বয়সে বিহারীলালের লেখা পড়েন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে "ভোরের পাখী" আখ্যায় ভূষিত করেন। "সারদামঙ্গল", "সাধের আসন", তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। 'বাউল বিংশতি', 'মায়াদেবী' ও 'শরৎকাল' তাঁহার লিখিত। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৭৭. সারদামঙ্গল—কবি বিহারীলালের সারদামঙ্গল কাব্য ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "আর্যদর্শন" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিরহতপ্ত হৃদয়নিঃসৃত কতকগুলি কবিতার সমষ্টির নামই "সারদামঙ্গল"। ইহা কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যখানি পাঁচটি সর্গে বিভক্ত হইলেও মূল সুর একই—সরস্বতীকে বন্দনা করা। তবে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এখানে সরস্বতী পুরান-বর্ণিত দেবী নন, তিনি কোনো বস্তহীনভাব বা ভাবময়বস্তু। কবি সরস্বতীকে আপন অন্তরে লাভ করিতে চান। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। কবিও তাই সারদার জন্য কখনো অভিসারে বাহির হইয়াছেন, কখনো বিচ্ছেদে কাতর হইয়াছেন, আবার কখনো মিলনে আনন্দ অনুভব করিয়াছেন।

৭৮. প্রেম ও ফুল—কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকাব্য। ১২৯৪ সনে ফাল্গুন মাসে (১২ই মার্চ, ১৮৮৮) 'বিভা' নামক একটি উচ্চাঙ্গ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা প্রথমা পত্নী সারদা সুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত। ইহার অন্তর্ভুক্ত 'পরশুরামের শোণিত তর্পণ' কবিতাটি ১২৮৭ সালের ৮ম সংখ্যা 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রচনাটি যে গোবিন্দচন্দ্রের, ইহা সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ পরে জানিতে পারিয়াছিলেন। কাব্যের ২য় সংস্করণে 'শ্মশানে সম্ভাষণ' নামে একটি কবিতা ('নব্যভারত'—পৌষ ১২৯৫) 'শ্মশান সঙ্গীত' কবিতাটির পূর্বে সংযোজিত হইয়াছে।

৭৯. কুঙ্কুম—ইহা গোবিন্দদাসের আর একটি গীতিকাব্য। পৌষ ১২৯৮ (১০ই জুন, ১৮৯২)। কাব্যখানি সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত।

পাইয়াছে প্রেমিকের ব্যাকুলতা। বিহারীলালের কাব্যে দেখি—অন্তরে যিনি প্রেমানন্দময়ী, বাহিরে তিনি সৌন্দর্যস্বরূপিণী।—

"কে তুমি মানব দ্বন্দ্ব,
মূর্তিমান প্রেমানন্দ,
কে তুমি জননী, পিতা,
নন্দিনী, রমণী, মিতা,
প্রেম-ভক্তি-স্নেহরস-উদার-উচ্ছ্বাস"।

কবির প্রেমের কাছে প্রিয়া হইয়া উঠিয়াছেন দেবী এবং দেবী হইয়া উঠিয়াছেন প্রণয়িনী। তিনি বিচিত্র সুখ-দুঃখের সংগীতে কবির হৃদয় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছেন। কবি গোবিন্দদাসের কাব্যেও দেখি একই ব্যাকুলতা—

"সারদা !
হৃদয়রানি, প্রীতির প্রতিমাখানি,
এসগো পূজিব আজি প্রেম ও ফুলে।
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর সবই মাখা মাটি ও ধুলে।
এই ফুল—এই প্রীতি, দিয়াছি—দিতেছি নিতি,
যদিও—যদিও দেখি, চরণ মূলে,
তবু না ফুরায় আর, নূতন সৌন্দর্য্য তার,
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উচুলে।"

আবার কবি বিহারীলাল কল্পনা করিয়াছেন সারদার বিষাদাচ্ছন্ন মূর্তি এবং অনুভব করিয়াছেন অন্তরের বেদনা—

"তবে কি সকলি ভুল ? নাই কি প্রেমের মূল ?
বিচিত্র গগন ফুল কল্পনালতায় ?
মন কেন রসে ভাসে প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গেলে সেই ফুলহার ?

শত শত নরনারী দাঁড়ায়েছে সারি সারি
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারানিধি পায়, না হেরিলে প্রাণ যায়,
এমন সরল সত্য কি আছে না জানি।"

কবি গোবিন্দদাসের কাব্যেও দেখি—প্রিয়জনের বিয়োগ, প্রিয়তমার মৃত্যু কবির অন্তরে কত শূন্যতা সৃষ্টি করিয়াছে, মনে জাগিয়াছে যে বিরহ বেদনা, তাহাই তিনি ভাষায় রূপ দিতে চাহিয়াছেন—

"কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরুভূমি,
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে।
আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা,
আছি তব বিশ্বরূপে ডুবে অকূলে।
অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, দুঃখ নাই,
ভক্তিভরে যাহা পাই দিতেছি তু'লে,
মানুষ পাবে কি আর, তব যোগ্য উপমার ?
আদরে অঞ্জলি দেহ প্রেম ও ফুলে।"

কবি গোবিন্দদাস সারদাকে[৮০] অঞ্জলি দিয়াছেন 'প্রেম ও ফুলে', আর কবি বিহারীলাল অঞ্জলি দিয়াছেন 'সাধের আসনে'[৮১]—উভয় কবিই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সুন্দর।

কবি গোবিন্দদাসের বাসভূমি এবং সারদার পিতৃভূমির মধ্যে

---

৮০. সারদাসুন্দরী—কবি গোবিন্দদাসের প্রথমা প্রিয়তমা পত্নী। তাঁহার গর্ভে 'প্রমদা' ও 'মণিকুন্তলা' নামে দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১২৬৯ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ জয়দেবপুরে জন্মগ্রহণ করেন। আবার জীবনের শেষ পরিণতিও ঘটে জয়দেবপুরে 'চিলাই' নদীর তীরে—সন ১২৯২, ১২ই অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৮ ঘটিকা, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে।

৮১. 'সাধের আসন'—বিহারীলালের শেষ কাব্য 'সাধের আসন' (১৮৮৯) সারদামঙ্গলের পরিশিষ্টের মত। এই কাব্যে কবি তাঁহার কল্পিতা নারীমূর্তি

ব্যবধান একটি মাত্র দীর্ঘিকার। সারদার পিত্রালয়ের সম্মুখে, দীর্ঘিকার দিকে কতকগুলি সারি সারি এরণ্ড[৮২] বৃক্ষ ছিল। সারদা যখন কয়েকদিনের জন্য পিত্রালয়ে যাইতেন, তখন কবি বিরহে ব্যাকুল হইয়া দীঘির এপার হইতে ওপার চাহিয়া থাকিতেন 'প্রিয়ামুখ লাগি'। সারদাও কবিকে দেখিবার আশায় সেই এরণ্ড বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অবসরমত তাকাইয়া থাকিতেন। এইভাবে সাময়িক বিরহের দিনগুলি আঁখি-বিনিময়ে ও দীর্ঘশ্বাসে চলিয়া যাইত। পত্নীপ্রেমিক কবি পত্নী-বিয়োগান্তেও অজান্তে ওপারের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন এবং সম্বিত ফিরিয়া আসিলে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চোখের জল মুছিতেন। পরবর্তী কালে কবি 'কুঙ্কুমে' এই কথা মনে করিয়া স্মৃতি-চারণায় লিখিয়াছেন—

"যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,
তবে কি 'ভেরণ' গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার।"

সারদার স্বরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন। এখানে তিনি চাহিয়াছেন, বিশুদ্ধ আনন্দ ও রসোপলব্ধির বিশ্লেষণ। কাব্যটি দশটি সর্গে বিভক্ত এবং এখানে কবি দার্শনিক ভঙ্গীতে বিশ্বের ঐক্য-তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন—'কে তুমি, মা, কান্তিরূপে সর্বরূপে বিভাসিত'।

'সাধের আসনে' যিনি আনন্দলক্ষ্মী, তিনি বিশ্বাত্মা বা বিশ্বদেবী। ইনি একাধারে জ্ঞানরূপিনী চৈতন্যরূপিনী এবং সৌন্দর্যময়ী। সারদা একদিকে যোগীর ধ্যেয়, অপরদিকে কবির আরধ্যা।

"কবিরা দেখেছে তাঁরে নেশার নয়নে,
যোগীরা দেখেছে তাঁরে যোগের আসনে।"

৮২, এরণ্ড—ভেরেণ্ডা গাছ। এই গাছের ফল হইতে উৎপন্ন তৈল 'রেড়ির তেল' নামে পরিচিত। গাছের ডালগুলি খুব নরম এবং ফলগুলি ছোট। 'ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে'—(চণ্ডীমঙ্গল)—মুকুন্দরাম।

যে 'ভেরণ' গাছে 'আগে পাতা ভাঙ্গা' থাকিত, এখন আর তাহা দেখা যায় না—এই একটি কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় যে, কবি তাঁহার প্রিয়া সারদাকে কতখানি ভালবাসিতেন! প্রিয়া থাকিলে কি গাছগুলির পাতা অক্ষত অবস্থায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত? শুধু গাছ নয়, দীর্ঘিকার কথা কবির অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। উক্ত দীর্ঘিকা যেন কবির জীবন-নদীর দুই-পাড়—জন্ম-মৃত্যুর মিলন-বিরহ হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত এক ভাঙ্গা-গড়ার জীবন-ইতিহাস। নদীর এক পাড় ভাঙ্গে, আর এক পাড় গড়ে। তেমনি কবির জীবন-নদীর এক পাড়ে থাকে সারদা, অপর পাড়ে থাকে প্রমদা, 'সারদা'র অন্তর্ধানে 'প্রমদা'র আবির্ভাব। তাই উক্ত দীর্ঘিকা কবির জীবনে এক নীরব সাক্ষী। রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত ১২৮৬ সনের "বীণা" পত্রিকায় কবির 'ইহা কিছু নয়' কবিতায় ইহার উল্লেখ আছে—

"শারদ মধ্যাহ্ন, মাঝে শ্যামল পুকুর,
এপার ওপারে কথা নহে বহুদূর।
দক্ষিণের মৃদু বায়ু ধীরে দিল আনি
শ্রবণে প্রতপ্ত সুরা—'জানি তবে জানি।"

কবি জানেন 'জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে', তৎ-সত্ত্বেও জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তিনি তাঁহার হারানো প্রিয়াকে খুঁজিতেন। ছবি দেখিয়া বলিতেন—'নও ছবি, নও শুধু তুমি ছবি'। এই প্রিয়তমা সারদার গর্ভে গোবিন্দচন্দ্রের প্রমদা ও মণিকুন্তলা নামে দুইটি কন্যাসন্তান জন্ম গ্রহণ করে।[৮৩] ইহাদের জন্মের পূর্বেই

৮৩. সারদাসুন্দরীর গর্ভে কবি গোবিন্দদাসের 'প্রমদা' ও 'মণিকুন্তলা' নামে দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ১২৮৪ সনের ১৫ই ফাল্গুন প্রথম সন্তান 'প্রমদা' ভূমিষ্ঠ হয়। প্রমদা মাত্র একবৎসর জীবিতা ছিল। ১২৮৬ সনের ২৫শে বৈশাখ মারা যায়। দ্বিতীয়া কন্যা মণিকুন্তলা প্রমদার মৃত্যুর পূর্বে ১২৮৬ সনেই জন্মগ্রহণ করে।

তাঁহার মাতা ও পিতামহীর মৃত্যু হইয়াছিল। কবির মাতুলালয় বীরাশ্রম গ্রামে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। ইহার পর স্ত্রী-কন্যাকে দেখাশুনা করিবার কেহ না থাকায় তিনি তাহাদিগকে লইয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু কবির শ্বশুরালয়ের অবস্থাও তেমন সচ্ছল ছিল না। রাজবাড়ীর কার্য পরিত্যাগ করিবার পর কবিরও আর তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থ ছিল না—যাহার বলে কিছুদিন শ্বশুরবাড়ীতে সম্মানের সঙ্গে থাকিতে পারেন। যে বাড়ীতে সারদা আসিলে কবি নিজের গৃহে দাঁড়াইয়া ওপারের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, আজ স্ত্রী-কন্যা সহ সেখানে আসিয়া অভাবের মুখোমুখি পড়ায় পূর্বের সেই রোমান্স আর রহিল না। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' হইয়া উঠিল, এবং 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'—বলিয়া কবির নিকট মনে হইতে লাগিল। তদুপরি ভাওয়ালে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হওয়ায় সেই সময় এমন এক শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইল যে দিনান্তে এক-সন্ধ্যা আহারের সংস্থান করা কবির পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। এই অসহনীয় অবস্থার কথা কবি তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রিয়ে দুখিনী আমার।
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার।
শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর।"

—'ঘুচিল না আর'—এই বেদনা হইতেই কাব্যের সৃষ্টি। আর সেই কাব্য জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়ায় ইহা এক অপূর্ব 'নির্মাণক্ষম' সৃষ্টিরূপে চিহ্নিত হইয়াছে।

কিন্তু কবির বর্তমান জীবন কর্মহীন অবস্থায় নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। 'অন্নচিন্তা চমৎকারা' হইয়া দাঁড়াইল। বিদেশে যাওয়ার

ইচ্ছা করিলেও স্ত্রী-কন্যাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়া তাঁহার চিত্ত বিকল হইয়া উঠিল। আজ-কাল করিয়াও বিদেশে যাওয়া হইল না। অথচ অভাবের জ্বালা ঘুচাইতে হইলে বিদেশ-গমন ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই অবস্থায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ভগিনীপতি বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (কৃপাময়ী দেবীর স্বামী) মহাশয় তাঁহাকে বিদেশ-যাত্রার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে কবি গোবিন্দদাস কিরকম নিঃসম্বল অবস্থায় জয়দেবপুর হইতে ময়মনসিংহের[৮৪] উদ্দেশ্যে ১২৮৬ সনে ৯ই পৌষ (১৮৭৯ খ্রীঃ ২৩শে ডিসেম্বর) রওনা হইলেন এবং তখন ঢাকা-ময়মনসিংহে রেলপথ না থাকায় সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্ত-রিক্ত অবস্থায় পঞ্চম দিনে গন্তব্য স্থানে গিয়া পৌঁছাইলেন।

ময়মনসিংহে পৌঁছাইয়া কবি গোবিন্দদাস মুক্তাগাছার অন্যতম ভূ-স্বামী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর ব্রহ্মপুত্র-নদীতীরস্থ 'দেবনিবাসে' আতিথ্য গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে ভাওয়ালের রাজবাড়ীতে দেবেন্দ্র-কিশোরের সঙ্গে কবির পরিচয় ছিল এবং পরিচয় ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গ-তায় পৌঁছাইয়াছিল। আজ ভাগ্যান্বেষণে সেই বন্ধুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করায় বন্ধু তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময় ময়মন-সিংহের শিক্ষিত সমাজ সাহিত্যচর্চায় বিশেষ উৎসাহী হইয়া উঠিয়া-ছিলেন। দেবেন্দ্রকিশোরের মত অনেক ভূম্যধিকারীরাও বিদ্যোৎসাহী

---

৮৪. ময়মনসিংহ—পূর্ববঙ্গে, অধুনা বাংলাদেশে, ঢাকা বিভাগের একটি জেলা, সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে আয়তনে এই জেলা সর্ববৃহৎ। আয়তন ৬২৫০ বর্গমাইলের উপর এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ। ময়মনসিংহ জেলার প্রধান শহর, ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। এখানে একটি মেডিকেল স্কুল এবং একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ আছে। ইহা পাটের ব্যবসায়ের একটি বড় কেন্দ্র। 'নেত্র-কোণা' ময়মনসিংহ জেলার অন্যতম মহকুমা এবং 'ভৈরববাজার' একটি বিখ্যাত বন্দর। ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, কবি বিজবংশীর কন্যা।

ছিলেন। সেই সময়কার সাহিত্যিকগণের মধ্যে দীনেশচরণ বসু, আনন্দ চন্দ্র মিত্র, যাদবচন্দ্র লাহিড়ী, কালীনারায়ণ সান্যাল, অমরচন্দ্র দত্ত, জানকীনাথ ঘটক, অনাথবন্ধু গুহ।

এই সময় অর্থাৎ ১২৮৬ সনে কবি গোবিন্দদাসের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি স্মরণীয় এইজন্য যে, ইহার একটি রহস্য-জনক ইতিহাস আছে। ইতিহাসটি সংক্ষেপে এইরূপ। কবি গোবিন্দদাস যখন জয়দেবপুরে রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন "বান্ধব" পত্রিকার জন্য 'পরশুরামের শোণিত-তর্পণ' শীর্ষক কবিতাটি লিখিয়া পাঠান। পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কবিতাটি 'অমনোনীত' বলিয়া ফেরৎ পাঠান। ইহাতে কবি অন্তরে ব্যথা পান। এই প্রসঙ্গে কবি একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

"কালীপ্রসন্ন কবিতাটি আমাকে ফেরৎ দিয়া বলিল, 'আমার 'বান্ধবে' ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত, ডেপুটি নবীনচন্দ্র সেন, 'গ্রীক ও হিন্দুর'-র গ্রন্থকার প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় বড় লোকে লিখিয়া থাকেন, সেই 'বান্ধবে' তাঁহাদের লেখার সঙ্গে কি তোমার কবিতা প্রকাশিত হইতে পারে? আমি ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে মরিয়া গেলাম, এবং মনে মনে ভগবান্‌কে ডাকিয়া বলিলাম—'আমি 'বান্ধবে' লিখিতে পারি এমন শক্তি কি তুমি আমায় দিবে না?' আমার জিদ হইল 'বান্ধবে' লিখিব, অন্ততঃ একটি কবিতা হইলেও 'বান্ধবে' লিখিব। বলা বাহুল্য, ভগবান আমার এ বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"

বস্তুতঃ, ময়মনসিংহে থাকাকালীন কবির এই 'বাসনা পূর্ণ' হইয়াছিল—তৎকালীন প্রসিদ্ধ উকিল ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বারা। তাঁহারই সুপারিশে (পরিচয় গোপন রাখিয়া) কবিতাটি 'বান্ধবে' প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ও কবিতাটির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দদাসের নাম থাকায় যে কবিতাটি ঘোষ মহাশয় পূর্বে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন,

তাহাই মর্যাদাসহকারে 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় কবির জয় সূচিত হইল। "Pen is mighter than sword."—ইহা আর একবার প্রমাণিত হইল। কারণ, ক্ষমতার বলে ঘোষ মহাশয় 'দাস' কবিকে ভাওয়াল জয়দেবপুর হইতে বিতাড়িত করিলেও 'বান্ধব' পত্রিকা হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন নাই। অবশ্য পরে তিনি কৃপাময়ী দেবীর স্বামী বিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের (রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের ভগিনীপতি) নিকট কবিতাটি গোবিন্দচন্দ্রের রচিত বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন আর করার কিছুই ছিল না—"The die is cast, all is over." গায়ের জোরে না মানিলেও মনের জোরে কবিকে প্রশংসা করিতে হইয়াছে। ভাষার সৌষ্ঠবে, ভাবের গভীরতায় ও ছন্দ-অলংকার মাধুর্যে ইহা যে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রতিভাবলে ভাষা যে কত অলংকারময়ী, ছন্দোময়ী ও বর্ণনাময়ী হইয়া উঠিতে পারে, কবিতাটি না পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে না—

সাগরের যেন নীল জলরাশি,
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
কমলার চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা।
প্রভাতী মঙ্গল পাখীরা গাইল,
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল,
তরুণ অরুণ পরাইয়াছিল,
কিরণ-কিরীট-ভূষা।
অদূরে হিমাদ্রি ভারত প্রাচীর,
অনন্ত আয়ত মূরতি গম্ভীর,
চেয়ে আছে যেন তুলি উর্ধ্বে শির,
সভয়ে ভূধর রাজ।

পারেনা চাহিতে নিম্নে ধরাতলে
পঙ্করক্ত হ্রদ গর্জিয়া উছলে,
সফেন-তরঙ্গ ছুটে মহাবলে,
ভীষণ-ব্যাপার আজ।
প্রচণ্ড জ্বলন্ত দ্বাদশ মিহির,
মহাজ্যোতির্ময় বিরাট শরীর,
অঞ্জলি পুরিয়ে, লইয়ে রুধির
দাঁড়ায়ে হ্রদের তীরে,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মূলে ধৃত উপবীত,
ডাকিছে গম্ভীরে—পৃথিবী স্তম্ভিত,
শত মেঘমন্দ্রে নভ বিকম্পিত,
সমীর বহিছে ধীরে।"

কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মনে হয়, এমন এক রূপময় জগতে বিচরণ করিতেছি, যেখানে দুঃখ-কষ্ট-দৈন্য-শোক সব কিছু আছে, কিন্তু সমস্ত কিছুকে ছাপাইয়া এমন এক মধুমান প্রশান্তি বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, যেখানে 'সমীর বহিছে ধীরে'। কবিতাটি রচনার সময় কবি একজন চতুর্বিংশতি বর্ষীয় যুবক ছিলেন এবং ইহার রচনাকাল জয়দেবপুরে অবস্থানকালে অর্থাৎ প্রবাসে যাইবার পূর্বে রচনা করিয়াছিলেন। এককথায় ১২৮৬ সন কবির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য বৎসর। এই বৎসরেই কবির কাব্য-জীবনে ও কর্ম-জীবনে সু-প্রভাতের সূচনা হয়। ময়মনসিংহে বাণীবন্দনা উপলক্ষ্যে[৮৫] কবির রচিত "বাণী

৮৫, ১২৯৮ সনে ময়মনসিংহে সারস্বত-উৎসবে কবি 'সারস্বত উৎসব' নামে একটি কবিতা নিজে পাঠ করেন। কবিতাটি মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী—

"এমনি ভারতবাসী, নিত্য অশ্রুজলে ভাসি
অর্পিছে অঞ্জলি শত ও চরণপর
এমনি পঞ্চমী শুক্লা বসন্তে সুন্দর।"

আরাধনা” নামে কবিতাটি পরে ময়মনসিংহের সাপ্তাহিক পত্রিকা “ভারত মিহিরে”[৮৬] প্রকাশিত হয় এবং উহা সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহের[৮৭] দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দৃষ্টিই পরবর্তী কালে কবির জীবনে শুভদৃষ্টির সূচনা করিয়াছিল। কমলকৃষ্ণের আগ্রহেই কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহ হইতে সুসঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

কবি সুসঙ্গে যাইবেন, অথচ তাঁহার সাজ-পোষাক নাই। সরস্বতীর প্রসন্নতায় যিনি ধনী, লক্ষ্মীর অপ্রসন্নতায় তিনি দরিদ্র। সারাজীবন একহাতে জয়মাল্য এবং অপরহাতে কণ্টকমাল্য তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে; আত্মচেতন কবি, ইহা তাঁহার অঙ্গের ভূষণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই নিজে কাঙ্গাল হইলেও কাঙ্গালিপনা ব্যবহার করেন নাই। ভগবদ্‌বিশ্বাসী কবি সর্বদাই মনে করিতেন ‘একটা কিছু উপায়’ হইবে। উপায় মিলিল। দেবেন্দ্র কিশোর কবির ছিন্ন ও মলিন বেশ দেখিয়া দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে “একটি পিরান, একটি আলপাকার কোট ও পরিধেয় ধুতি-চাদর” ক্রয় করিয়া

৮৬, ভারতমিহির—ময়মনসিংহে একটি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই পত্রিকায় লিখিতেন। বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী শ্রীজানকীনাথ ঘটক মহাশয় এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

৮৭. কমলকৃষ্ণ সিংহ—সুসঙ্গ দুর্গাপুরের বিদ্যোৎসাহী মহারাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ। তাঁহারই যত্ন ও উৎসাহে ১২৮৫ সনে দুর্গাপুর হইতে ‘কৌমুদী’ ও ‘আর্য্য-প্রদীপ’ নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তিনি একজন যথার্থ সাহিত্যসেবী ও প্রকৃত গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। ‘অশ্বতত্ত্ব’ তাঁহারই রচনা। ‘ভারত মিহির’ পত্রিকায় কবি গোবিন্দদাসের কবিতা পাঠ করিয়া তিনি এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং সুসঙ্গের কবি রুক্মিনীকান্ত ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা কর্মপ্রার্থী কবিকে কর্ম দিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দিয়াছিলেন। অতঃপর ১২৮৬ সনে মাঘমাসে কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহ হইতে পদব্রজে দেড়দিন পরে সুসঙ্গের রাজধানী দুর্গাপুরে উপস্থিত হইলেন।

কবির শুভাগমনে মহারাজা কমলকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং রাজচিকিৎসক কৃষ্ণগোবিন্দের বাসায় তাঁহার শয়ন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। আহার্য রাজবাড়ী হইতে পাঠানোর ব্যবস্থা হইল। অল্প কিছুদিন পরে মহারাজা কবিকে অস্থায়ীভাবে খাজাঞ্চির পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে পূর্বতন খাজাঞ্চির মৃত্যু হইলে কবি উক্ত পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইলেন। ভৈরবচন্দ্র মিত্র নামে জনৈক ভদ্রলোক তখন সুসঙ্গরাজের প্রধান কার্যকারক ছিলেন। কবির জীবনে এই প্রথম বিদেশ-যাত্রা এবং চাকরি-গ্রহণ। কিন্তু গৃহ-কোণের স্ত্রী-কন্যার আকর্ষণ কবিকে এতবেশী বিচলিত করিত যে, প্রবাসজীবন 'নির্বাসন-জীবন' বলিয়া মনে হইত। এইরূপ মর্মান্তিক অবস্থায় কবি লিখিলেন—"চাকরি করিতে যাই"। ইহাতে কবির তৎকালীন মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত হইয়াছে। তিনি লিখিলেন—

"যেওনা যামিনী আজি'—হয়োনা প্রভাত
কি বলিব মাথা-মুণ্ড ছাই ভস্ম আর,
হৃদয়ে দারিদ্র্য দুঃখ শক্তি শেলাঘাত,
করিতেছে প্রবাহিত রক্ত শতধার।
নীরবে নিঃশেষে রক্ত হতেছে পতন,
নীরবে অলক্ষ্যে এই হয় অশ্রুপাত,
নীরবে মরমমূল করি বিধুনন,
নীরবে নিঃশেষে এই প্রাণের প্রপাত।
উঠিলে ভাস্কর খুলি দুর্বাসার দ্বার
গ্রাসিবে জীবন 'অন্নচিন্তা চমৎকার'।"

এইভাবে কবি তাঁহার জীবন-নাট্যের নাট্য-কাহিনী বিবৃত করেন।

প্রবাসে যখন অনাহারে-অনিদ্রায়-কায়ক্লেশে কবি মধুসূদন দিন কাটাইতেছিলেন, তখন তিনি স্বদেশত্যাগের সময় যে কথাটি বলিয়াছিলেন, স্মৃতি-রোমন্থনে তাহাই যেন আবার মনে পড়িতে লাগিল—"রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে"। আবার স্বদেশের 'আগমনী বিজয়া'[৮৮] উৎসবের কথা মনে করিয়া বলিতেছেন—

"যেওনা রজনী আজি লয়ে তারা দলে,
গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে।"

---

৮৮. আগমনী বিজয়া—বৈষ্ণব কবিতার পাশাপাশি শাক্ত কবিতার ধারা বহিয়া আসিলেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদের আবির্ভাবে ভক্তিরসে ইহা 'পদাবলী' আখ্যা লাভ করে। এই শাক্ত পদাবলীকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয়:—(১) শ্যামাসংগীত, (২) উমাসংগীত। বাঙালী শক্তিস্বরূপিনী মহামায়াকে কখনও মাতৃরূপে, কখনও বা কন্যারূপে দেখিয়াছেন। মাতৃরূপে দেখিবার ফলে উদ্ভব হইল শ্যামাসংগীতের এবং কন্যারূপে দেখিবার ফলে উদ্ভব হইল উমাসংগীতের। উমাসংগীতকে আবার 'আগমনী' ও 'বিজয়া'—এই দুই গীতধারায় ভাগ করা যায়। দেবীর মর্ত্যে আগমন উপলক্ষে যে সংগীত, তাহা 'আগমনী' সংগীত এবং তিনদিনের পর অর্থাৎ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পর দশমীর দিন দেবীর বিদায় বা বিসর্জন উপলক্ষে যে সংগীত, তাহা 'বিজয়া' সংগীত। ইহা বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এমন করিয়া প্রাণমাতানো গান আর কেহ গাহিতে পারে না।

'আগমনী' ও 'বিজয়া' সংগীত গিরিজা উমাকে কেন্দ্র করিয়া গীত হইলেও উহা প্রকৃতপক্ষে বাঙালী পিতামাতার অশ্রু দিয়া রচিত হইয়াছে। বিবাহিত জীবনে কন্যার গার্হস্থ্য জীবন যদি ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে মায়ের প্রাণে যে ব্যথা-বেদনা দৈনন্দিন জীবন স্মৃতিরোমন্থনে জাগিয়া উঠে, তাহারই বাস্তব অভিব্যক্তি—এই আগমনী-বিজয়া গানের মধ্য দিয়া মূর্ত হইয়া উঠে। তখন ঘুচিয়া যায় স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান। আগমনী-বিজয়া গান বাৎসল্যরসের অলকানন্দা।

কবির কাছে 'নয়নের মণি' মা মেনকার স্নেহের দুলালী উমা। কিন্তু কবি গোবিন্দদাসের কাছে পত্নী-কন্যা হইতেছেন 'নয়নের মণি'। তাই ইহাদের ছাড়িয়া বিদেশে আসায় কবি গোবিন্দদাসের অবস্থা যেন মণিহারা ফণীর মত। কবির এক কন্যার নামও মণিকুন্তলা। এমতাবস্থায় কবি তাঁহার স্ত্রীর কাছে বিদায়-মুহূর্তে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার[৮৯] লক্ষণাক্রান্ত—

"চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার
অনলে কুসুম ভস্ম দেখিব না আর।

* * *

কত কষ্ট দিয়াছি যে জীবনে তোমার
যাই প্রিয়ে, সে সকল করিও না মনে,
জানি আমি এ জীবনে ক্ষমা নাই তার
চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে।

---

৮৯. গীতিকবিতা—'গীতিকবিতা' কথাটির অর্থ গান ও কবিতার সংমিশ্রণ। ইংরাজী সাহিত্যে গীতিকবিতাকে বলা হয় (Lyric)। সংগীতমূলক এই কবিতাগুলি বীণাযন্ত্রের (Lyre) সহযোগে গীত হইত বলিয়াই ইহাদের নাম হইয়াছে (Lyric) বা গীতি-কবিতা। কিন্তু আধুনিক কাব্যে গীতি-কবিতার যে রূপটি দেখা যায়, তাহাতে তাহাকে সঙ্গীতের সঙ্গে এক সারিতে বসাইলে ভুল করা হইবে। ইহাদের মধ্যে গীত ও কবিতার অর্থাৎ সঙ্গীত ও গীতি-কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ সুপরিস্ফুট। আধুনিক গীতি-কবিতার মধ্যে সঙ্গীতধর্মিতা থাকিলেও ইহা নিছক সঙ্গীত নহে। আধুনিক গীতি-কাব্য ব্যক্তিনিষ্ঠ। তাই, যে কবিতায় কবির নিজের মনের অনুভূতি,—কবির ব্যক্তিগত বাসনা-কামনা ও আনন্দ-বেদনা প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে আবেগকম্পিত সুরে অখণ্ড ভাবমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাই শ্রেষ্ঠ গীতি-কবিতা। এক কথায় "বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই" গীতি-কাব্য।

যাইরে অবোধ শিশো।—হে করুণাময়,
দীনবন্ধো, বাঁচাইয়ো এ দীন সন্তান,
স্বর্গের করুণা তব চির সুধাময়,
রাখে যেন অভাগিনী দুঃখিনীর প্রাণ।
এমন আত্মীয় নাই একজন আর
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার।"

কবি স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন বলিয়াই ভাওয়ালরাজার চাকরি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয়তমা পত্নী ও শিশুকন্যাকে শ্বশুরালয়ে রাখিয়া প্রবাস-জীবনের দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছিলেন। স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা তাঁহাকে কর্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই, ইহা তাঁহাকে কর্তব্যপরায়ণ করিয়া তুলিয়াছিল। মনুষ্যত্ব তাঁহাকে দেবতা করে নাই, মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই ছিল—মানুষের মধ্য দিয়াই দেবতার প্রকাশ ঘটিবে, মানুষ "মানুষ" হইবে। প্রবাস-জীবনে কবি এই উদ্দেশ্যের কথা তাঁহার কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের যে উপহার দিয়েছেন, তাহা 'জাতীয় উপহার' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিবে—

"পৃথিবী!
কতদিন, কতদণ্ড মাস পক্ষবার,
ভ্রমি নিত্য অবিরত, বৎসর করিলে গত
আপনার বক্ষপূর্ণ করিলে তোমার।
কত শত্রু অহরহঃ, কত গ্রহ উপগ্রহ
শত্রুতা করিয়াছিল সংখ্যা নাহি তার।
তুমি তাহা তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাত পানে,
চলিয়াছ আপনার পথে অনিবার
নিত্যবুকে উল্কাপাত, নিত্যবুকে বজ্রাঘাত
পুড়েছে ভেঙ্গেছে বুক বটে শতবার,
তথাপি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়নি তোমার।

* * *

আমিও তোমার মত জীবন করিব গত

ভ্রমিব সংসার-মাঝে অবলম্বহীন,

তোমারি মতন হায়, অবিচল প্রতিজ্ঞায়

আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন।

বিপদের তৃণজ্ঞানে, না চাহি পশ্চাৎপানে

সাধিব কর্তব্য কর্ম বাঁচি যতদিন

হৌক না সংসার শূন্য অবলম্বহীন ?"

—ইহাই ছিল কবির জীবনাদর্শ। ইহা যেন সেই কথা—

"তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,

কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।

প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥"[২০]

ধূপ ও গন্ধ, সুর ও ছন্দ, ভাব ও রূপ, অসীম ও সীমা, বন্ধন ও মুক্তি এমনি স্বতোবিরোধে পূর্ণ এই জগৎ। স্বতোবিরোধিতা আছে সত্য, কিন্তু একটা হইতে আর একটায় যাতায়াতের পথ সেইজন্য রুদ্ধ নয়, বরং ভাব হইতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা চলিতেছে। কবি গোবিন্দদাসের কাব্য-ধর্মে ও জীবন-ধর্মে ইহাই ছিল প্রাণ। তাই চোখের জল, পত্নীর প্রেম, শিশুর হাতছানি—কিছুই তাঁহাকে কর্তব্যচ্যুত করিতে পারিত না। তাঁহার মর্মবাণীই ছিল—'সাধিব কর্তব্য কর্ম বাঁচি যতদিন'! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কবি এই 'কর্তব্যকর্ম' করিয়া গিয়াছেন। তিনি জানিতেন—

"তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে

তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না,

কান্নাকাটি করব না।"[২১]

---

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"পূজা" (৩৬৭নং কবিতা)।

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—"স্বদেশ" (৭নং কবিতা)।

বিপদে কবি বিচলিত হইতেন, কিন্তু ভাঙ্গিয়া পড়িতেন না; সম্পদে আনন্দলাভ করিতেন, কিন্তু আত্মহারা হইতেন না। সম্পদে বিপদে বন্ধুর পথে তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী পুরুষ। এক কথায়, তাঁহার জীবন ছিল তাঁহার বাণী।

॥ কর্মজীবনে গোবিন্দদাস ॥

কবি গোবিন্দদাসের কর্মজীবনের যাত্রা শুরু হইল সুসঙ্গ দুর্গাপুর হইতে। কবি যখন আসেন তখন শীতকাল। এই সময় এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। গভীর বনানী চারিদিক্ বেষ্টিত করিয়া জাগ্রত প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যেন মনে হয়, যুগ-যুগান্তের তপস্যার পর এইমাত্র যেন চক্ষু খুলিয়া, নিজেকে নানা আভরণে বিকশিত করিয়া প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনের জন্য সকলকে আহ্বান জানাইতেছে। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম শৃঙ্খল যতই বৃদ্ধি পায়, হৃদয়ে-হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্তক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি ততই নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সুসঙ্গ-দুর্গাপুর সেই মিলনের স্থান—সেই খেলার গৃহ, মানব-হৃদয়ে ধ্রুব অসীমের প্রকাশ। প্রকৃতির গুণে এখানকার অধিবাসীরাও অতিথিবৎসল এবং রাজন্যবর্গরাও দয়াবান, হৃদয়বান, সাহিত্যানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী। সুসঙ্গের ভূম্যধিকারিগণের প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন ঃ—

"বড় মানুষের এমন বিনয়-নম্রতা, এমন সরল শিষ্টাচার, অভ্যাগতের প্রতি এমন আদর-অভ্যর্থনা বড় শোভনীয় ও লোভনীয়। ৩৩।৩৪ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালার রাজা জমিদারবংশ প্রায় সকলেই সূর্যবংশীয় ছিলেন, বিনয়-নম্রতায় তাঁহাদের সম্মান 'দহ'[৯২] পড়িত। কিন্তু সুসঙ্গের মহারাজারা তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে বিষয়-সম্পত্তির সহিত সৌজন্য ও সহৃদয়তা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়া আসিতেছেন।"

---

৯২. দহ—গহ্বর, নদ্যাদির অতলস্পর্শস্থান, সুগভীর জলাশয়, ঘূর্ণাবর্ত, জলের পাক, মহাবিপদ, অতি সংকট। দেশজ।

কবি গোবিন্দদাস সুসঙ্গে আসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইলেও প্রাণে শান্তি পাইতেছিলেন না। গৃহের আকর্ষণ তাঁহাকে এমন-ভাবে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল যে, 'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর' এমনিভাবে দিন কাটাইতেছিলেন। খানিকটা 'উত্তরোল', আবার খানিকটা 'উতলা' ভাব। সুসঙ্গে বসিয়া কবি তখনকার মনের অবস্থা একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন ঃ—

"এ দূর পর্বত দেশে, এ বিজন বনবাসে,
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে,
আকুল হৃদয়ে দেখি শশী অস্ত যায়।"

সূর্য উঠে, বেলা বাড়ে, আবার অস্ত যায়—এই ভাবে দিন যায় রাত্রি আসে, কিন্তু কবির বিরহের যেন শেষ নাই। প্রেম-বেদনায় কাতর কবি স্মরণ করেন ঃ—

"আজ—এই যে পর্বততলে, এই গারো দেশে,
নির্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে।
আসিয়াছি দেশ ছাড়ি তথাপি তিষ্ঠিতে নারি,
সেই মোহ, সেই মূর্চ্ছা স্বপন আবেশে।"

ফেলে-আসা দিনগুলির কথা কবির মনে বারবার জাগে। স্মৃতি কাঁদায়, অথচ উপায় নেই ; ক্ষুধার কান্না স্মৃতির কান্নাকে ম্লান করিয়া দেয়। এই অসহনীয় অবস্থা হইতে কবির যেন মুক্তি নাই, দারিদ্র্যের খাঁচায় প্রাণপাখী যেন ছটফট করিতেছে। কর্মস্থল কবির নিকট কারাগার বলিয়া মনে হইতেছে। স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-ভালবাসা দারিদ্র্যের নির্মম শাসনে ও কর্মের বন্ধনে পীড়িত। কিন্তু কবি

নির্বাসিত যক্ষের মত মহাকবি কালিদাসের[৯৩] মেঘদূত[৯৪]-এর স্মরণ না লইয়া প্রাণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় নিজের উপর নিজে অভিমান করিয়া চন্দ্রকে[৯৫] উদ্দেশ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"সুবিশাল গারো গিরি অই যে উত্তরে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভর দিয়া উঠিয়াছে দাঁড়াইয়া,
উন্নত ললাট গিয়া ঠেকিছে অম্বরে,

৯৩, মহাকবি কালিদাস—ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইহার রচিত 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটক বিশ্ববিখ্যাত। 'বিক্রমোর্বশী', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পুস্তক ইহার রচিত। ইহাকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের (২য় চন্দ্রগুপ্তের) সভার নবরত্নের অন্যতম বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। কিন্তু অনেকে আবার ইঁহাকে প্রথম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক বলেন। কিংবদন্তী আছে যে, ইনি প্রথমে অত্যন্ত নির্বোধ ছিলেন এবং পরে সরস্বতীর বরে বিদ্বান হন। আজকাল ইহাই মতবাদ যে, কালিদাস পশ্চিম মালবের বাসিন্দা ছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়াও অনেকে বিশ্বাস করেন।

৯৪. মেঘদূত—মহাকবি কালিদাস রচিত সংস্কৃত কাব্য 'মেঘদূতম্'। প্রভুর আদেশে কুবের পুরী হইতে বিতাড়িত যক্ষ রামগিরি পর্বতে আসিয়া বাস করিতেছিল। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নব মেঘোদয় দেখিয়া তাহার বিরহচিত্ত প্রিয়ার নিকট প্রেরণ করে। অলকাপুরী যাইবার পথে দূতীরূপী মেঘের চক্ষুতে যে সকল মনোহর দৃশ্য পড়িবার সম্ভাবনা, সেইগুলি এবং যক্ষের হৃদয়-বেদনা ইহাতে মনোহর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিরহাত্মক কাব্য বলিয়া পরিগণিত এবং শব্দ-সম্পদে ও ভাবগাম্ভীর্য্যে ইহা অতুলনীয়।

৯৫. চন্দ্র—পৃথিবীর উপগ্রহ। ইহার পরিধি প্রায় ৬৭৯ মাইল এবং ব্যাস প্রায় ২১৬০ মাইল। ইহা পৃথিবী হইতে প্রায় ২,৩৮,০০০ মাইল দূরে আছে। ইহা প্রাণীশূন্য, জলশূন্য, বায়ুশূন্য, শীতল, প্রস্তরময় গোলক। ইহা ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আছে।

উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে ঊর্ধ্বমুখে,
কতই সান্ত্বনা পাই প্রাণ যেন ভরে।

*   *   *   *

পর্বত পার্থিব প্রাণ দিয়া বিসর্জন,
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন।
এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তারি দেশ তারি,
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন।
নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়া বন্ধ,
রমণীর রূপ গন্ধ করে না গ্রহণ।
অই পর্ব্বতের মত, প্রেম তৃষ্ণা অবিরত
শশাংক। আমারও প্রাণে জাগিছে এখন।"

অনন্ত প্রেমের অমৃতের অধিকারী কবি গোবিন্দদাস। দারিদ্র্য তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে, কিন্তু প্রেম তাঁহাকে কবি করিয়া তুলিয়াছে। কবির এই বিরহ-জীবনে কবিতাই কবিকে সান্ত্বনা দিয়াছে, মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত শান্তি দিয়াছে। অশান্তির আগুন বুকে জ্বলিতেছে, তাঁর কাব্য-সুন্দরীর চোখের জলে তাহা প্রশমিত হইতেছে। এমনি ভাবে "মন উচাটন নিশ্বাস সঘন" অসহায় বিরহবিধুর, কবি গোবিন্দ-দাস প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোমেশ্বরী নদীর নির্জন তীরে একাকী বসিয়া জীবনের খাতাখানি খুলিয়া বসেন এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেন। কবির জীবন-সঙ্গীত যেন বিরহ-সঙ্গীত। কাব্যের সঙ্গে জীবনের এমন সম্বন্ধ বড় একটা দেখা যায় না। 'জীবনে জীবন যোগ করা হইয়াছে বলিয়াই কবি গোবিন্দদাসের গানের পসরা ব্যর্থ' হয় নাই। তিনি বলিষ্ঠ জীবনবাদের কবি-জীবনকে দেখিয়াছেন, জানিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়া কবি পঞ্চপ্রদীপের অলোয় জীবন-দেবতার আরতি করিয়াছেন, কিন্তু চোখের জলে সে প্রদীপের আলো নিভিয়া গিয়াছে। তাই সোমেশ্বরীর প্রাণমাতানো কল্লোলগানে

গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণের পিপাসা মিটে নাই। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় নিজের সারা জীবনের 'বারমাস্যার'[৯৬] কাহিনীই বর্ণনা করিয়াছে। এখানেও তার আর ব্যতিক্রম ঘটে নাই—

"এই যে পর্বতপাদ ধৌত সোমেশ্বরী,
বহিতেছে মৃদু মন্দ কল কল করি।
বসিয়া ইহার তীরে, ভাসিতেছি অশ্রুনীরে,
সেই সন্ধ্যা এই, সেই আসন্ন শর্বরী,
সরল শশাংক সেই শিশু কোলে করি।
এত কষ্টে এত ক্লেশে এ অসভ্য গারো দেশে,
দূর দেশান্তরে হায় রহিয়াছি পড়ি,

* * * *

---

৯৬. বারমাস্যা—মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে কয়েকটি বিশেষ কবি প্রথা প্রচলিত ছিল। বারমাস্যা (বার মাসিয়া) এইরূপ একটি কবি প্রথা। নানা কবির লিখিত বারমাস্যায় সেকালের বাংলা দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। বারমাসের সুখ দুঃখের কথা লইয়া রচিত কবিতার নাম— "বারমাস্যা"।

সাধারণতঃ "বারমাস্যা" বলিতে দুঃখের বর্ণনাই বোঝায়, কিন্তু সখের বারমাস্যারও সন্ধান পাওয়া যায় চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে। এই কাব্যে ফুল্লরার দুঃখের বারমাস্যা ব্যতীত খুল্লনা ও সুশীলার বারমাস্যাও অংকিত হইয়াছে। এই মঙ্গল কাব্য ব্যতীত প্রাচীন বাংলা লৌকিক কাব্যগুলিরও প্রায় অপরিহার্য অঙ্গ ছিল বার-মাস্যা। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বারমাস্যার বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা—রাধার বারমাস্যা ইত্যাদি। তবে রাধার বারমাস্যার বর্ণনা বৈশাখ মাস হইতে শুরু না হইয়া শুরু হইয়াছে আষাঢ়ে এবং চৈত্র মাসে শেষ না হইয়া শেষ হইয়াছে জ্যৈষ্ঠ মাসে—ভনই বিদ্যাপতি বারমাস। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাস্যা ফাল্গুনে আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে মাঘে—'বিরহ-সাগরে ডুবে এলোচন দাস।' মধ্য যুগের হিন্দী সাহিত্যেও বারমাস্যার বর্ণনা আছে—উহার নাম বারমাস। কবি দৌলত কাজীর সতী ময়নামতী কাব্যেও বারমাস্যার বর্ণনা আছে।

কই সে শ্যামল সন্ধ্যা বাসন্তী শর্বরী ?
সেই আমি আছি, সন্ধ্যা তেমনই আছে,
তেমনি কৌমুদিময়ী নিশি অমলিন,
তেমনি শশাংক হাসে, তারা-বেড়া নীলাকাশে,
কৌমুদি উছলে পড়ে নদীর পুলিন,
তবু নাই সে মাধুরী, চখে দেখা প্রাণ চুরি,
নয়নে রাখিয়া সেই নয়ন নলিন।
সেই একদিন আর এই একদিন !”

দিন যায়, মাস আসে, পাতা ঝরে, নতুন পাতা শোভা পায়, আর কবির স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠে—'সেই একদিন আর এই একদিনে'র দৃশ্য। ঋতুচক্রে প্রকৃতির কত পরিবর্তন হইতেছে, অথচ কবির জীবনের যেন কোন পরিবর্তন নাই। তাঁহার জীবনে যেন বসন্ত বলিয়া কিছু নাই—আছে 'জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ'। বসন্তের ফুলে ফুলে কবির জীবন ভরিয়া উঠে নাই, ভরিয়া উঠিয়াছে নিদাঘ বসন্তের বিরহ-জ্বালায়।

তখন দুর্গাপুরে জ্বরের খুব প্রভাব। কাহারও স্বাস্থ্য যেন ভাল থাকে না। আর প্রবাসী গোবিন্দদাসের ত কথাই নাই। তিনি যাবেন বঙ্গে, কপাল যাবে সঙ্গে। তাই প্রাণের অশান্তি দেহের অপরূপে দেখা দিল এবং সর্বাঙ্গে অশান্তির চিহ্নস্বরূপ দেখা দিল কতকগুলি স্ফোটক। ভগ্নস্বাস্থ্য এবং ভগ্নমন লইয়া কবি জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার কেবলই মনে হইত—প্রথম প্রবাস-জীবন যেন শেষ জীবন, ইহজীবনে আর যেন কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইবে না। পত্নীর প্রেম আর শিশুর বাৎসল্য যেন কবিকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। অসমাপ্ত পরিচয় আর অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি রাখিয়াই যেন তাঁহাকে ইহ জগৎ হইতে বিদায় লইতে হইবে। অথচ সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের রমণীয়

প্রাকৃতিক দৃশ্য গোবিন্দচন্দ্রের কবি-হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন—"সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। নদী ও পর্বতে, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রকৃতি কি পরম রমণীয় শোভাই ঢালিয়া দেয়, তাহা বর্ণনাতীত। নদী বহিয়া, পর্বত ভাসাইয়া, আকাশ-পাতাল ডুবাইয়া যেন সে শোভার বন্যা ছুটিয়া চলে। আমি সেই রুগ্ণ দেহেও অনেক সময় তাহাতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতাম। সেই অনাদি অনন্তের আদ্যন্ত অন্বেষণে, কি এক বিপুল বিশাল উদাস আত্মহারা আনন্দে, আমি স্তম্ভিত বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতাম! আমার ক্ষুদ্র প্রাণে, সে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ডোবা ভাবের স্থান কুলাইত না।"

—এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-বর্ণনায় কবি যেন রূপমুগ্ধ শিল্পীর ন্যায় তন্ময় হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাছে 'ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান'-এর যেন মূল্য নাই। তাঁহার কাছে একমাত্র মূল্য নৈসর্গিক শোভা ও সৌন্দর্য। আর এই সৌন্দর্যই কবিকে বহু কবিতা-রচনায় অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাহার মধ্যে কতকগুলি লুপ্ত, কতকগুলি অপ্রকাশিত এবং কতগুলি রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা"য় প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে "গুরু গোবিন্দ সিংহ" উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার নিদর্শন। সাহিত্য-সাধনায় কবি কতখানি একনিষ্ঠ ও ভাবনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা এক সময়ে রচিত কবিতাগুলি পড়িলেই বেশ বুঝা যায়। মানসিক অস্থিরতা, হৃদয়-দৌর্বল্য ও স্ত্রীবিয়োগ কবিকে বিচলিত করিলেও সাহিত্য-রচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে নাই।' 'কবিরে পাবে না কবির জীবন-চরিতে'—এই কথা কবি গোবিন্দদাসের ক্ষেত্রে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মেঘে-ঢাকা সূর্য যেমন সূর্যই, তেমনি দারিদ্র্যের জালে আবদ্ধ কবি কবিই। মেঘের ফাঁকে সূর্য যেমন উঁকি মারে এবং মাঝে মাঝে মেঘ-মুক্ত হইয়া নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তেমনি দুঃখ-কষ্টের মাঝে মাঝে কবি তাঁহার কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ ঘটান এবং সৃষ্টির আনন্দে দুঃখ-

কষ্টের বেদনাকে ভুলিয়া যান। তাই কর্মজীবনে কবি গোবিন্দ-দাসের বিভিন্ন স্থানের অবস্থান যত সাময়িক হোক-না-কেন, তার সার্থকতা নিহিত আছে সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে।

কিন্তু সুসঙ্গ-দুর্গাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলা-নিকেতনেও স্ত্রী-বিরহে বিধুর কবি নিদারুণ অশান্তিতে দিন কাটাইতেছিলেন। তদুপরি সাংঘাতিক জ্বরে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় মনের ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। এই অবস্থায় কবি তাঁহার তৎকালীন মনোভাব একটি কবিতায় এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

> "এই সেই শীতকাল, কে জানে কোথায়,
> ভগ্ন আশা ভগ্ন প্রাণে, চলিয়াছি কোন্‌খানে,
> কে জানে লিখেছে ভাগ্যে কিবা বিধাতায়।
> আমিই জানি না আমি চলেছি কোথায়।···
> ঘুরি এ প্রবাসী বেশে, বৎসরেক দেশে দেশে,
> দেখি না সে মানময়ী সোনার নলিন।
> আধ হাসা আধ কাঁদা, মন খোলা মুখ বাঁধা,
> কাঁদিতে হাসিয়াছিল ভুলিয়া সে দিন।
> সেই একদিন আর এই একদিন।" (প্রেম ও ফুল)

যে রূপ-রসের আধার, সেই রূপটি 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হইয়া উঠে না, তাহার মূলে এই বিশেষের মৃত্তিকার বন্ধন থাকে, তাহা না হইলে কোন সাহিত্যই 'সাহিত্য' হইত না। দেহের ও মনের নিবিড় সংযোগেই সৃষ্টি হয় সাহিত্য-কাব্য-নাটক। দেহ যখন দুর্বল এবং মন যখন 'উচাটন', তখন স্থান-পরিবর্তনই শ্রেয়ঃ। তাই দেখা যায়, মহারাজা চিকিৎসার সব রকম ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও কবি সুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িলেন। কবির ভাষায় বলা যায়—"কিছুতেই আর সেখানে থাকিতে ইচ্ছা হইল না। মনে হইতে লাগিল, আর কিছুদিন এখানে থাকিলে মারা যাইব।"

ইতিমধ্যে কবি ময়মনসিংহের উকিল শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট নিজের অবস্থার কথা জানাইলে, বিশ্বাস মহাশয় যত শীঘ্র সম্ভব সুসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার পরামর্শ দিলেন। কবি সেই পরামর্শ-মত মহারাজার নিকট ভগ্ন-স্বাস্থ্যের কথা নিবেদন করিয়া এবং অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া চাকরি ছাড়িয়া ১২৮৭ সালের আষাঢ় মাসে ময়মনসিংহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবির প্রবাসে কর্ম-জীবনের প্রথম অধ্যায়ের এইভাবে পরিসমাপ্তি ঘটিল। স্থান-পরিবর্তন হওয়ায় ভগ্নস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিল। অল্পকালের মধ্যেই কবি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

এইবার শুরু হইল নূতন কর্মসংস্থানের সন্ধান। কারণ কর্মহীন জীবন মূল্যহীন এবং মৃত্যুতুল্য। এই অবস্থা-নিরসনের জন্য পরোপকারী ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয় কবিকে মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে কবির পরিচয় করাইয়া দিলেন। কর্মসন্ধানে আসিয়া কবি এক মহতের সন্ধান পাইলেন। প্রথম দর্শনেই কবিকে কেশবচন্দ্র মহারাজার[৯৭] বড় ভাল লাগিয়াছিল।

৯৭. কেশবচন্দ্র আচার্যচৌধুরী মুক্তাগাছার জমিদার কেশবচন্দ্র আচার্য-চৌধুরী শিক্ষা-দীক্ষায়-আচার-আচরণে-সেবায়-দানে-হৃদয়বত্তায় ও উদারতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের নিকট "কেশব মহারাজ" বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী এবং প্রতিভাবান জমিদার আর কেহই ছিলেন না। তাঁহার অধ্যবসায় ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য সকলকেই মুগ্ধ করিত। বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ না করিয়াও তিনি ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ঐকান্তিক চেষ্টায় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করিয়া ময়মনসিংহে ওকালতি করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চেষ্টায়, যত্নে, আগ্রহে ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে তিনি ময়মনসিংহের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রত্যেক সভাসমিতি এবং দেশহিতকর কার্যে যোগ দিতেন। তিনি ময়মনসিংহের জমিদারবর্গেরও নেতা ছিলেন। প্রতিদিন

তদুপরি বিশ্বাস মহাশয়ের দক্ষ কবি-পরিচিতির গুণে এবং কবির কবিতাবলী-পাঠে ও তৎকালীন নিরন্ন অবস্থার কথায় যুগপৎ অভিভূত ও বিগলিত হইয়া কবিকে একটি চাকরি দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অল্পকালের মধ্যেই কবিকে জমিদার কেশবচন্দ্রের নিকট পাঠাইবার জন্য বিশ্বাস মহশয়ের নিকট পত্র আসিল। পত্রানুযায়ী কবি দেখা করিলে কেশবচন্দ্র মহারাজ কবিকে সেইদিনই সন্ধ্যায় ভৈরব-বাজারে[৯৮] যাওয়ার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মপুত্রের[৯৯] ঘাটে মিলিত হইতে বলিলেন। ঘাটে বজরা বাঁধা ছিল। কথামত কবি সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহারাজের সঙ্গে মিলিত হইয়া নদীপথে ভৈরববাজার যাত্রা করিলেন।

কবি গোবিন্দদাস—চারিদিকের জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলেন। আর জমিদার 'কেশব মহারাজ' তাঁহার প্রধান কর্মচারী ভৈরবচন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে দাবা খেলিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যায় তাঁহার রাজভবনে গুণী-জ্ঞানীর সমাবেশ ঘটিত। অতিথি-আপ্যায়নে তাঁহার মত মহানুভবতা আর কেহ দেখাইতে না পারায় ময়মনসিংহে কোন প্রসিদ্ধ লোকের আগমন ঘটিলে মহারাজার উপস্থিতি কল্পতরুর মত মনে হইত।

৯৮. ভৈরববাজার—ইহা একটি জংশন—ভৈরববাজার জংশন। ময়মন-সিংহ জংশন হইতে ৮৩ মাইল দূর। ইহা মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত ও ময়মনসিংহ জেলার একটি বিখ্যাত বন্দর। এখানে বহু মহাজনের গদি, আড়ত ও ব্যাঙ্ক আছে। এখান হইতে একটি শাখা লাইন ৪১ মাইল দূরবর্তী ঢাকা শহরের নিকটস্থ পূর্ববঙ্গ রেলপথের টঙ্গী স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে। এই শাখার জিনারদি ষ্টেশন বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত।

৯৯. ব্রহ্মপুত্র—ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। ইহার দৈর্ঘ্য ১,৮০০ মাইল। মারিয়াম লা নামক হিমালয়ের একটি শিখর হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। অতঃপর হিমালয়ের উত্তর দিক দিয়া তিব্বত হইয়া ইহা আসামের সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িয়াছে। এই নদীর গতি বঙ্গদেশে বাঁকিয়া গিয়াছে। অতঃপর গোয়ালন্দে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া ইহা বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ১৩,৮০০ ফুট পর্যন্ত ইহা নৌবাহনযোগ্য।

যাঁহার যেমন ভাব—একজন প্রকৃত প্রেমিক, অপরজন রঙ্গরসে রসিক। একজন দীনদুঃখী হইয়াও প্রকৃতির রাজ্যে 'রাজা', অপরজন দয়া-দাক্ষিণ্যে, আতিথেয়তায়, পৃষ্টপোষকতায় সমাজের 'রাজা'। প্রকৃতি-সৌন্দর্যের ডালি সাজাইয়া রূপে-রসে-গন্ধে মানুষকে আকৃষ্ট করে, পাগল-পারা ও ঘরছাড়া করে। আর জমিদার নিজের এলাকায় পূজা পাইয়া 'মো-সাহেবি' করেন। তাই দাবা-খেলার রঙ্গরসের মাঝখানে মো-সাহেবি চালে গোবিন্দদাসকে ভাওয়াল-সংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। বৈষয়িক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির জন্য যে একটা উপযুক্ত পরিবেশ ও সময়ের প্রয়োজন, খেলাচ্ছলে কেশবচন্দ্র মহারাজ তাহাও ভুলিয়া গিয়াছেন। চালটা জমিদারী ঢঙে এবং ভাবটা সর্বজ্ঞের।

যাত্রার প্রথম দিনের নৈশবিহার নদীবক্ষে অতিবাহিত হইল ; পরের দিন তাঁহারা 'বাজিতপুর' অতিক্রম করিয়া 'বড়হাত্তর' নামক এক প্রকাণ্ড 'বিলে' আসিয়া পড়িলেন। সেই বিলের সৌন্দর্য মনোহারী—দিনের সূর্যের দীপ্তিতে যেমন উদ্ভাসিত, ঢেউ খেলাইয়া আনন্দিত এবং অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় রঞ্জিত, ঠিক তেমনি রাত্রিতে চাঁদের আলোয় ও রূপের গরবে যেন ঢলমল। কখনও কখনও ধ্যানগম্ভীর সন্ন্যাসীর মত দীপ্ত অথচ শান্ত, মহাভোগী অথচ মহাযোগী। আবার রাত্রির অন্ধকারে শ্মশানের স্তব্ধতা নামিয়া আসিলেও শ্যামা মায়ের জ্যোতির ছটার মতো একটা সহজ-সুন্দর স্নিগ্ধ-রমণীয় রূপ ফুটিয়া উঠে। বিশেষ করিয়া বর্ষায় বিলের সৌন্দর্য ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। দুই কূল প্লাবিত করিয়া তাহার সৌন্দর্যরাশি রূপের হাট বসাইয়া দেয়। ঘাসে-ঝোপে-কাশবনে-ফুলবনে-লতাগুল্মে পরিবেষ্টিত বিলের পাড়ে কত অজানা রহস্য লুক্কায়িত আছে কে জানে? এই অজানাকে জানা এবং অপরিচিতকে পরিচিত করিয়া তোলাই সাহিত্যিকের কাজ।

'পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন, কবি গোবিন্দদাসের সেই প্রতিভা ছিল। তাই যাত্রাপথে বিলের ও দুই পার্শ্বের অসীম সৌন্দর্যে ডুবিয়া কবি যে "বরষার বিল"[১০০] রচনা করিলেন, বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা একটি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি-বিষয়ক কাব্য।

যাহা হউক, কবি গোবিন্দদাস জমিদার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ভৈরববাজারে উপস্থিত হইলেন। প্রায় তিন মাস সেখানে অবস্থান করিবার পর, আশ্বিন মাসে পুজোর কিছুদিন পুর্বে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী কেশবচন্দ্র আচার্য চৌধুরীর সেরেস্তায় ১২৮৭ সনের আশ্বিন মাস হইতে ১২৮৯ সনের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কাজ করেন।

জমিদার কেশবচন্দ্র ময়মনসিংহের একজন ভূম্যধিকারিণী রামসুন্দরী দেবীর জমিদারী "ইজারা পত্তন" লইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তনের পর ১২৮৭ সনের ১লা আশ্বিন কবি গোবিন্দদাস এই জমিদারীর কার্যকারকরূপে নিযুক্ত হন। তিনি "জমা সেরেস্তায়" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় এক বৎসর পর অর্থাৎ ১২৮৮ সনের শ্রাবণ মাসে কবির পদোন্নতি হয় এবং তিনি "মুন্সী" পদে উন্নীত হন। প্রায় তিন বৎসর তিনি ময়মনসিংহে থাকিয়া জমিদার কেশবচন্দ্রের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি যে সব কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রায় লুপ্ত এবং 'লুপ্তপ্রায় বীণা' নামে "নানা বিষয়িনী কবিতা প্রসবিনী" নামক মাসিক পত্রিকায় আবদ্ধ যেন পাষাণী অহল্যা।[১০১]

---

১০০. বরষার বিল—'বরষার বিল' কবিতাটি "প্রেম ও ফুল" গীতিকাব্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এখানে কবির অপূর্ব বর্ণনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কবির ভাষায় বলা যায়—"বিলের দৃশ্য অবলম্বনে কবিতা রচনা করিতে তাঁহাকে জমিদার কেশবচন্দ্র অনুরোধ করিয়াছিলেন"।

১০১. অহল্যা—মহর্ষি গৌতমের পত্নী ও বৃদ্ধাশ্বের কন্যা। রাজর্ষি জনকের পুরোহিত শতানন্দ ইহার গর্ভজাত। একদা গৌতম স্নানার্থ নদীতে গমন

মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনিতেছেন। আর একজন প্রহর গুনিতেছেন, তিনি হইতেছেন—কবি-প্রিয়া সারদাসুন্দরী।

জমিদার কেশবচন্দ্র মহারাজ অত্যন্ত শিকারপ্রিয় ছিলেন এবং নিজে একজন ভাল শিকারী ছিলেন। তাঁহার বাল্যকালে আসাম[১০২] প্রদেশে হাতীর মেলা ছিল। মহারাজ হাতী, বাঘ, বন্য মহিষ, হরিণ এবং কোড়া প্রভৃতি জলচর পক্ষী শিকার করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ১২৮৭ এবং ১২৮৮ সনে জমিদার কেশবচন্দ্র অন্যান্য বৎসরের মত ময়মনসিংহ নগর হইতে প্রায় ৩২ মাইল দূরে পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত গভীর জঙ্গলে[১০৩] শিকারে যান, সঙ্গে যান কবি গোবিন্দদাস। ১২৮৮ সনে জমিদার কেশবচন্দ্রের চেষ্টায় কবি

করিলে ইন্দ্র গৌতমের বেশে অহল্যার নিকট গমনপূর্বক আপনার কামবাসনা চরিতার্থ করেন। গৌতম প্রত্যাগত হইয়া স্বসদৃশ ইন্দ্রকে দেখিলেন এবং সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে সহস্র ভগাঙ্গ ও অহল্যাকে বায়ুভোজিনী পাষাণমূর্তি হইবার অভিশাপ দিলেন। রামচন্দ্র যখন বিশ্বামিত্র সহ মিথিলায় গমন করেন, তখন তাঁহার পাদস্পর্শে ইঁহার শাপমুক্তি হয়।

১০২. আসাম—ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত প্রদেশ। ইহার রাজধানী গৌহাটি। ইহার আয়তন প্রায় ৬১৬০০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্য প্রায় ৭,৬০০,০০০। বাঙ্গালা ও আসামী—এই দুইটি ভাষা এদেশে প্রচলিত। পূর্বে "আহম" নামক জাতির বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'আসাম'। আসামের অন্য বিখ্যাত স্থান কামরূপ, কামরূপের প্রাচীন নাম ছিল 'প্রাগ্‌জোতিষ-পুর'। মহাভারতেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কমলালেবু, চা, এবং শাল, সেগুন, প্রভৃতি কাষ্ঠ এখানকার বাণিজ্য-দ্রব্য। আসামের বন হইতে বনহস্তী ধরা হয়।

১০৩. মহারাজা সূর্যকান্তের জমিদারীর অন্তর্গত সোনাখালি মল্লিকবাড়ি পাহাড় নামক একটি স্থান আছে। তাহা গভীর অরণ্যময় এবং নানাজাতীয় বন্যজন্তুসমাকীর্ণ। ইহা ময়মনসিংহ জেলার উল্লেখযোগ্য অরণ্য। এখানে সিংহ, বাঘ, হাতী, হরিণ ও বন্য মহিষের সংখ্যাই বেশী। জমিদার কেশবচন্দ্রের মাংস্যাসক্তির মূলে আছে এই সব শিকার।

গোবিন্দদাস বন্দুকের গুলিতে একটি হরিণশিশুকে বধ করেন। ইহাতে ক্রন্দনরতা মাতার বিলাপের দৃশ্য দেখিয়া কবি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন এবং জীবনে মাংস গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। শুধু তাহাই নহে, বঞ্চিত বুকের মর্মভেদী বেদনার আত্ম-প্রকাশ ঘটে "শিকার" নামধেয় একটি কবিতায়। ১২৯৪ সনের "নবজীবন" পত্রিকায় তাহা মুদ্রিত হয়। শিকারে সংশ্লিষ্ট থাকিবার ফলে এবং নিজ হস্তে হরিণশিশুকে বধ করিবার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাটি রচিত হইলেও ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল—দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। কবির 'কাব্যালোচনা' অধ্যায়ে আমরা ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিব। এই সময় অর্থাৎ ১২৮৮ সনে কবি "মণিকুন্তলা" শীর্ষক আর একটি কবিতা রচনা করেন। ফেলে-আসা দুই বৎসরের শিশুকন্যা মণিকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"হৃদয়ের মণি তোরে, আসিয়াছি চলিয়া,
কি করিয়া ফুল শিশু আছি তোরে ভুলিয়া।"

এই মর্মস্পর্শী কথাগুলির মধ্যে কবির প্রবাস-জীবনের মানসিক অবস্থা অনুভব করা যায়। আবার—

"তুই বিনে কেহ নাই,—অনাথিনী সরলা।
পামর পাষণ্ড অতি
ছাড়িয়া গিয়াছে পতি,
দিবানিশি বিষাদিনী অশ্রুমুখী অবলা
মা বলে ডাকিস্ আহা বাঁচাইতে সরলা।"

কবির পত্নী-প্রীতি ও সন্তান-বাৎসল্য কি অপরিমেয়, তাহা উপরি-লিখিত কবিতাংশটি পড়িলে সহজেই বোঝা যায়। একদিকে চাকরি, অপর দিকে সুখস্মৃতি—এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া কবির প্রাণ-পাখী ছট্‌ফট্ করিতেছে। এই অবস্থায় কেহই সুস্থভাবে কাজ করিতে পারে না,

কবিও পারেন নাই। এই সম্পর্কে কেশবচন্দ্রের পরবর্তী কালে জমিদারীর প্রধান কার্যকারক শ্রীযুক্ত উমাচরণ সরকার মহাশয় ১৩২৫ সালে ৭ই চৈত্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—

"কবির অন্য কোন বিবরণ আমার জানা নেই। লোকটি অতি চাপা স্বভাবের ছিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিচয় অনেক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই, কেবল চাপা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবনের উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা জানি না। কোন স্থলেও প্রশংসার সহিত কার্য করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। তিনি নিতান্ত উন্মনস্ক ও উড়া-উড়া ভাবের লোক ছিলেন। কেশববাবুর মত দয়ালু লোকের নিকট তিনটি বৎসর কার্য করিতে পারেন নাই।" মন্তব্যটি আংশিক সত্য বলিয়া মনে হয়।

কবি গোবিন্দদাস একদিকে যেমন জেদী ও নির্ভীক ছিলেন, অপরদিকে তেমনি একরোখা ও অপরিণামদর্শী ছিলেন। মর্যাদা ও আত্মসম্মান-জ্ঞান এত বেশী ছিল যে, তাহা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইলে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানাইয়া লইবার মত ক্ষমতা, ধৈর্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও অধ্যবসায় তাঁহার ছিল না। পত্নীপ্রেম, সাংসারিক শান্তি-স্থিতি, বাৎসল্য—ভালবাসার মূলে যে ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের মূল্য অনেক বেশী—তাহা তিনি জানিয়াও জানিতেন না, মানিয়াও মানিতেন না, চেষ্টা করিয়াও কার্যে রূপ দিতে পারেন নাই। মোসাহেবী ভাব তাঁহার ভাল লাগিত না। তাই তাঁহার অভাব কোনদিন দূর হয় নাই। ফলে দেখা গেল, ১২৮৯ সনের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত তিনি জমিদার কেশব-চন্দ্রের চাকরি করেন এবং ভাদ্র মাসে ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমি জয়দেবপুরে চলিয়া আসেন। এই সময়ের মানসিক অবস্থার

প্রতিফলন ঘটে 'বিদায়' শীর্ষক একটি কবিতায়।[১০৪] কবিতাটির আরম্ভ এইভাবে—

"চলিলাম প্রাণময়ি। চলিলাম আজি,
এই ভাসাইনু তরী জানি না বাঁচি কি মরি,
জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায়।" ইত্যাদি

কবিতাটি কি উদ্দেশ্যে ও কি উপলক্ষ্যে লিখিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক বোঝা যায় না। কারণ কবি জন্মভূমির দিকে যাইতেছিলেন। অতএব 'বিদায়'-টা কে কাহার নিকট হইতে লইতেছে? ময়মনসিংহ হইতে 'বিদায' হইতে পারে। কিন্তু—

"চলিলাম প্রাণময়ি! ছাড়িয়া তোমায়,
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরণীখানি দ্রুত ভেসে যায়।"

—ইহার অর্থ কি? কবি তো প্রাণময়ী প্রিয়ার কাছেই যাইতেছেন, তবে আবার বিদায কিসের? আমাদের মনে হয়, ময়মনসিংহের প্রাকৃতিক দৃশ্যে কবি এত বেশী অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রকৃতি-প্রিয়া মানস-প্রিয়ারূপে দেখা দিয়াছিল। তাই ময়মনসিংহ

১০৪. 'বিদায়' শীর্ষক কবিতাটি "কস্তুরী" কাব্যে ১২৮৯ সনে ৮ই ভাদ্র প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থান—ব্রহ্মপুত্রনদ। অর্থাৎ কবিতা-রচনার স্থান ও কাল লক্ষ্য করিলে সহজেই বোঝা যায় যে, ময়মনসিংহ পরিত্যাগের পর ব্রহ্মপুত্রের নদীবক্ষে কবিতাটি রচিত হইয়াছিল। কবিতাটির একটি স্থানে আছে—

"এই বিদায়ের কালে, চারু চন্দ্রাননে,
ভরিল না চিত্ত তার একটি চুম্বনে।"

—'একটি চুম্বনে' চিত্ত ভরিল না, অথচ 'বিদায়কালে' মনে পড়ে একটি 'চারু-চন্দ্রাননে'র কথা। কবি ইহার দ্বারা কি বুঝাইতে চাহিতেছেন, তাহা নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। কবিও কিছু বলেন নাই।

হইতে বিদায়-গ্রহণ যেন—প্রকৃতি-প্রিয়া হইতে মানস-প্রিয়ার নিকট অর্থাৎ জয়দেবপুরে গমন।

কিন্তু কবি গোবিন্দদাস জয়দেবপুরে আসিয়াও বেশীদিন থাকেন নাই। সেই সময় দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মোকদ্দমার জন্য কলিকাতায় ছিলেন। কবি এই সুযোগে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত কলিকাতা-দর্শনের উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে "সুরমা" নামে একখানি জাহাজে গোয়ালন্দে পাড়ি দিলেন। যাত্রাপথে আর একখানি জাহাজের সঙ্গে "সুরমা"-র সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুইখানি জাহাজই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং কবির জাহাজখানি ডুবিবার উপক্রম হইলে বহু চেষ্টা করিয়া তাহাকে তীরসংলগ্ন করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে ঘটনাস্থলে নদী খুব বেশী গভীর ছিল না এবং কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় জাহাজখানি গোয়ালন্দে[১০৫] উপস্থিত হয়।

যথাসময়ে গোয়ালন্দ হইতে রেলগাড়ী-যোগে কবি গোবিন্দদাস কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং নিমতলায় রমানাথ লাহার স্ট্রীটে দেবেন্দ্রকিশোরের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেখানে প্রায় চারমাস থাকিয়া কলিকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখিয়া ১২৮৯ সনের মাঘ মাসে কবি দেবেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সদ্য-প্রতিষ্ঠিত নূতন একটি প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই স্কুলও বেশী দিন বাঁচে নাই। কারণ ময়মনসিংহে পূর্বের প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুল-এর সহিত প্রতিযোগিতায় ইহা টিকিতে পারিল না। অবশেষে উভয় স্কুল মিলিত হইয়া একটি 'সিটি স্কুল'ই বর্তমান রহিল এবং নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বিলুপ্ত হওয়ায় অন্যান্য শিক্ষকগণের সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসেরও চাকরি যায়।

---

১০৫. গোয়ালন্দ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত একটি রেল ও স্টিমার স্টেশন। ইহা পদ্মার তীরে অবস্থিত।

ইহার পর কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহের "সাহিত্য-সমিতি"র অধ্যক্ষপদে কিছুকাল নিযুক্ত থাকেন। এই সময় কবি, দেবেন্দ্র-কিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের ভবন "দেবনিবাসে" বাস করিতেন। 'সাহিত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ[১০৬] মহাশয়-ও তখন ময়মনসিংহে ছিলেন! "সৌরভ" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার[১০৭] মহাশয়ের আশীর্বাদেও পুষ্ট হইয়াছিলেন কবি গোবিন্দদাস। 'খোকার দপ্তর' প্রণেতা শ্রীমনোমোহন সেনও কবির প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এই সব লোকের সংস্পর্শে আসায় এবং সারস্বত পরিমণ্ডলে জড়িত

---

১০৬. যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—জন্মস্থান নদীয়া জেলার স্বুবর্ণপুর গ্রাম। ইনি এম. এ. পাশ করিয়া প্রথমে ক্যাথিড্রাল মিশনারী কলেজের অধ্যাপক এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন। ইনি 'আর্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ইহার প্রণীত—'ম্যাটসিনির জীবন-বৃত্তান্ত', 'গ্যারিবল্ডির জীবন-বৃত্তান্ত' 'জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্তান্ত', 'কীর্তি-মন্দির', 'আইন-সংগ্রহ', 'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন-বৃত্তান্ত', 'সমালোচনা-মালা', 'আত্মোৎসর্গ', 'প্রাণোচ্ছ্বাস' ইত্যাদি। ইনি বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইনি লোকান্তরিত হন।

১০৭. শ্রীকেদারনাথ মজুমদার—১২৭৭ বঙ্গাব্দে কিশোরগঞ্জে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি 'আরতি' নামক মাসিক পত্রের পরিচালক ছিলেন। 'ময়মনসিংহের ইতিহাস', 'চিত্র', 'সারস্বত কুঞ্জ' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রণীত। তিনি ময়মনসিংহে একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি একজন দেশভক্ত কর্মী এবং নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সেবী ছিলেন। তিনি নানা দেশহিতকর কার্যেরও অনুষ্ঠাতা ও নেতা ছিলেন। তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য এবং সহৃদয়তা বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষক। কবি গোবিন্দচন্দ্রকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। এক সময় তিনি কবি গোবিন্দদাসকে নানারূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি "স্মৃতির আরতি" নামক প্রবন্ধ রচনা করিয়া গোবিন্দদাসের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছিলেন।

থাকায় কবি গোবিন্দদাস আপন প্রতিভা স্ফুরণে যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি একসময় এতদূর জনপ্রিয় হইয়াছিলেন যে, সেখানে তিনি "সারস্বত কবি" বলিয়া অভিহিত হইতেন। লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য-মন্দিরে কবি প্রবেশ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু সরস্বতীর সৌন্দর্য-মন্দিরে কবির সহজাত প্রবেশাধিকার ছিল। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তাঁহার শিক্ষার পরিপূর্ণতা এবং কর্মজীবনের দক্ষতা ও প্রসারতা ঘটে নাই বটে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তিকে এতটুকু ম্লান করিতে পারে নাই।

মূলতঃ কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহে নব-প্রতিষ্ঠিত এনট্রান্স স্কুলে পণ্ডিতি ও পরে ময়মনসিংহে 'সাহিত্য সমিতি'র অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন—১২৮৯ সন হইতে ১২৯০ সন পর্যন্ত। এই ১২৯০ সনেই কবি গোবিন্দদাস ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন মুক্তাগাছার অন্যতম ভূম্যধিকারী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর (যাঁহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে) কথায় একটি "সোডাওয়াটারের" জন্য ভাল 'কল' কিনিতে। কবি 'কল' পছন্দ করিয়া টাকা পাঠাইতে লিখিলেন, কিন্তু দেবেন্দ্রকিশোর টাকাও পাঠাইলেন না এবং কবিকে ফিরিয়া যাইতেও লিখিলেন না; অথচ মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে কলিকাতায় কবি, দেবেন্দ্র কিশোরের পরিচিত কৃষ্ণকিশোর কর নামক জনৈক মহাজনের বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ এবং কবিতা রচনা করিয়া দিন কাটাইতেছিলেন। এই মহাজনের বাসায় 'সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য' একখানি চিত্র দেখিয়া কবির মনে যে ভাব জাগে, তাহারই রূপ আমরা দেখিতে পাই—"সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য" শীর্ষক কবিতায়[১০৮]। কবিতাটি "নব্যভারত" পত্রিকার সম্পাদক

১০৮. কলিকাতায় আসিলে গোবিন্দচন্দ্র "নব্যভারত" সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয় সাদরে গ্রহণ করেন এবং ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে "নব্যভারত" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। শুধু তাহাই নয়, এই সূত্রেই চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কবি গোবিন্দদাসের সাক্ষাৎ ঘটে। সাক্ষাতের সময় চৌধুরী মহাশয়ের "আনন্দ আশ্রমে" কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদার[১০৯] এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে পূর্বরাগ এবং পরে অনুরাগে পরিণত হইয়াছিল। ফলে চৌধুরী মহাশয়ের[১১০] পরিবারের সঙ্গে

রায় চৌধুরীর 'আনন্দ আশ্রমে' অবস্থান করিতেন। ১২৯০ সালে তিনি "সতীদেহ স্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য" কবিতাটি 'নব্য ভারতে' প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দেন, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধূরী করিতাটি পড়িয়া মুগ্ধ হন এবং যথাসময়েই অর্থাৎ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উহা "নব্য ভারতে" প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবী-প্রসন্নের সহিত গোবিন্দচন্দ্রের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা জন্মে। এই উপেক্ষিত কবির প্রতিভা-বিকাশে দেবী-প্রসন্নের আনুকূল্য যে কত দূর কার্যকর হইয়াছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

১০৯. বিজয়চন্দ্র মজুমদার—জন্ম ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় খানাকুল গ্রামে। ইনি তামিল, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষা জানেন। ইনি সুকবি, ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও নৃতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। ইঁহার প্রতিভা বহুমুখী ছিল। ইনি বহুকাল সম্বলপুরে ছিলেন ও একবার চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন। শেষে ইনি অন্ধ হন। 'যজ্ঞ ও তপস্যার ফল', 'গীতগোবিন্দ', 'থেরীগাথা' প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচিত। ইনি ব্রহ্মধর্মাবলম্বী। প্রথম জীবনে ইনি ওকালতি ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু অন্ধ হইয়া পড়ায় ওকালতি ব্যবসা ছাড়িয়া দেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

১১০. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—(১২৬০-১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। ফরিদপুরের অন্তর্গত উলপুর গ্রামে ইহার জন্ম হয়। স্বর্গীয় রামচন্দ্র রায়চৌধুরী ইঁহার পিতা। ইনি সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি 'ভারত-সুহৃদ্' নামে একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং কিছুকাল "নব্যভারত"-নামক মাসিক পত্রিকার

কবির এমন এক আত্মীয়তার সৃষ্টি হয়, যাহা বড় একটা চোখে পড়ে না। পরবর্তী কালে কবি গোবিন্দদাসের লিখিত বেশ কয়েকখানি গীতিকাব্য "নব্যভারত" প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার মূলে ছিল দেবীপ্রসন্নের অর্থানুকূল্য, সৎ পরামর্শ এবং ঐকান্তিক আগ্রহ। "আনন্দ আশ্রম" কবি গোবিন্দদাসের নিকট চিরকালের আনন্দের আশ্রমই ছিল। নির্বাসনকালেও তিনি এইখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও কবি গোবিন্দদাস দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর[১১১] আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন।

কবি গোবিন্দদাস স্বভাবে ছিলেন চিরবিদ্রোহী এবং চির-কৃতজ্ঞ। "নব্যভারত" সম্পাদকের প্রতিও তাঁহার কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। উপকারীর উপকারের কথায় তিনি যতখানি সরব ছিলেন, তাহার

সম্পাদক ছিলেন। ইতি বহু জনহিতকর কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

১১১. দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী একজন উদারচেতা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার হৃদয় নির্মল, শুভ্র ও সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ছিল। স্নেহ-মায়া-মমতা-দয়া-করুণা-ভালোবাসার মূর্ত বিগ্রহস্বরূপ ছিলেন। পতিতকে উদ্ধার, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতে ইনি কুণ্ঠিত হইতেন না। শিক্ষায় ও জ্ঞানে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান অপরিসীম, কিন্তু তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্তি "নব্যভারত"। "নব্যভারত"-ই তাঁহার জীবনে একমাত্র স্বপ্ন ও সাধনা ছিল। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিদায় গ্রহণ করে, কালীপ্রসন্ন বাবুর "বান্ধব"ও সম্পাদকের জীবৎকালেই বিলুপ্ত হয়। 'নবজীবন', 'সাধনা', 'প্রদীপ' প্রভৃতি কত পত্রিকার জন্ম ও মৃত্যু ঘটিল। কিন্তু রায়চৌধুরী মহাশয়ের একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও সুগভীর সাধনা বলে "নব্যভারত" বাঁচিয়া ছিল। অনেক গ্রাহকেরা তাঁহাকে বঞ্চিত করিলেও, তিনি কখনো তাঁহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ভঙ্গ করেন নাই, বিনীতভাবে গ্রাহকদের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনুকম্পা চাহিয়াছেন, তবুও "নব্যভারত"কে বিলুপ্ত হইতে দেন নাই।

চেয়েও বেশী নীরব ছিলেন অপকারীর অপকারের কথায়। দেবীপ্রসন্নের কথা কবি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিতেন এবং প্রসঙ্গ উঠিলে আত্মহারা হইয়া মাতিয়া উঠিতেন। "চন্দন" কাব্যখানি তিনি দেবীপ্রসন্নকে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। কাব্যের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন—

"তুমি হে শিবের মত কাল কূট কণ্ঠগত
নির্ভীক, নির্ম্মুক্ত চিত্ত মহা মৃত্যুঞ্জয়,
নিঃসহায়, নির্বাসিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত,
সকলে উদার বক্ষে দিতেছে আশ্রয়।"

—'সকলে উদার বক্ষে দিতেছে আশ্রয়'—এই গুণ ও ক্ষমতা দেবীপ্রসন্নের মত কবি গোবিন্দদাসেরও ছিল, কেবল দারিদ্র্যই তাহার সম্যক বিকাশে সুযোগ দেয় নাই। নিঃসহায়, নির্বাসিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পতিত মানুষদের প্রতি ছিল তাঁহার সীমাহীন সমর্থন ও সংগ্রাম। এইসব মানুষদের জন্য, স্বদেশের কল্যাণের জন্য তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিত। ফলে তিনি কোথাও স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেন না। এইখানেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কলিকাতায় বেশ কিছুদিন থাকিবার পর যখন তিনি দেখিলেন দেবেন্দ্রকিশোরের নিকট হইতে সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব বা সাড়া পাওয়া গেল না, তখন তিনি অগত্যা ভগ্নমনে ১২৯০ বঙ্গাব্দে পৌষমাসে কৃষ্ণকিশোর কর মহাজনের নিকট হইতে পাথেয় বাবদ কিঞ্চিৎ অর্থ ঋণ করিয়া কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহে প্রত্যাবর্তন করেন।

অব্যবস্থিতচিত্ত কবি কর্মজীবনে যাঁহার চাকরিতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (১২৯১— ১৩০১) কাটাইতে পারিয়াছিলেন, তিনি সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী। হরচন্দ্র নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্র "চারুবার্তা"র[১১২] অস্থায়ী কার্যাধ্যক্ষ-রূপে ১২৯১ সালে কবি গোবিন্দদাস নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন ১৫৲ টাকা ছিল। পরের বৎসর অর্থাৎ ১২৯২ সালে ২৯শে বৈশাখ মাসিক ২০৲ টাকা বেতনে স্থায়ীভাবে কর্মাধ্যক্ষ হন।

কিন্তু বাঙ্গালী চিরদিনই 'ঘরমুখো'। 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গেহগুলি'র নিবিড় আকর্ষণ, প্রিয়জনের মধুর স্মৃতি তাহাকে পাগল করিয়া তোলে। আর প্রবাসী বাঙ্গালীর তো কথাই নাই। ভাগ্যবিড়ম্বিত মাইকেল মধুসূদনও স্বদেশের জন্য কাঁদিয়া উঠিতেন, অনাহারে অনিদ্রায় কায়ক্লেশে জীবন যখন বিপর্যস্ত, তখনও তিনি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেন—"রেখো মা দাসেরে মনে এই মিনতি করি পদে"। প্রবাসী জীবন বাঙ্গালী মাত্রেরই তাই দুর্বিষহ। আর স্বভাবকবি, বাঙ্গালী কবি এবং 'প্রেম ও ফুলে'র কবি গোবিন্দদাসের নিকট প্রবাস-জীবন যে দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সহজাত প্রবৃত্তির বশে হীনতায় ও পরাধীনতায় বাঁচিতে না চাহিলেও জীবন-রক্ষার প্রয়োজনে, সংসারের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে কবি গোবিন্দদাসকে পরের চাকরি করিতে হইয়াছিল। চাকরি

---

১১২. "চারুবার্তা"—সেরপুরের ভূম্যধিকারী হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ১২৮৮ সালে (১৮৮১ খৃষ্টাব্দে) সেরপুর হইতে "চারুবার্তা" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ১২৯১ সনে "চারুবার্তা" কিছুকালের জন্য সেরপুর হইতে ময়মনসিংহে চলিয়া আসে এবং সেইখান হইতে পরিচালিত হয়। "অরূপা", "লহরী" প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় তখন "চারুবার্তা" কাগজের সম্পাদক। সেরপুরবাসী জনৈক উকিলের পরামর্শে কবি গোবিন্দদাস "চারুবার্তা"র কার্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর ১২৯৬ সনের কার্তিক মাসে "চারুবার্তা" পুনরায় সেরপুরে চলিয়া যায়। ১৩০০ সনে সেরপুরে "চারুবার্তা"র প্রচার বন্ধ হয়। সেই সময় তিনি দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর ময়মনসিংহস্থ "দেবনিবাস" ভবনে থাকিতেন।

মনুষ্য-জীবনের উন্নতির পথে কন্টক বলিয়া গোবিন্দদাসের ধারণা ছিল। আত্মীয়-স্বজনপরিজন-বিচ্ছিন্ন কবি অতি দুঃখে প্রবাসে বসিয়া ১২৯১ সালে লিখিলেন—

"জীবনের ঐ এক বিন্দুমাত্র সুখ,
দয়া মায়া ভক্তি স্নেহ প্রীতি মমতায়,
এ জীবনে এ জনমে ভরিল না বুক,
অপূর্ণ পরাণ পূর্ণ শুধু "হায় হায়"।
সোদরের প্রাণ পূর্ণ প্রিয় সম্ভাষণ,
শুষ্ক শত সাহারায় এক বিন্দু জল,
মানবে দেবের দয়া ভোগে যে কেমন,
জানি না সে জননীর স্নেহ সুবিমল।
জায়ার যন্ত্রণাময় প্রেম জ্বালামুখী,
এ জীবনে এ জনমে করিল না সুখী।"

—'এ জীবনে এ জনমে করিল না সুখী'—ইহাই যেন কবির জীবন-বেদ, ভাগ্য-দেবতার নির্মম পরিহাস! বাণীর একনিষ্ঠ সাধক, স্বাধীনতার পূজারী, মানবপ্রেমিক, স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের অন্তরে সংস্কারগত যে প্রজ্ঞা নিহিত ছিল, রোগে-শোকে-দারিদ্র্যে ও পরাধীনতায় তাহা মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকা পড়িলেও অনুকূল পরিস্থিতিতে সূর্যের আলোয় তাহা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। আর তখনই কবি 'ফেলে আসা দিনগুলি'র কথা মনে করিয়া স্মৃতি-চারণায় নিমগ্ন হইতেন—

"কেবল,
এক বিন্দু সুখ ওই জীবনে আমার,
জীবনের লক্ষ্য ওই, ওই মোর আশা,
সময়ের ভূতবক্ষ করিয়ে বিদার
উত্তোলিয়ে ভগবতী মিটাব পিপাসা।

ভারতের দগ্ধচিতা করিতে দর্শন
একান্ত যদ্যপি কেহ হয় যে কাতর,
দেখিতে সে কুরুক্ষেত্র রক্ত প্রস্রবণ,
অন্তর্গত অযোধ্যায় শেষ দিবাকর,
হোক তবে চিত্তে তার মহা আচ্ছাদন
গত বর্ষ—পৃথিবীর শেষ সংক্রমণ।”

—এই সময় হইতেই কবি-হৃদয়ে দেশাত্মবোধের অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকে। প্রিয়তমা পত্নীর চিতার অগ্নি এই দেশপ্রেমের অগ্নি-শিখাকে আরও প্রজ্বলিত করিল।

'চারুবার্তা' কাগজে কাজ করিবার সময় হঠাৎ একদিন কবি টেলিগ্রামে সারদাসুন্দরীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। পত্নীগতপ্রাণ গোবিন্দদাস এই সংবাদে বিচলিত হইয়া পরের দিনই ময়মনসিংহ হইতে ট্রেনে গার্ডের গাড়ীতে চড়িয়া জয়দেবপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন এবং বৈকালে জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। সারদাসুন্দরী তখন পিত্রালয়ে ছিলেন। বাড়ী আসিবার পথে 'চিলাই' নদীর তীরে এক জ্বলন্ত চিতা দেখিয়া কবির মন কাঁদিয়া উঠিল। দ্রুতপদে পত্নীর রোগশয্যা-পার্শ্বে আসিয়া দেখিলেন—পরপারের ডাক আসিয়াছে, সময় আর বেশী নাই—'পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ' বাজিতেছে। কবি প্রাণ-প্রিয়াকে শেষ দেখা দেখিলেন বটে, কিন্তু পরস্পরে বাক্য-বিনিময় আর হইল না। ১২৯২ বঙ্গাব্দে ১২ই অগ্রহায়ণ (ইং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, ২৬শে নভেম্বর) রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় সারদা মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে। এই জনশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায় ১৩১২ সনে কবির লিখিত “কি কঠিন” নামক একটি কবিতায়। 'বৈজয়ন্তী'-কাব্যে তাহা মুদ্রিত হয়। কবিতাটির এক স্থানে আছে—

"মুহূর্ত করেছি ভুল   অতি সূক্ষ্ম এক চুল।
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার।
যদিও বুঝিয়া আজ,   শুধু ঘৃণা শুধু লাজ,
দিবানিশি অনুতাপ-পরিতাপ সার।"

—ইহারও মূলে যে জনশ্রুতি আছে, তাহাতে দেখা যায়, কাহারও মতে "সারদার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত", আবার "কেহ কেহ বলেন, ইহা হইতেই নাকি কবির 'আত্মহত্যা' কবিতাটির সৃষ্টি"। পত্নীপ্রেমিক গোবিন্দদাস 'প্রেম ও ফুল' ও 'কুমকুম' কাব্যে সারদাসুন্দরীকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আর স্মৃতিচারণায় অঞ্জলি দিয়াছেন চারি ছত্রের একটি কবিতায়—

"প্রাণময়া প্রিয়পত্নী সারদাসুন্দরী,
গিয়াছেন ত্রিদিবধামে ধরা পরিহরি।
এই তার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ সমুদয়,
প্রীতির—স্মৃতির চিহ্ন—হীরা মণিময়।"

—'প্রীতির স্মৃতির চিহ্ন'রূপে কবি পত্নী-বিয়োগের অল্পদিন পরেই হারাইলেন একমাত্র সহোদর জগশ্চন্দ্র দাসকে। জগশ্চন্দ্র দাসের যক্ষ্মারোগ হয়। ১২৯৩ সনের ৩০শে শ্রাবণ (১৪ই আগস্ট, ৮৬) তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। জগশ্চন্দ্র ময়মনসিংহে "সাহিত্য সমিতি"র তত্ত্বাবধায়কের কার্য করিতেন। তিনি অসহায় গোবিন্দদাসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এইরূপ ভ্রাতৃবিয়োগে ১২৯৩ সালের ৫ই ফাল্গুন কবি গোবিন্দদাস "কে আছে আমার" শীর্ষক কবিতায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মনের অবস্থা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কবি লিখিয়াছেন—

"মিছামিছি দেশে দেশে ভ্রমিয়া বেড়াই,
যারে দেখি তারে যেয়ে, শুধুই শুধাই গিয়ে,
তুমি কিরে জগবন্ধু—জীবনের ভাই?

তুমি কি ভগিনী মম, প্রাণ হতে প্রিয়তম,
পূজনীয় দেবীসমা আমি যারে চাই ?
দেখিলে বালিকা মেয়ে, মিছা কোলে করি মেয়ে,
প্রাণের প্রমদাবলে মিছা চুমা খাই।"

—এই প্রকার করুণ সংগীত কবি গোবিন্দদাসের জীবন-সংগীত। এই সংগীত আরম্ভ হইয়াছে সারদাকে দিয়া, শেষ হইয়াছে জীবন-যজ্ঞের শেষ আহুতি দিয়া। মাঝখানে আছেন ভ্রাতা জগশ্চন্দ্র, 'বড় পিসি ঠাকুরাণী' ও 'জ্যেঠাইমা'। কবির জননী এবং কন্যা প্রমদার মৃত্যু পূর্বেই ঘটিয়াছিল, বাকী রহিল কেবল কনিষ্ঠা কন্যা—সপ্তমবর্ষীয়া মণিকুন্তলা। এই মণিকুন্তলাও কবির জীবিতকালেই পরলোক-গমন করিয়াছিল।

এইভাবে শোকের ঝড় কবির জীবনের উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে পদে পদে তাঁহার কার্যে শৈথিল্য প্রকাশ পায়। ফলে 'চারুবার্তা'-র সমূহ ক্ষতি হইল। ইহা দেখিয়া তাঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী হরচন্দ্রবাবুর নিকট প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিলে ১২৯৩ সালের ৮ই ভাদ্র তাঁহাকে সাময়িকভাবে চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হয়।

সেই বৎসর সেরপুরের ভূম্যধিকারী হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কার্য উপলক্ষে ময়মনসিংহ নগরে পদার্পণ করিলে, কবি গোবিন্দদাস সাক্ষাৎ করিয়া নিজের মানসিক বিপর্যয়ের কথা জানান। ফলে চৌধুরী মহাশয় সহানুভূতিবশতঃ এবং পরে দেবেন্দ্রকিশোরের বিশেষ অনুরোধে ১২৯৩ সালে ৯ই কার্তিক কবিকে কৃষি-বিভাগের ইন্সপেক্টরের পদে নিযুক্ত করেন। কবিকে চৌধুরী মহাশয় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাই কৃষি-বিভাগে কার্যবাহুল্য না থাকায় ১২৯৫ সনের ১৫ই আশ্বিন তিনি কবিকে ইতিহাস ও সাহিত্য সম্পর্কে সাহায্য করিবার জন্য পার্শ্বচর কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন। তৎকালে

কবি জমিদারী সংক্রান্ত কার্য অতি অল্পই করিয়াছেন। সর্বদাই তিনি হরচন্দ্র চৌধুরী[১১৩] মহাশয়ের পুস্তকাদি রচনা-কার্যে সাহায্য করিতেন। সেরপুরে তাহার বহু নিদর্শন রহিয়াছে।

কবি গোবিন্দদাসের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই সেরপুরেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সেরপুরে থাকিতে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেই সময় সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের[১১৪]

---

১১৩. হরচন্দ্র চৌধুরী—হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং বহুগুণের গুণী ছিলেন। ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত সেরপুরের চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সাহায্য ও বিশেষ সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। ধর্মমতে তিনি ছিলেন পরমতসহিষ্ণু। প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তিনি নিয়মিতভাবে উপাসনা করিতেন। একদিনের জন্যও সে নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় একজন গবেষক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি স্থানীয় অনেক ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তিনি "সেরপুরের বিবরণ", "বংশানুচরিত" ও সেরপুর জমিদারীর একখানি বহুমূল্য চার্ট বা বংশতালিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়াও তিনি লিখিয়াছেন "সেরপুব গেজেটিয়ার"। তাঁহার পুত্র রায় চারুচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর পিতার বহু সদ্গুণের অধিকারী হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় অন্যতম। পূর্ববর্ণিত কেশবচন্দ্র ও হরচন্দ্র ময়মনসিংহের স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন। হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত দানশীলা ভূম্যধিকারিণী তারামণি চৌধুরাণীর দত্তক পুত্র ছিলেন। এই দত্তক জননীকে তিনি নিজের জননী অপেক্ষাও বেশী শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন। এই ভক্তিই তাঁহার সকল উন্নতির মূল।

১১৪. অক্ষয়চন্দ্র সরকার—(১৮৪৬-১৯১৭ খ্রীঃ)। জন্মস্থান হুগলী জেলার চুঁচুড়া। ইঁহার পিতা রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার সাব-জজ ছিলেন। ইনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

"নবজীবন" বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১২৯৩-৯৪ সালে "নবজীবনে" কবি গোবিন্দদাসের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

কার্যব্যপদেশে কবি গোবিন্দদাস মাঝে মাঝে কলিকাতায় অবস্থান করিতেন। ১৮৮৭-৮৮ সনে তিনি প্রধানতঃ কলিকাতায় ছিলেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি "বিভা" নামে একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। চাকরিজীবন কবির কোন দিনই ভাল লাগে নাই। তাই চাকরি উপলক্ষ্যে যখনই সুযোগ পাইয়াছেন, তখনই সাহিত্য-সাধনায় 'জীবনে জীবন যোগ' করিয়াছেন। মধ্যযুগে যেমন রাজশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আনুকূল্যে কবি ও সাহিত্যিকরা কাব্য ও সাহিত্য রচনা করিতেন, সেইরূপ সুযোগ-সুবিধা যদি কবি গোবিন্দদাসের কালে থাকিত, তবে স্বভাবকবি গোবিন্দদাস বাংলার শ্রেষ্ঠ অলংকাররূপে চিহ্নিত হইতে পারিতেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চারি বৎসর বহরমপুরে ব্যবহার-জীবীর কার্য করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ইঁহার প্রবন্ধ এবং সমালোচনাসমূহ প্রকাশিত হইত। ইনি "সাধারণী" নামক রাজনীতিবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার এবং "নবজীবন"-নামক ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি 'কবিকঙ্কণ', 'বিদ্যাপতি', 'চণ্ডীদাস' প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইঁহার রচিত 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'গোচারণের মাঠ', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি ইঁহার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় দান করিতেছে। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উহার সদস্য ছিলেন। ইঁহার পত্নীও পরমা বিদুষী এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহাকে ইনি "অসাধারণী" নাম দিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ধার্মিক, প্রতিভাবান্, তেজস্বী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন।

"বিভা"র প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল আশ্বিন ১২৯৪। এই সালেই কবি গোবিন্দদাসের "বিদায়" (দ্রঃ 'কস্তুরী') ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আর ১২৯৫ সালে শ্রাবণ-সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "তারে কি বাসিব ভাল ?" ("সখী" নামে 'কুঙ্কুমে' মুদ্রিত) কবিতাটি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এই যে, কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকাব্য "প্রেম ও ফুল" 'বিভা'-প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন। এই গীতি-কাব্যটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কবি গোবিন্দদাস পশ্চিমবঙ্গে "প্রেম ও ফুলের" কবি বলিয়া পরিচিত হন। আর পূর্ববঙ্গে তিনি "মগের মুলুকের" কবি নামে সুবিখ্যাত। এই "মগের মুলুকের" সঙ্গে কবির জীবনের সর্বাপেক্ষা বিষাদমাখা অধ্যায় জড়িত। 'চাকরি-জীবন' কবিকে শান্তি দেয় নাই, কিন্তু 'নির্বাসন জীবন' দুঃখের মধ্যেও যে মহৎ হইতে পারে, মহৎ কিছু সৃষ্টি করিতে পারে, "মগের মুলুক" তাহারই প্রমাণ। পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

সপ্তম অধ্যায়

॥ 'মগের মুলুক' ও কবি গোবিন্দদাস ॥

"মগের মুলুক"—বাংলাদেশের প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য। বাংলার জলদস্যু মগদের অত্যাচারে জনজীবন, শান্তি ও শৃঙ্খলা কিরূপ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই প্রবাদবাক্যের মধ্যেই সেই ইতিহাস নিহিত। পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশে) ইহাদের অত্যাচার বেশী মাত্রায় ছিল। অত্যাচারীর তীব্রতা এত বেশী ছিল যে, কোন শাসক বা জমিদার অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী হইলে তুলনা প্রসঙ্গে বলা হইত,—'মগের মুলুক নাকি ?' অর্থাৎ 'মগদের রাজত্ব'—যাহা খুশী তাহাই হইবে বা তাহাই করিবে। কিন্তু প্রবাদ-বাক্য যে জীবনের বেদবাক্য হইয়া উঠে, তাহা স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনী আলোচনা করিলে বোঝা যায়।

কবি গোবিন্দদাস কর্মজীবনে কোথাও স্থায়ী হইতে না পারিলেও ইহা তাঁহার কাব্যজীবনের চলার পথে বিরাট সহায়ক হইয়াছিল। কারণ বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশিবার ফলে একদিকে কবি যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনি কাব্য-রচনার প্রেরণা ও উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপ লগ্ন-শক্তির সার্থক রূপায়ণ দেখি কবির 'কুঙ্কুম' নামক কাব্যখানিতে। ইহা একখানি সার্থক গীতিকাব্য।

১২৯৮ সালে "কুঙ্কুম" কাব্যখানি ছাপাইবার জন্য কবি গোবিন্দ-দাস সেরপুর হইতে কলিকাতায় গিয়াছিলেন। কার্যান্তে অর্থাৎ কাব্যখানি প্রকাশিত হইলে সেরপুর প্রত্যাবর্তনের পথে জয়দেবপুরে পদার্পণ করিয়া একখণ্ড নবপ্রকাশিত "কুঙ্কুম" রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়কে উপহার দেন। রাজা "কুঙ্কুমে"র কবিতাগুলি পাঠ করিয়া পরম

শান্তি লাভ করেন এবং গোবিন্দচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করিয়া জয়দেবপুরে অবস্থান করিতে অনুরোধ করেন। রাজমাতা সত্য-ভামাদেবীও এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। ফলে রাজা ও রাজমাতার আগ্রহে কবি গোবিন্দদাস বেশ কয়েকদিন জয়দেবপুরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কবি ঐ সময় প্রত্যহই নিয়মিতভাবে রাজ-বাড়ীতে যাইতেন এবং রাজার মুখে "কুঙ্কুম" কবিতার আবৃত্তি শুনিতেন ও তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতেন।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর কবি হঠাৎ রাজার ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন এবং রাজার কথায়-বার্তায় আলাপ-আচরণে আন্তরিকতার অভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ইতিমধ্যে একদিন বাজারে বেড়াইতে গিয়া পথিমধ্যে রাজভ্রাতা প্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে। নানা কথাবার্তার পর তাঁহার নিকট কবি গোবিন্দদাস জানিতে পারেন যে, কলিকাতায় প্রকাশিত "নবযুগ" নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ও নিন্দাত্মক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কালীপ্রসন্ন ঘোষ রাজার মনে এইরূপ বদ্ধমূল ধারণা করিয়া দিয়াছেন যে, উক্ত প্রবন্ধ কবি গোবিন্দদাসেরই রচিত। এই কথা শুনিয়া কবি গোবিন্দদাস বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলিতেছে এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইতিপূর্বে রাজা কেন তাঁহার সঙ্গে নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করিতেন।

এই ঘটনার তৃতীয় দিবসে কবি গোবিন্দদাস রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া দেখিলেন—রাজা তখন হাতিতে চড়িয়া প্রাতঃভ্রমণে বাহির হইতেছেন। রাজাকে দেখিয়া কবি যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু রাজা কোনরূপ কথাবার্তা না বলিয়া চলিয়া গেলেন। কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিকটেই প্রসন্নচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কবিকে পথিপার্শ্বে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন "নবযুগ" পত্রিকার প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত বলিয়া কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কর্তৃক অনুসন্ধানে জানা যাওয়ায় রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। রাজার আদেশ—সেই দিনই গোবিন্দচন্দ্রকে চিরতরে জয়দেবপুর চলিয়া যাইতে হইবে, নতুবা চরম বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। ১২৯৮ সালে ফাল্গুন মাসে এই রাজ-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল এবং ঐদিনই উপায়ান্তর না দেখিয়া চোখের জলে কবি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন। একতরফা অনুসন্ধান পক্ষপাতিত্ব হওয়ায় ন্যায়বিচার পদদলিত হইল এবং 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কাঁদিতে লাগিল।

জন্মভূমি পরিত্যাগ করা কবি গোবিন্দদাসের নিকট প্রাণত্যাগ করার সমতুল। শৈশব কাল হইতে জন্মভূমির উপর তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। ভাওয়ালকে তিনি প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন।

—"জননী দুহিতা নারী, যতকিছু সে আমারি,
সে আমার যাগযজ্ঞ, সে আমার ধ্যান।
তাহারে ভুলিব কিসে, সে আছে শোণিতে মিশে,
স্বপনেও দেখি তার সে চারু বয়ান।
ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ।" (চন্দন)

আজ সেই 'ভাওয়াল' হইতে বিনা দোষে বিনা বিচারে চির নির্বাসন যে কতখানি বেদনাদায়ক, তাহা বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। ১৩২৪ সালে বৈশাখ সংখ্যায় "নব্যভারত" পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—

"কালীপ্রসন্ন বঙ্গবাসীর সাহায্যে নিজ দুষ্কৃতি ঢাকিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি গোবিন্দচন্দ্রের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন,

তাহা পড়িলে পাষাণও ফাটিয়া যায়।" এই হৃদয়বিদারক কাহিনীর ফলশ্রুতি হইতেছে—"মগের মুলুক"।

রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিয়াই কবি জন্মভূমি পরিত্যাগের পূর্বে একমাত্র কন্যা মণিকুন্তলাকে সেই রাত্রিতে স্বামীগৃহে[১১৫] পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে রেলযোগে সেরপুরের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ যাত্রা করিলেন। নির্বাসিত কবির মর্মবেদনা তাঁহার "চন্দন" নামক কাব্যগ্রন্থে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে "নির্বাসিতের আবেদন" কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে ঃ—

"তোমরা বিচার কর—জনসাধারণ,
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির-নির্বাসন।
বিনা দোষে কেন তবে,
এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্বল আমি, এই কি কারণ?

তোমরা বিচার কর, আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্বাসিত,
করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ-ছাড়া,

---

১১৫. কবির একমাত্র কন্যা মণিকুন্তলার যখন ১১ বৎসর বয়স হয়, তখন ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত নিশিকান্ত দে নামে জনৈক পল্লীযুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। বিবাহ-কার্য সম্পন্ন হয় কবির একান্ত বন্ধু ও হিতৈষী দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয়ের "দেবনিবাসে"। ১২৯৬ সালে ১৩ই আষাঢ় দীন কবি দীনের ঘরেই কন্যাকে বিবাহ দিলেন।

পথের ভিখারী করি
করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃধনে যারা।···
তোমরা বিচার কর—কে হয় তাহারা

তোমরা বিচার কর—তোমাদের দ্বারে,
দরিদ্র ভাওয়ালবাসী,
কাতরে কাঁদিছে আসি,
পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে।
দুর্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে।"

—"দুর্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে"—কথাটির অর্থ—সবলের নিকট দুর্বলের প্রার্থনা। এখানে সবলের প্রতিনিধি—'ভাওয়াল রাজপরিবার'। কবি গোবিন্দদাসের এই প্রার্থনা শুধু নিজের জন্য নয়, সমস্ত ভাওয়ালবাসীর জন্য—পৃথিবীর বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নির্বাসিত ও সর্বহারাদের জন্য। কবি বিশ্বপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক ছিলেন। তাই "নির্বাসিতের আবেদন"-এর মাধ্যমে কবি ঋজু কঠিন দৃপ্ত ভঙ্গীতে যাহা বলিলেন, তাহার প্রয়োজন চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। মহামতি লেনিন বলিয়াছেন—"Art belongs to the people." কবি গোবিন্দদাসের কাব্য সেই 'belongs to the people'-এর মর্মবাণী এবং এইখানেই কবি গোবিন্দদাসের প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন।

পূর্বেই বলিয়াছি, কর্মজীবনে কবি গোবিন্দদাসকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতে হইত। জন্মভূমি জয়দেবপুর হইতে নির্বাসিত হইয়া সেরপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরেই, জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ প্রয়োজনে ১২৯৮ সালে মহাবারুণী গঙ্গাস্নানের যোগের পূর্বে কবি গোবিন্দদাস কলিকাতায় যান। হঠাৎ একদিন

চিৎপুর রাজপথে রাজার নিকটতম আত্মীয় শ্রীরামমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি কথা-প্রসঙ্গে কবিকে রাজবাড়ীতে আসিবার আহ্বান জানান। সেইমত কবি অপরাহ্নে কলিকাতাস্থ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার শৈশব-সঙ্গিনী রাজভগ্নী কৃপাময়ী দেবী, রাজমাতা প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এবং নির্বাসন-কাহিনীর কথা জানিতে পারিয়া তাঁহারা বুঝিলেন কেন গোবিন্দদাস জয়দেবপুর হইতে সেরপুরে যাওয়ার পথে দেখা করেন নাই।

ইহার তিনদিন পরে কবি গোবিন্দদাস রাজভবনে যাইয়া জানিতে পারিলেন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া গোবিন্দদাস রাজাকে ভাওয়াল হইতে তাঁহার নির্বাসনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। কবির নিজের ভাষায় বলা যায়—"রাজাকে বলিলাম, আমি 'নবযুগে' আপনার কি কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে কিছু লিখি নাই, মিছামিছি জন্মভূমি হইতে আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। আপনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, এখন অনুগ্রহপূর্বক আপনার একজন বিশ্বাসী লোক দ্বারা অনুসন্ধান করুন—আমি লিখিয়াছি কিনা? যদি অন্যকে বিশ্বাস না করেন, তবে বলুন 'নবযুগের' সম্পাদককে আমি অনুনয়-বিনয় করিয়া আপনার নিকট লইয়া আসি, আপনি স্বয়ং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন। আপনার ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত জমিদারের নিকট তিনি কখনই আমার খাতিরে মিথ্যা কথা বলিবেন না।"

কবি গোবিন্দদাসের এই কথায় রাজার মতের কোন পরিবর্তন হইল না। তিনি পূর্বের সিদ্ধান্তই বহাল রাখায় এবং পুনর্বার বৃথা অনুসন্ধানে সম্মত না হওয়ায় কবি গোবিন্দদাস রাজাকে সবিনয়ে বলিলেন—

"জয়দেবপুরে আমার এমন কেহ আত্মীয় নাই যাহাকে না

দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না। কেবল জন্মভূমি হইতে চিরদিনের জন্য নির্বাসিত হইতেছি বলিয়া দুঃখ হয়।...আমার স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি যে শ্মশানভূমিতে মিশিয়া আছে, সেই শ্মশানভূমিও যে দেখিতে পাইব না, ইহাতেও প্রাণে বড় ব্যথা পাইতেছি। অতএব আপনি দয়া করিয়া পুনর্বার অনুসন্ধান করুন।...বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত করিবেন না।"

কিন্তু গোবিন্দদাসের সব অনুরোধ ও প্রার্থনা মরুভূমিতে জল-সিঞ্চনের মতই ব্যর্থ হইল। রাজা কালীপ্রসন্ন ঘোষের কথাই বেদ-বাক্য বলিয়া মনে করিলেন এবং কিছুতেই সত্যাসত্য নির্ণয়ে রাজী হইলেন না। তখন তেজস্বী-নির্ভীক-পরোপকারী-প্রজাবৎসল কবি দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া বীরবিক্রমে রাজাকে বলিলেন—

"আপনি কি অনুসন্ধান করিবেন? আপনার ক্ষমতা থাকিলে ত? কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলে তাহাই আপনার বিশ্বাস,—তাহাই আপনার বেদবাক্য।...কালীপ্রসন্ন আপনাকে যাহা বলাইতেছে তাহাই বলিতেছেন।...আপনার চক্ষুকর্ণ থাকিলে, হৃদয় থাকিলে কালীপ্রসন্ন ভাওয়ালের কি করিয়াছে ও করিতেছে তাহা দেখিতেন ও বুঝিতেন। যাহা হউক, আমি অপরাধ না করিলেও আপনি আমার যে দণ্ড করিলেন, তাহা অতি গুরুতর। ফাঁসির পরই নির্বাসন। আপনি বিনাদোষে আমাকে জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত করিলেন। আচ্ছা, না লিখিলেও যদি লিখিয়াছি বলিয়া মিছামিছি দণ্ডিত হইলাম, তবে এখন হইতে আমি লিখিব। আপনি যতদূর সাধ্য করিবেন।...এখন দেখিবেন আর কেহ লিখিতে পারে কি না?"

এই 'লিখিতে পারে কি না'?—হইতেই "মগের মুলুকে"র সৃষ্টি এবং ইহার মূল প্রতিপাদ্যই হইতেছে 'ফাঁসির পরই নির্বাসনে'র প্রহসন।

কলিকাতার কাজ শেষ করিয়া গোবিন্দদাস সেরপুরে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু মনে শান্তি পাইলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, "সব জিনিসের একটা সত্যকার অধিকার আছে, সমাজ উন্নত হয়ে যখন সেই সীমাকে লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করা উচিত। সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়।" ফলে রাজার নিকট সুবিচার চাহিয়াও যে কোনও ফল হইল না, এই দুঃখ কবির বুকের ভিতর যেন আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল। দারুণ মনোবেদনা লইয়া কবি ১২৯৯ সালে শ্রাবণ মাসে আবার কলিকাতায় আসিয়া দেবীপ্রসন্নের "আনন্দ আশ্রমে" উঠিলেন এবং বন্ধুর নিকট সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করিলেন। ইহাতে মন একটু হাল্কা হইল বটে, কিন্তু শান্ত হইল না। অতঃপর কবি নিজের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকগণের নিকট উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। ফলে সকল দুয়ার বন্ধ হইলেও হৃদয়-দুয়ার খোলা থাকায় কবি গোবিন্দদাস পাঁচদিনের মধ্যে একখানি বিদ্রূপাত্মক কাব্য রচনা করিয়া ফেলিলেন এবং নাম দিলেন "মগের মুলুক"।

"মগের মুলুক"—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কাব্য হইলেও ইহা একখানি সৃষ্টিধর্মী আখ্যানমূলক গীতিকাব্য। রাজার আচরণে গোবিন্দদাস হৃদয়ে যে নিদারুণ যন্ত্রণা অনুভব করেন, তাহাই তাঁহাকে "মগের মুলুক" রচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল। গোবিন্দদাসের হৃদয়বিদারক কাহিনী শ্রবণ করিয়া তৎকালীন "দৈনিক" পত্রিকার সম্পাদক সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার পত্রিকায় যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে এইখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পত্রিকায় কবি গোবিন্দদাস বলিয়াছেন—"যখন বাঙ্গলার সংবাদপত্র সম্পাদকদের নিকট গিয়া আমার নির্বাসন সম্বন্ধে সমস্ত অবস্থা

জানাইয়া তাঁহাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি, তখন 'বঙ্গবাসী' অফিসেও গিয়াছিলাম। সেখানে যোগেন্দ্রবাবু, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'দৈনিকে'র সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি তাঁহাদের দলস্থ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। আমার নির্বাসন সম্বন্ধে ও কার্যত্যাগ সম্বন্ধে বিস্তারিত অবস্থা শুনিয়া ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিলেন, 'কালী-প্রসন্নের এতদিন পরে পদস্খলন হইল। রাজনীতি সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন এতদিন যে চাল দিয়া আসিতেছিল, যে কৌশল ও চাতুরি প্রদর্শন করিতেছিল, আজ আপনাকে তাড়াইয়া সে চালে ভুল করিয়াছে, সে কৌশলে ও চাতুরিতে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিয়াছে। কোন দেশে কোন লোক লেখকের সঙ্গে বিবাদ করিয়া আত্মপ্রাধান্য বজায় রাখিতে পারে নাই। ইউরোপীয় রাজনীতিজ্ঞেরা নানা উপায়ে লেখকদিগকে বাধ্য করিয়া সাধারণ্যে তাহাদের মতের সমর্থন করায় ও এইরূপে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করিয়া থাকে। কালীপ্রসন্ন যদি আপনাকে না তাড়াইয়া যে কোন উপায়েই হোক, আপনাকে বাধ্য রাখিতে, হাতে রাখিতে চেষ্টা করিত, তবেই তাহাকে বুদ্ধিমান বলিতাম। কালীপ্রসন্ন আপনার সঙ্গে বিবাদ করিয়া, আপনাকে তাড়াইয়া, নিতান্তই নির্বোধের মত কাজ করিয়াছে। অচিরে কালী-প্রসন্নের পতন অনিবার্য।' ইহার অল্পদিন পরেই 'মগের মুলুক' লিখিতে আরম্ভ করি।"

মূলতঃ সম্পাদকগণের[১১৬] সহানুভূতি আকর্ষণে ব্যর্থ হইয়া কবি গোবিন্দদাস দেবীপ্রসন্নের "আনন্দ আশ্রমে" বসিয়াই পাঁচদিনেই 'মগের মুলুক' রচনা করেন। এই কাব্যের প্রথম পাঠক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়। কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল "নব্যভারতে" তাঁহার ব্যঙ্গকাব্যখানি প্রকাশিত হয়। কিন্তু সম্পাদকের আপত্তি

১১৬. 'সম্পাদকগণ' বলিতে বিশেষভাবে সাপ্তাহিক পত্র-সম্পাদকবর্গের কথা বুঝানো হইতেছে।

থাকায় তাহা সম্ভব হয় নাই। কারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ভবিষ্যৎদর্শী সম্পাদক বুঝিয়াছিলেন যে, এই কাব্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইলে দেশব্যাপী এক আলোড়ন জাগিবে এবং অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইবে। তাহা ছাড়া, মাসিকে প্রকাশিত না হইয়া সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইলে রচনার গৌরব বৃদ্ধি পায়। এইজন্য তিনি কবি গোবিন্দদাসকে কোন সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাব্যখানি প্রকাশ করিতে বলিলেন এবং নিজে উদ্যোগী হইয়া তৎকালীন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা "প্রকৃতি"-র[১১৭] সম্পাদকের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়া দিলেন। প্রথম পরিচয়েই 'মগের মুলুকে'র প্রসঙ্গ আসে এবং আলাপ-আলোচনান্তে "প্রকৃতি"র সম্পাদক উহা প্রকাশ করিতে সম্মত হন। "প্রকৃতি" তখন কেবলমাত্র দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। এই "প্রকৃতি"র সম্পাদকের দৃঢ়তা ও সহায়তা না পাইলে কবি গোবিন্দদাস 'মগের মুলুকে'র কবিরূপে পরিচিতি লাভ করিতেন না। বলা বাহুল্য, কবির এই পরিচিতির পিছনে দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের অবদানও স্মরণীয়। তাঁহার চেষ্টায় "প্রকৃতি" পত্রিকার ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১২৯৯ সালের ৫ই ভাদ্র) 'মগের মুলুক' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ১৯শে ভাদ্র, ৯ই আশ্বিন, ২৪শে পৌষ, ২রা মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। অবশেষে ২৩শে মাঘের সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে

---

১১৭. "প্রকৃতি" ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র কলিকাতায় আত্মপ্রকাশ করে। ইহা একখানি উল্লেখযোগ্য সাপ্তাহিক পত্রিকা—যেমন বিষয়-নির্বাচনে, তেমনি লেখক-নির্বাচনে। প্রবন্ধগুলি মৌলিক ও সময়োপযোগী এবং লেখকগণ সকলেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচয়িতা, 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রণেতা, 'নব্যভারত' সম্পাদক পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ "প্রকৃতি"-তে লিখিতেন। পত্রিকাখানির বহুল প্রচারও ছিল।

কবি গোবিন্দদাস যেমন একটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, 'মগের মুলুক' তেমনি একটি নির্যাতিত মানুষের জীবনবেদ, বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনার মর্মবাণী—আধুনিক গণনাট্যের দিশারী।

মূলতঃ 'মগের মুলুক'—ভাওয়াল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ জীবন-যাত্রার ও শাসন-ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য প্রামাণ্য দলিল। ইহা সমাজ-জীবনের দর্পণস্বরূপ। ভাওয়াল রাজ্যের প্রজাদের অত্যাচার উৎ-পীড়নের বহু গোপন কাহিনী ইহাতে প্রতিফলিত হইলেও ইহার মর্মবাণী সর্বকালের সর্বযুগের বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-নির্যাতিত উৎপীড়িত-বিতাড়িতদের কাহিনীর সগোত্র। ঋজু-কঠিন-তীক্ষ্ণ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কবি গোবিন্দদাস এই কাব্যে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মূল কথাই হইতেছে জীবনের চেয়েও শিল্প বড়। দধীচির[১১৮] তনুত্যাগে যে বজ্র নির্মিত হইয়াছে, তাহাতে অত্যাচারী শাসকরূপী কংসের[১১৯]

---

১১৮. দধীচি—স্বনামপ্রসিদ্ধ ঋষি। ইনি শিবের পরম ভক্ত ছিলেন। শিবানুচর নন্দীকেশর ইঁহার শিষ্য ছিলেন। দক্ষ শিবহীন যজ্ঞের আয়োজন করিলে ইনি ঐ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করেন। ইঁহার তপস্যার প্রভাব দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হন এবং অলম্বুষা অপ্সরাকে তপোভঙ্গ করিতে প্রেরণ করেন। ইহাতে দধীচির চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং তৎফলে পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনা অনুসারে বৃত্রবধার্থে ইনি অম্লানবদনে যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া দেবকার্যে স্বীয় অস্থি প্রদান করেন। অস্থি হইতে নির্মিত বজ্রাস্ত্র প্রহারে ইন্দ্র বৃত্রকে নিহত করেন।

১১৯. কংস—শ্রীকৃষ্ণের মাতুল ও তাঁহার জননী দেবকীর পিতৃব্য রাজা উগ্রসেনের পুত্র। ইঁহার রাজধানী ছিল মথুরা। ইনি পিতাকে বন্দী করিয়া নিজে রাজা হন। দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হইলে কংস দৈববাণীতে জানিতে পারিলেন, দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র ইঁহার প্রাণবিনাশ করিবে। এই নিমিত্ত কংস দেবকী ও বসুদেবকে বন্দী করিয়া রাখেন এবং একটির পর একটি করিয়া তাঁহাদের সাতটি সন্তানকে মারিয়া ফেলেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে বসুদেব লুকাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার

ধ্বংসের আর বেশী দেরী নাই। এই কথা বলিবার প্রয়োজন চিরকাল আছে এবং বলিবার মত মানুষেরও অভাব কোনদিন হইবে না। ইতিহাস আমাদের এই কথাই বলে।

বাংলায় হাস্যরসের পর্যায়ে—Humour, Wit, Irony ও Satire —এই চারটি ভাগ পাওয়া যায়। "মগের মুলুক"—এই Satire পর্যায়ের বিদ্রূপরসাত্মক কাব্য। ইহাতে কবি গোবিন্দদাস যেমন একদিকে ভাওয়াল রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অনেক গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি ভাওয়ালের নিরীহ প্রজাকুলের উপর রাজ-অনুগ্রহপুষ্ট আমলাদের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনীও বর্ণনা করিয়াছেন। কাব্যখ্যানির রচনা-ভঙ্গিমাও অপূর্ব। কবিত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে বলা যায় যে, ভাবে-ভাষায়-ছন্দে-অলংকারে-ইঙ্গিতে-ব্যঞ্জনায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই ধরনের কাব্য বিরল। 'প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে, নানা কবি গান গায় নানা দিক্ হতে'। কিন্তু অত্যাচারী প্রজাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া, বিনা দোষে, বিনা কারণে জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত কোন কবি এইরূপ জ্বালাময়ী, বর্ণনা-ময়ী ও কাব্যময়ী ভাষায় কোন কবিতা লিখিয়াছেন কিনা তাহা গবেষণার বিষয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস একজন উপেক্ষিত অথচ আলোচিত স্বভাবকবি—যাঁহার কোন পরিচয়ের প্রয়োজন নাই, তাঁহার কাব্য একাধারে জীবন ও সাহিত্য।

নিকট রাখিয়া আসেন এবং যশোদার কন্যাকে দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। এই কন্যারূপিণী দেবী মহামায়াকে কংস মারিতে গেলে কন্যাটি শূন্যে উঠিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে বলেন—"তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে"। কংস পরে কৃষ্ণের পরিচয় জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বধ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশেষে কংস নিজেই কৃষ্ণের হাতে নিহত হন।

'সাহিত্যে'র সংজ্ঞা দিতে গিয়া কবি কোলরিজ[১২০] বলিয়াছেন, 'সাহিত্য' হইতেছে—"Criticism of life"—জীবন ও জগতের সমালোচনা। কথাটি অন্যভাবে বলা যায়—সংগ্রামই জীবন এবং জীবনই সংগ্রাম। কবি গোবিন্দদাসের কাব্য সংগ্রাম ও জীবন, জীবন ও সংগ্রাম। মধ্যাহ্নের অলস দুপুরে শিথিল দেহ এলাইয়া ইহা লেখা নয়, জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর মধ্যে ইহার সুখাভিসার নয়, বর্ষার ঘটনা অথবা ময়ূরের ডাকে অথবা ফসল কাটার গানে ইহার জন্ম হয় নাই—ইহার জন্ম পদে পদে পরাজয়-অপমান-গঞ্জনার মধ্যে। তাই 'প্রকৃতি'-র বুকে 'মগের মুলুক' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বুকে একটা উল্কা বহিয়া গেল। সেই উল্কার রক্তিম ছটায় রথী-মহারথীরা ধরাশায়ী হইয়া পড়িলেন। ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'প্রকৃতি'র সম্পাদক, কার্যাধক্ষ এবং সত্ত্বাধিকারী প্রভৃতির নামে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এক মানহানি মামলা আনেন। এই অভিযোগের ফলে "প্রকৃতি"র পরিচালকগণের নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়। ফলে ১২৯৯ সালে মাঘ মাসের শেষে "প্রকৃতি"-র সম্পাদক কবি গোবিন্দ-দাসকে নিম্নলিখিত দুইটি তারবার্তা প্রেরণ করেন—

1st Telegram :— *11th February, 1893.*

"Raja Rajendra's case 20 February meet us Dacca East office positively with all necessaries".

2nd Telegram :— *12th February, 1893.*

Send man here before Tuesday with particulars wire what course adopt".

কবি গোবিন্দদাস উপরিউক্ত টেলিগ্রাম দুইটির প্রত্যুত্তরে "শীঘ্রই

---

১২০. কোলরিজ, স্যামুয়েল টেলর—(১৭৭৮-১৮৩৪ খ্রীঃ)। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কবি। ইহার 'Ancient Mariner', 'Kublal Khan' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

আসিতেছেন" বলিয়া জানাইলেন। শুধু তাহাই নহে, দেবেন্দ্র-কিশোরের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আগমনপূর্বক "প্রকৃতি"-র পরিচালকদিগের উদ্ধারের জন্য দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর অনুরোধপত্র লইয়া ঢাকার বিখ্যাত উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু "প্রকৃতি"-র পরিচালক-গণ 'ওয়ারেন্টের' বলে গ্রেপ্তার হইয়া ঢাকায় আসিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে কবি গোবিন্দদাসের কর্মতৎপরতায় অভিযোগের প্রতিলিপি সহ "মগের মুলুক" 'প্রকৃতি'র ক্রোড়পত্রস্বরূপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় এবং ইহাই কবি গোবিন্দদাসকে সর্বত্র পরিচিতি-লাভে সাহায্য করে। 'মগের মুলুকে'র জন্য 'প্রকৃতি'-র সুনাম ও গ্রাহক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস এই যে, মামলাটি আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'প্রকৃতি'-র প্রকাশনা বন্ধ হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে জানা যায় যে, উকিল ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কর্ম-তৎপরতায় 'প্রকৃতি'-র সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অভিযোগ-কারী কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার সহিত মোকদ্দমা আপোষ-নিষ্পত্তি করিবার ব্যবস্থা করেন (চৈত্র ১২৯৯)। শুনা যায়, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র[১২১] স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই মোকদ্দমা আপোষ-নিষ্পত্তি

১২১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(১৮৩৮-১৮৯৪ খৃঃ)। জন্মস্থান—রাণাঘাটের নিকটবর্তী কাঁঠালপাড়া। পিতা ডেপুটি কালেক্টর যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. উপাধিধারী (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ছাত্রজীবন শেষ করিয়াই ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন এবং ১৮৯২ খৃঃ অবসর গ্রহণ করেন। বঙ্গ-সাহিত্যে ইঁহার অবদান অতুলনীয়। ইঁহাকে বাঙ্গালার "সাহিত্যসম্রাট্" বলা হয়। প্রথমে ইনি 'সংবাদ প্রভাকর' নামক মাসিক পত্রে কবিতা লিখিতেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' ইঁহার প্রথম উপন্যাস গ্রন্থ। 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী' প্রভৃতি উপন্যাস, 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য,' 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার অপূর্ব প্রতিভা, গবেষণা ও স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন। ইনি 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের

করিবার জন্য কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে পত্র লিখিয়াছিলেন। এই স্মরণীয় পত্রানুযায়ী ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকায় একটি সভার আয়োজন করা হয় এবং সেই সভায় 'প্রকৃতি'র সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেন। ফলে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ায় বিচারক রায় দেন—

"Accused acquitted, the case being compromised under Section 345(1), 3rd April 1893".

১২৯৯ সালে ২৭শে চৈত্র 'প্রকৃতি'-র সংখ্যায় "ক্ষমাপত্র" শীর্ষক পত্রখানি প্রকাশিত হয়। আর কালীপ্রসন্ন ঘোষ এই পত্রখানি তৎকালীন প্রচারিত প্রত্যেকটি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইতে চাহিলেন যে, মামলায় তাঁহার জয় হইয়াছে। এই মামলা প্রসঙ্গে কবি গোবিন্দদাস একটি পত্রে লিখিয়াছেন—

'প্রকৃতি'র সম্পাদক আমার লিখিত 'মগের মুলুকে'র হস্তলিপি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে দিয়াছিলেন। এবং আমি যে উহা লিখিয়াছি তাহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন আমার নামে মোকর্দ্দমা করিতে সাহস পায় নাই। প্রমাণের আমার অপ্রতুল ছিল না।" অর্থাৎ প্রকারান্তরে কবি গোবিন্দদাসেরই জয় হইয়াছে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। এই একখানি কাব্য অত্যাচারী শাসকের শাসনের মূলে এমনভাবে কুঠারাঘাত করিয়াছিল যে, আর দ্বিতীয় কোন 'নির্বাসিতের আবেদন' বা 'মগের মুলুক' রচিত ও প্রকাশিত হয় নাই। "The pen is mighter than sword"—ইহা "মগের মুলুক' রচনায় আর একবার প্রমাণিত হইল। ভাষা যে কত জীবন্ত, বলিষ্ঠ,

---

স্রষ্টা। 'বঙ্গদর্শন' নামক পত্রিকা ইনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'Rajmohan's Wife' ইঁহারই রচিত ইংরাজী গ্রন্থ।

প্রাণবন্ত হইতে পারে এবং আশা-উৎসাহহীন জাতির প্রাণে সাড়া জাগাইতে পারে, তাহা 'নির্বাসিতের আবেদন' পড়িলেই বুঝা যায়—

"বাঙালী মানুষ যদি, প্রেত কারে কয় ?
বৃথা ও ইংরেজী শিক্ষা,
বৃথা ও পাশ্চাত্ত্য দীক্ষা,
হৃদয়ে নাহিক মোট জ্ঞানের উদয়,
এই যে ভাওয়ালবাসী
নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ,
অসুরেরা রোজ রোজ,
কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়
এরা আহা চক্ষু খেয়ে,
একটু দেখে না চেয়ে,
ইহাদেরি একদেশী প্রতিবেশী হয়।
ও উচ্চ শিক্ষায় ধিক
আমি যা দিয়েছি ঠিক
জগতে জঘন্য হেন নাহি নীচাশয়,
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?"

আবার পুরুষসিংহ কবি নিরাশার মধ্যেও আশার বাণী শোনান—

"কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?
আমার জীবন আয়ু,
তোমারি মা জল বায়ু,
তোমারি স্নেহের সব মমতা মাখন।
যদি মা তোমারি হিতে,
পারি এ জীবন দিতে,

এই রক্ত এই মাংসে হয় প্রয়োজন,
কি আছে সৌভাগ্য আর,
এর চেয়ে মা আমার ?
আমি যে তোমারি কৃষ্ণ প্রাণের নন্দন।

কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয়া বৃন্দাবনে ?
কি ছার সে অঘাসুর,
নারীচোরা শংখচূড়,
কালীয় নাগের দুষ্ট অনুচরগণ,
আঘাতি চরণ মূল,
বধিব সে দৈত্যকুল,
আমি সে তোমারি কৃষ্ণ অসুরদলন।
ছার ইন্দ্র দেবরাজে,
কি ভয় তাহার বাজে ?
ধরিব গোবিন্দ আমি গিরি গোবর্ধন,
কেন ভীত নিরানন্দ প্রিয় বৃন্দাবন ?"

কবির নিকট 'প্রিয় বৃন্দাবন' হইতেছে প্রিয় জন্মভূমি ভাওয়াল। আর এই ভাওয়ালকে 'মগের মুলুকে' পরিণত করিয়াছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে এই ভাওয়াল হইতেও ঘোষ মহাশয়কে চিরতরে বিদায় লইতে হয়। কবি গোবিন্দদাসকে অন্যায়ভাবে ভাওয়াল হইতে নির্বাসিত করার ফল ঘোষ মহাশয়ের ভাগ্যেও জুটিয়াছিল। ইহাই অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস! ১৩১৮ সালে ঘোষ মহাশয়ের বিরুদ্ধে কিঞ্চিদধিক দশ লক্ষ সাড়ে বাষট্টি হাজার টাকার দাবীতে রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিধবা পত্নী যে অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহারই একস্থানে নিম্নলিখিত কথাগুলি 'মগের মুলুক' ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করে—

"১২৯৯ সনে 'প্রকৃতি' নামে একখানা সংবাদপত্র বিবাদীর বিরুদ্ধে কতক সংবাদ প্রকাশ করে, তাহাতে বিবাদী ঐ সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে ঢাকা ফৌজদারী আদালতে এক মানহানির মোকর্দ্দমা উপস্থিত করেন। পরে অপ্রীতিকর রহস্যোভেদের পরিহার জন্য, বিবাদী ঐ মোকর্দ্দমা আপোষ করেন।" —রাণী বিলাসমণি দেবীর মুদ্রিত অভিযোগের প্রতিলিপি।—ইহাই 'মগের মুলুকে'র ইতিহাস—নির্বাসিত কবির বঞ্চিত বুকের পুঞ্জীভূত বাণীর প্রকাশ। বাংলার কাব্য-সাহিত্য, বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যখানি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবে। কাব্যখানি এতদূর জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকে প্রকাশিত পুস্তিকা না পাইয়া হাতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কবির একান্ত ভক্ত কবি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য[১২২]

---

১২২. কবি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য—১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭) কবি যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য রাজশাহী বলিহারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ কলিকাতা এণ্টালীতে দেহত্যাগ করেন। ১৯০৯-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশীতে পাতালেশ্বরে পিতামহের নিকটে থাকিয়া 'হিন্দু কলেজিয়েট' স্কুলে শিক্ষা-লাভ করেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি বলিহার থেকে ময়মনসিংহে গৌরীপুরের দানবীর জমিদারের (কবির খুল্লতাত) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হইতে থাকেন। পিতামহের সঙ্গে কাশীবাস এবং পাঠ, তার পরে কলিকাতা Metropolitan College-এ শিক্ষালাভ। কাশীতে তিনি বিপ্লবী শচীন সান্যালের সহযোগী হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গোখেল ও তিলকের অনুগামী দুই দলকে মেলাতে যখন অ্যানি বেসান্ত প্রয়াসী হন, তখন অ্যানি বেসান্তের উদ্দেশ্যে তিনি যে কবিতা রচনা করেন, তাহা তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মর্মগাথায়' (১৯১৪ খ্রীঃ) সংকলিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে 'কবিতাগুলি ভাল লাগল' এই আশ্বাস পাইবার পর কবি এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। কবির 'রামধনু' (১৯২৭ খ্রীঃ) একটি স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থ। কবির দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হাসির হল্লা'য় (১৯২৩ খ্রীঃ), তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়াপথ' (১৯২৬ খ্রীঃ), চতুর্থ 'রামধনু' (১৯২৭ খ্রীঃ) এবং পঞ্চম 'নভোরেণু' '(১৯২৮ খ্রীঃ)। তিনি তাঁহার

মহাশয় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। কবি গোবিন্দদাসের পুত্র শ্রীহেমরঞ্জন দাসের সাহায্যে এই হস্তলিখিত খাতাখানি সংগ্রহ করিয়া 'মগের মুলুক' কাব্যখানি প্রকাশ করিলাম। ইহার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় ও দাস মহাশয়ের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

"মগের মুলুক" রচনার বহুবর্ষ পরে—১৩০৩ সালে কবি গোবিন্দ-দাসের 'নির্বাসিতের আবেদন' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। "চন্দন" নামক গীতিকাব্যে ইহা স্থান পাইয়াছে, যদিও ইহা "মগের মুলুক" কাব্যেরই স্মৃতিচারণ ও স্মৃতিপূরণ। সত্যই গোবিন্দদাসের "মগের মুলুক" বাংলা দেশে যে একদা বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। 'নব্যভারত' সম্পাদক এই কাব্যের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"শুনিয়াছি 'মগের মুলুক' পুস্তকখানি কণ্ঠে কণ্ঠে আজও বিচরণ করিতেছে। এরূপ বর্ণনা বিদ্যাসুন্দরের পর এদেশে আর কেহ করিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। 'মগের মুলুকে'-র লেখক ভারতচন্দ্রের[১২৩] যোগ্য উত্তরলেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-কীর্তির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'সাহিত্যিক ভাতা' মৃত্যু পর্যন্ত পাইয়া-ছিলেন।

১২৩. ভারতচন্দ্র—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৬৩৪-১৬৮২ শকাব্দ) বর্ধমান জেলার পাণ্ডুয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হয়। বাল্যকালে ইঁহার সম্পত্তি বর্ধমানরাজ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হইলে ইনি মাতুলালয়ে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দেন। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি বিবাহ করেন। বিশ বৎসর বয়সে ইনি আবার সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য বর্ধমানে যান এবং তথায় দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। কিছুকাল পরে পলায়নপূর্বক ইনি কটকে মারহাট্টাদের আশ্রয়ে যান। এইভাবে নানা অবস্থার বিপাকে ঘুরিয়া ইনি ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের আশ্রয় লাভ করেন। সেই স্থান হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহাকে মাসিক ৪০্ টাকা বৃত্তি দিয়া নিজের রাজসভায় আনেন এবং ইঁহার প্রণীত 'অন্নদামঙ্গল' ও 'বিদ্যাসুন্দর' শ্রবণে প্রীত হইয়া ইঁহাকে "রায় গুণাকর" উপাধি ও মূলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। ইনি "রসমঞ্জরী" নামক আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন

নচেৎ এত অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইত না। তাঁহার বর্ণনা কত সুন্দর, পাঠকগণ দেখুন —

বঙ্গদেশে আছে একটি 'স্বর্গপুর' গ্রাম,
গাছ গাছুলায় ভরা তাহা নবীন ঘনশ্যাম।
রাঙ্গা মাটি, পলাকাটী খাঁটি সোনার মত,
টিলায় টিলায় ভুল হয়ে যায় মৈনাক শত শত।
উত্তরে তার রূপার রেখা ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী,
মন্দাকিনীর মত তাহার মন্দ মন্দ গতি।
দেবপুর নিবাসী কত দেবের দেহ ছাই,
মাখি বুকে, মনের সুখে যখন সেথা যাই।
পূবের ধারে, গঙ্গার পারে শ্যামল তপোবন,
চাঁপাবনে চাতক ডাকে চমকে উঠে মন।
কলসী কাঁখে, আঁচল মুখে মেয়েগুলি আসে,
পাতা ঢাকা ফুলের মত ফোঁকর হয়ে হাসে।
কেউ বা পড়ে, কেউ বা ধরে, উঠে ভিজা পায়,
পিছলা ঘাটে আছাড় খেয়ে কলসী ভেঙ্গে যায়।
পূবের দিকে পদ্মভরা বিলের সীমা নাই,
পিপী ডাকে, কোড়া ডাকে, কালেম কত গাই।
উত্তরে তার হাজার হাজার বিশাল গজার বন,
বাঘ ভালুকে বেড়ায় সুখে খেলায় হরিণগণ।
গাছে গাছে ময়ুর নাচে পেখম ধরে কত,
পুচ্ছে তার তুচ্ছ করে ইন্দ্রধনু শত।
বার মাসই ফুলের হাসি, হয় না বাসি তায়,
ছায়া-ঢাকা, স্নেহ-মাখা মায়ের মতন প্রায়।

করেন। দেবানন্দপুরের সুখী বাবুদের বাড়ীতে অবস্থান করিয়া ইনি ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন।

নানান্ ছন্দে নানান্ গন্ধে শীতল বায়ু বয়,
নন্দনে চন্দন বনে মলয় মনে লয়।
টিলার পাশে ঝরণা বহে, ঢাল গড়ানে ভুঁই,
দুধ খাইতে মায়ের বুকে কাপড় ঠেলে যুই।
ফাগুন মাসে আগুন হাসে সারা কানন ভরা,
ধুঁয়ায় ধুঁয়ায় দিক্ ছেয়ে যায়, আকাশ আঁধার করা।
চৈত্রমাসে, ভোর বাতাসে, উড়ে তুলারাশি,
পোড়া বনের, পোড়া মনের শুষ্ক শ্বেত হাসি।

('নব্যভারত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫)

'মগের মুলুক' রচনার ফলে গোবিন্দদাসের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল বটে, কিন্তু আততায়ীদের চক্রান্তে তিনি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন, সময় সময় তাঁহার জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হইতে লাগিল। গুপ্তঘাতকের দল সর্বদা তাঁহার পিছনে পিছনে ফিরিত। আর তাঁহাদের মদত দিতেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়। কবি গোবিন্দদাস এই অসহনীয় অবস্থা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই বুঝা যায় রাজশক্তির দাপট 'মগের মুলুকে'-রই সামিল। কবি লিখিয়াছেন—"আমি কলিকাতা হইতে, কি অন্য কোথাও হইতে ময়মনসিংহে যাইবার সময় আমাকে রেলওয়ের ষ্টেশনে ধরিয়া মারিবার জন্য ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলওয়ের ষ্টেশনে লোক নিযুক্ত ছিল। আমি রাত্রির গাড়ীতে ছাড়া দিনের গাড়ীতে যাতায়াত করিতাম না। গাড়ীতে উঠিয়াই পার্শ্বস্থ লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহাদিগকে আমার অবস্থা জানাইয়া, ষ্টেশনের নিকট গাড়ী আসিতেই গায় মাথায় কাপড় দিয়া, মাথা গুঁজিয়া টুলের উপর পড়িয়া থাকিতাম। আর সেই লোকেরা আমার রক্ষার জন্য গাড়ীর দরজার নিকট সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত। ঢাকা-ময়মনসিংহে রেলওয়ের যে সকল ষ্টেশন ভাওয়ালে অবস্থিত তাহাতে রাজার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। সেই সব ষ্টেশনে

রাজার লোকে গাড়ী হইতে কাহাকেও টানিয়া নিলে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্যেই এত ভয়ে ও সতর্কতার সহিত আমি রেলপথে যাতায়াত করিয়াছি।”

মূলতঃ নির্ভীকতা ও তেজস্বিতাই ছিল কবি গোবিন্দদাসের চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি যেন রবীন্দ্রনাথের অভয়মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন—

“ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল রব।”

কবি বলিতেন—“সহস্র বিপদ আসিলেও আমি ভয় করি না,—নিজের কর্তব্য করিয়া যাই। আমি বিপদকে কোনদিনই ভয় করি নাই।” “মগের মুলুক” এই দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ নিদর্শন।

———

॥ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম
ও
কবি গোবিন্দদাস ॥

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। আত্মপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশ-প্রীতিকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলা উচিত।" এই 'স্বদেশ-প্রীতি'-ই 'স্বদেশপ্রেম' এবং ইহা আত্যন্তিক অনুরাগের ফল। বাংলা সাহিত্যে এই স্বদেশপ্রেমের বিকাশ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। 'বণিকের মানদণ্ড যখন রাজদণ্ড' রূপে দেখা দেয়, তখনই গীত হয় 'সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি' এবং 'আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি'; দেশের প্রতি এই আজন্ম আকর্ষণ হইতেই স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ। কবি জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলা যায়—"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর"। 'রূপসী বাংলার' প্রতি এই যে জন্মগত আকর্ষণ, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও আত্মনিবেদন, তাহাই হইতেছে 'স্বদেশপ্রেম'।

স্বদেশপ্রেম সকলের অন্তরেই থাকে। সুখের দিনে তাহা থাকে সুপ্ত এবং দুঃখের দিনে তাহা থাকে জাগ্রত ও উদ্দীপিত। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের মূল প্রোথিত থাকে অন্তরের অন্তঃস্থলে মণিকোঠায়। ঐক্যবদ্ধভাবে যখন দেশের সকল মানুষ একই প্রকার জীবনধারায়, একই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধারায় পুষ্ট হইয়া 'একমন—একপ্রাণ—একতা' ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে, তখনই হয় যথার্থ স্বদেশপ্রেম এবং

তখনই মৃন্ময়ী দেশ চিন্ময়ী হইয়া উঠে। 'ফুলে ও ফসলে কাদামাটি জলে' দেশ তখন সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হইয়া উঠে এবং দেশভক্ত সন্তান তখন জননী জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিয়া পূজা করে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়—"বহুকাল হইতেই বাঙ্গালী জাতি 'বন্দে মাতা সুরধুনী'র গান গাহিয়া আসিতেছে, কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া দেশমাতার বন্দনা করিতে পূর্বে সে জানিত না। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে জাতি শুধু গণেশ হইতে গৌরাঙ্গদেব নয়,—এমন কি, মনসা ও তুলসী বৃক্ষকেও দেবতার আসনে বসাইয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বরাবর ভাষার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছে, সেই জাতিরই প্রাচীন সাহিত্যে দেশ-মাতা ও ভাষা-জননীর স্তব-স্তুতিপূর্ণ তেমন কোন গান বা কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ, সংস্কৃত সাহিত্যে উহার অস্তিত্বের যে আদৌ অভাব, এমন কথাও বলিতে পারি না। লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের এই উক্তি—'নেয়ং স্বর্ণপুরী লংকা রোচতে মম লক্ষ্মণ, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।'—শুনিতে পাই রামায়ণের সংস্করণ বিশেষে আছে। এত স্বল্প কথায় এমন প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি আর কোথাও আছে কিনা জানি না।"[১২৪]

মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় রচিত স্বদেশবন্দনার বিন্দুমাত্র আলোক-সম্পাত একমাত্র ভারতচন্দ্র ব্যতীত আর কোন প্রাচীন কবির কাব্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতচন্দ্র তাঁহার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মর্ত্যলোকের জন্মকথা বলিতে গিয়া ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এই চারটি ছত্র লিখিয়াছেন—

---

১২৪. "বঙ্গ-সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও ভাষাপ্রীতি"—অমরেন্দ্রনাথ রায়, উপক্রমণিকা।

"সপ্তদ্বীপ মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্মের প্রদীপ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্মের বিধান।
সাধ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান"॥

—ইহাতে বঙ্গের ও ভারতবর্ষের যে বন্দনা আছে, তাহা স্বধর্মানুরাগ-জনিত স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি। আসলে ইংরাজের আগমনে ইংরাজের নিকট হইতেই আমরা স্বদেশের ও স্বাধীনতার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে শিখিয়াছি। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী[১২৫] বলিয়াছেন —"নব্যবঙ্গের তিন প্রধান দীক্ষা-গুরুর হস্তে তাঁহাদের দীক্ষা হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাগুরু রামমোহন রায়, দ্বিতীয় দীক্ষাগুরু ডিরোজিও, তৃতীয় দীক্ষাগুরু মেকলে। তিন জনেই তাঁহাদিগকে একই

১২৫. শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রীঃ)। চব্বিশ পরগণায় চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সেবক এবং প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ও লেখক ছিলেন। ইনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ছিলেন। ইনি ছাত্রজীবনে মহাত্মা কেশব সেনের প্রচারিত ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, পরে তাহাতে দীক্ষিত হইয়া ইনি ধর্মসভার একজন উৎসাহী সভ্য হন। ইনি যোগ্যতার সহিত কিছুদিন "সোমপ্রকাশ" পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইনি কয়েকটি স্কুলে যোগ্যতার সহিত শিক্ষকতা করেন। পরে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ায় ইনি 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া নূতন একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং উহার সভাপতি হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ড পর্যটন করিয়া আসেন এবং ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। ইনি যাহা অকপটে বিশ্বাস করিতেন, তাহা সাধারণের মধ্যে অকপটে প্রচার করিতেন। ইঁহার সত্যনিষ্ঠা, সরল বিশ্বাস ও ঐকান্তিকতা অতীব মনোহর ছিল। ইনি বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সেবক ছিলেন। কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস ব্যতীত ইনি 'রামতনু লাহিড়ীর জীবন-চরিত' নামক একখানি উৎকৃষ্ট জীবনী রচনা করিয়া গিয়াছেন। বহু পত্রিকায় ইঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় অসংখ্য প্রবন্ধ বাহির হয়। ইনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন।

খুয়া ধরাইয়া দিলেন—প্রাচীতে যাহা কিছু আছে তাহা হেয়, এবং প্রতীচীতে যাহা কিছু আছে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট"।—ইহা খুবই সত্য। তবে এই শিক্ষা-দীক্ষার ফলে মন্দের সঙ্গে আমরা কিছু ভালও শিখিয়াছি। উদাহরণস্বরূপ 'দেশবাৎসল্যে'র নাম করা যাইতে পারে। ইহার প্রথম ও প্রধান দীক্ষাগুরু—হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিও সাহেব। তিনি জাতিতে ফিরিঙ্গি[১২৬] ও ধর্মে খৃষ্টান হইলেও ভারতকে তাঁহার স্বদেশ বলিয়া মনে করিতেন এবং ভালবাসিতেন।

সত্যই বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের প্রথম স্ফুরণ ঘটিয়াছিল বিপ্লবী ডিরোজিওর ইংরাজী কবিতা 'টু ইণ্ডিয়া মাই নোটিভ ল্যাণ্ড'-এ। কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১২৭] কবিতাটির সূচনা হইল ঃ—

---

১২৬. ফিরিঙ্গি—(পোঃ Francez)। (মুঃ ফরাসী পোর্তুগীজ, ইঃ ইউরোপীয় জাতি)। ইউরোপীয় ও ভারতীয় হইতে উৎপন্ন বর্ণ-সংকর জাতি, ইউরোপীয়।

"ফিরিঙ্গি"—শব্দের অর্থের চমৎকার ইতিহাস আছে। শব্দটির উৎপত্তি যেখান হইতে হউক না কেন, বাঙলায় ইহা আদিতে 'পর্তুগীজ জলদস্যু' অর্থেও ব্যবহার পাওয়া যায়—'জঙলা কাঙলা ফিরিঙ্গি সব বাংলা হ'তে হ'ল দূর' ('সিরাজদ্দৌলা'—গিরিশচন্দ্র ঘোষ)। পার্শিতে 'ফিরিঙ্গি' শব্দে ইউরোপ বোঝায়। বোম্বাই-এ গোয়ার দেশী খৃষ্টানদিগকে 'ফিরিঙ্গি' বলে।

১২৭. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ। ইঁহার দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ উন্নতি হয়। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অনেক দিন পর্যন্ত "তত্ত্ব-বোধিনী" এবং "ভারতী" পত্রিকা ইঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীত এবং প্রবন্ধসমূহ জ্ঞানগর্ভ এবং উপদেশাত্মক।

"স্বদেশ আমার। কিবা জ্যোতিরমণ্ডলী
ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলি"।

ডিরোজিও-র এই কবিতার কথা ছাড়িয়া দিলে সর্বপ্রথম আমাদের কবি ঈশ্বর গুপ্তের কথাই মনে পড়ে। বঙ্গভাষায় তাঁহার রচনাতেই সর্বপ্রথম স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রগাঢ় মমত্ব-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়—

"জাগ, জাগ, জাগ নব ভারত কুমার।
আলস্যের বশ হয়ে, ঘুমাও না আর॥
তোল, তোল, তোল মুখ, খোলরে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত কর রে মোচন।
ভেঙ্গেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে।
এখনো তোমার এত সাধ কেন ঘুমে?"

—ইহা পরাধীনতার জন্য দুঃখানুভূতি নয়, দেশবাসী ফিরিঙ্গি-ভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে, এই বেদনাবোধ হইতেই ইহার উৎপত্তি। তাই কবি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন—

"জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি,
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
মিছে কেন মর ভার বয়ে?
পূর্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্ব রীতি নীতি, অধর্মের প্রতি প্রীতি,
শ্রুতি হয় শ্রুতি পথ হত।

দেশের দারুণ দুঃখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে, ম্লান মুখ মসী ছাঁদে
শোক অশ্রু করে বরিষণ ॥"

—এই বিখ্যাত কবিতাটি স্বদেশপ্রেমের প্রথম বাংলাগান, স্বধর্মানুরাগজনিত দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস। কবিতাটির জন্ম ১২৫৫ সালের ১লা বৈশাখ এবং ইহা "সংবাদপ্রভাকরে" প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতা প্রকাশের প্রায় ছয় বৎসর পরে হরিশ মুখোপাধ্যায়[১২৮] মহাশয়ের "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত হয়। পত্রিকার বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এই বিদ্রোহের ইতিহাস[১২৯] নামে পরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে "এ সময় এদেশে দেশবাৎসল্যের বড় অভাব"। অথচ সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত স্বদেশপ্রেমের যে গান ধরেন, তাহা শুধু অতুলনীয় নয়, অনুপম—

---

১২৮. হরিশ মুখোপাধ্যায়—(১৮২৪-১৮৬১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত দেশসেবক। কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে ইঁহার জন্ম। পিতা রামধন মুখোপাধ্যায়। বিদ্যা-শিক্ষা তেমন না হইলেও ইঁহার ইংরেজী লিখিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। ইনি 'মিলিটারী অডিটর জেনারেল' অফিসে ২৫৲ টাকা মাহিনায় প্রবেশ করেন এবং পরে উহার অ্যাসিস্টাণ্ট মিলিটারী অডিটর হইয়া ৪০০৲ টাকা মাহিনা পান। ইনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামক পত্রিকাখানির পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এই কাগজ লিখিয়াই ইনি প্রমাণ করেন যে, বাঙ্গালী রাজদ্রোহী নয়। ইঁহার শক্তিবলেই দেশে নীলকরদের অত্যাচার কমিয়া যায়। নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখিয়া ইঁহাকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

১২৯. সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতিই সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ এবং মুলরাজের নির্যাতন, ঝিন্দনের নির্বাসন, ছত্রসিংহের অবমাননা, স্বাধীন রাজ্যে হস্তক্ষেপ প্রভৃতি সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ ; ইহাতে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।"

বলা বাহুল্য যে, এই জাগরণের গান প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"এখনকার কয়জন লোক ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ?" ইহাতেই বোঝা যায়, বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের অনির্বাণ দীপশিখা প্রথম প্রজ্জ্বলিত করেন—কবি ঈশ্বর গুপ্ত। হেমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষ্যে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী[১৩০] মহাশয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"তাঁহার পূর্বে কেহ ভারতবিলাপ গায় নাই। তাঁহার পূর্বে কেহ 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়' বলিয়া করুণস্বরে ডাকে নাই। তাঁহার পূর্বে কেহ ভারতকে জননী সম্বোধনে ডাকিয়াছিল কিনা জানি না। তিনি যে স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার পরে সেই স্রোত একটানে বহিয়াছে।"—কথাটি ঠিক নয়। আসলে ঈশ্বর গুপ্তই এই দেশে সর্বপ্রথম "ভারত"কে জননী সম্বোধনে ডাকিয়াছিলেন এবং ভারতের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন—

---

১৩০. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—(১৮৬৪-১৯১৯ খ্রীঃ)। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কান্দির অধিবাসী ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় ইনি প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি ও স্বর্ণ পদকাদি প্রাপ্ত হন। ইনি প্রথমে রিপণ কলেজের অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের সাধনাই ইঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ইঁহার লিখিত কয়েকখানি অতি উৎকৃষ্ট দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধপূর্ণ পুস্তক আধুনিক বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদিগের ইনি অন্যতম ছিলেন। সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলিয়াছেন—"তিনি প্রতীচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধক হইয়াও সেকালের সাবেক চণ্ডীমণ্ডপের খাঁটি বাঙালী থাকিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন।"

"জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?"

—এই উক্তির সমর্থনে অনেক উক্তি বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সুভাষচন্দ্র পর্যন্ত অনেকেই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মত মনোবেদনায় অশ্রু-নির্ঝরের মত এই কথা আর কেহই বলেন নাই। তাঁহার 'ভারতের ভাগ্য বিপ্লব', 'ভারতের অবস্থা', 'ভারত-ভূমির দুর্দশা', 'ভারত-সন্তানের প্রতি' ও 'স্বদেশ' শীর্ষক কবিতাগুলি এই কথারই সাক্ষ্য চিরকাল বহন করিবে। দেশকে স্বদেশ হিসাবে পূজা করিবার প্রথম পুজারী কবি ঈশ্বর গুপ্ত, দেশকে ভালবাসিবার প্রথম প্রদর্শকও তিনি।

কবি ঈশ্বর গুপ্তের পর সমকালীন কবিদের মধ্যে নিধু গুপ্তের কবিতাতেও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়—

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা॥"

কিন্তু স্বদেশ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে যাঁহারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইয়াছিলেন, পরাধীন জাতির কানে স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকই ছিলেন গুপ্তকবির শিষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ—বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল ও মনোমোহন বসুর নাম করা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে রঙ্গলালের[১৩১] নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'পদ্মিনী' উপখ্যান স্বাধীনতার জয়গানে মুখর—

১৩১. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮২৬-১৮৮৭ খ্রীঃ)। বর্ধমান জেলার বাকুলিয়া গ্রামে ইহার জন্ম। ইনি স্বর্গীয় রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই কবিতা-রচনায় ইহার অনুরাগ ছিল। কিছুকাল ইনি 'এডুকেশন গেজেটে'-র সহকারী সম্পাদক এবং 'রসসাগর' নামে একখানি

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে—
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায় ?"

তাঁহার আর একটি কবিতার একস্থানে আছে—

"সার্থক জনম আর বাহুবল তার,
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার।"

—বঙ্গসাহিত্যে এইরূপ প্রেরণা ও উদ্দীপনা ছিল না, এইরূপ স্বাধীনতার গানও শোনা যায় নাই। ১২৫৬ সালে কবির 'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হয়। তাহাতেই এই সব স্বদেশপ্রেমের 'মণিপূর্ণ খনি' আছে। তিনি যে কুমারসম্ভবের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, তাহাও দেশাত্মবোধের প্রেরণায়। তিনি লিখিয়াছেন—"আমরা ভিন্ন দেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা শৃংখলে বদ্ধবিধায়, ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্বে কি ছিলাম, এই ক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্যালোচনাকরণে স্বদেশহিতৈষী মাত্রের মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণ-করণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর বিশেষজ্ঞ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্যকলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে। তন্নিমিত্তে আমি এই মহাকাব্যের অনুবাদ-করণে প্রবৃত্ত হই।" সুতরাং বলা যাইতে পারে—ঈশ্বর গুপ্তের দেশ-ভক্তি শান্ত ও করুণ, রঙ্গলালের দেশভক্তি রৌদ্র ও বীররসের সমন্বয়ে অপূর্ব—Sublime.

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইহার রচিত 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'কাঞ্চীকাবেরী' ও 'শূরসুন্দরী' অতি উচ্চশ্রেণীর কবিতা পুস্তক। ইহা ছাড়া, ইনি 'বিরহবিলাপ' নামক একখানি ইংরাজী কাব্যের অনুবাদ-গ্রন্থ এবং প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক রচনাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে ইনকাম ট্যাক্সের এসেসর ছিলেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন।

স্বাধীনতার জয়গান রঙ্গলালের কাব্যে যেমন সোচ্চার, মধুসূদনের কাব্যে তেমনি অন্তঃসলিল। ইউরোপ গমনকালে জন্মভূমির উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—

"রেখ মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে—
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।
প্রবাসে দৈবের বসে জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে, নাহি খেদ তাহে!
জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে?
চির স্থির কবে নীর, হায়রে জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত হ্রদে।"

—স্বধর্ম ত্যাগ করিলেও স্বদেশের প্রতি মাইকেল মধুসূদনের মমতা ও আন্তরিকতার অভাব ছিল না। জন্মভূমি—নদ-নদী, বাংলার পূজা-পার্বণ, আগমনী-বিজয়া প্রভৃতি সম্পদে পূর্ণ মাতৃভূমির কথা তিনি ভোলেন নাই। বিদেশে থাকিয়াও তিনি আনন্দময়ীর আগমনের কথা বিস্মৃত হন নাই। অশ্রুসজল চক্ষে সকৃতজ্ঞ চিত্তে "বিজয়া"-র কথা স্মরণ করিয়া বলিয়াছেন—

"যেয়ো না রজনী। আজি লয়ে তারা দলে
গেলে তুমি দয়াময়ী। এ পরাণ যাবে,
উদিলে নির্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়ণের মণি মোর নয়ন হারাবে।"

—'পদ্মিনী উপাখ্যান' প্রকাশের তিন বৎসর পরে, কবি মধুসূদনের অমর 'মেঘনাদবধ' কাব্য প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে নয়টি সর্গ আছে, তন্মধ্যে ষষ্ঠ সর্গটি স্বদেশপ্রেমের আকর। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত বাল্মীকির রামায়ণে আছে, মেঘনাদ বিভীষণকে তিরস্কার

করিয়া বলিতেছেন—"তুই যখন আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যের দাসত্ব করিয়াছিস, তখন তুই অতিমাত্র শোচনীয় ও সাধুজনের নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। কোথায় স্বজন-সংস্রব আর কোথায়ই-বা পর-সংস্রব, তুই নির্বোধ বলিয়া এই উভয়ের কত অন্তর তাহা বুঝিতে পারিস না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে ঐ নির্গুণ স্বজন পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পর যে, সে পরই। কৃত্তিবাসের[১৩২] রামায়ণে এই তথ্য নাই। তবে এই ভাবকে কেন্দ্র করিয়া নব-জাগরণের ঢেউ-এ জাতীয়তাবাদকে নূতন রূপ দিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁহার 'মেঘনাদবধ'[১৩৩] কাব্যে। এই কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ বিভীষণকে বলিয়াছেন—

---

১৩২. কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়)—খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে কবি কৃত্তিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ওঝা, মাতার নাম মালিনী, পিতামহের নাম মুরারি ওঝা। কৃত্তিবাসের ছয় ভাই ও এক বৈমাত্রেয় বোন ছিল। তাঁহার জন্ম সম্পর্কে তাঁহারই লেখায় জন্মবার ও তিথির উল্লেখ পাওয়া যায়—

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

—এখানে সনের কোন উল্লেখ নাই। এই কারণে কৃত্তিবাসের কাল সঠিক নির্ণয় করা যায় না।

কৃত্তিবাস বারো বছর বয়সের সময় যান উত্তরদেশে বড়গঙ্গা বা পদ্মাপারে। সেখান হইতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আসেন বাঙ্লার রাজধানী গৌড়ে। পরে পাণ্ডিত্যের দ্বারা গৌড়েশ্বরের অনুরাগভাজন হন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস রামায়ণের অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাস সত্যই 'বঙ্গের অলংকার'।

১৩৩. মেঘনাদবধ কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিস্ময়কর প্রতিভার মৌলিক সৃষ্টি—'মেঘনাদবধ' কাব্য। ইহা মধুসূদনের সৃষ্ট 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে রচিত এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যটি নয়টি সর্গে বিভক্ত এবং ইহার

"—শাস্ত্রে বলে গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পর পর সদা।"

'মেঘনাদবধ' প্রকাশের কয়েক মাস পূর্বে—অর্থাৎ ১২৬৭ সালে দীনবন্ধু মিত্রের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পণ'[১৩৪] প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুর "কোথায় জন্মভূমি শুভ বঙ্গদেশ"—অনেকে হয়ত ভুলিয়া গিয়াছেন,

---

কাহিনী রামায়ণ হইতে লওয়া। কিন্তু কবি ভাবে বা আদর্শে বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের অনুকরণ করেন নাই। তিনি রামায়ণের কাহিনীটুকু লইয়াছেন, চরিত্রসৃজন ও কাব্য-পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নূতন। কবি রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, মেঘনাদকে দেবতা ও রাক্ষসরূপে দেখেন নাই, দেখিয়াছেন মানবরূপে। ফলে মানুষের ক্রোধ, বেদনা, বাৎসল্য, মহত্ত্ব—এইসব মানবীয় বৃত্তির প্রকাশ কাব্যের মধ্যে ঘটিয়াছে। প্রমীলা, সীতা, সরমা ও চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি নিপুণতার সঙ্গে অংকিত হইয়াছে, প্রমীলা কবির সার্থকতম সৃষ্টি। কাব্যে এক দিকে যেমন বীররস, অপর দিকে তেমনি করুণরস সঞ্চারিত হইয়াছে। মধুসূদনের কবিমন একাধারে ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক এবং উভয়ের সমন্বয় ঘটিয়াছে "মেঘনাদবধ" কাব্যে।

১৩৪. নীলদর্পণ—'নীলদর্পণ' (১৮৬০)—নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ আলোড়নকারী ট্র্যাজেডি নাটক। ইহা সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত জীবন-নাটক। কিন্তু মানবহৃদয়ের একটি চিরন্তন আবেদন এই নাটকের ঘটনা-চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হওয়ায় ইহার একটি সাহিত্যমূল্য গড়িয়া উঠিয়াছে। অত্যাচারিত প্রজাসাধারণের প্রতি লেখকের অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। তাই তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলি হইয়াছে জীবন্ত। সমাজেও ইহার প্রভাব অপরিসীম। এই নাটকের আবির্ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল নীলকর-অত্যাচারে পীড়িত বাঙ্‌লা সমাজ। ফলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। নাটকের বিদ্রোহবাণী সাময়িক কালের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া পৌঁছাইল নিত্যকালের দরবারে। নাটকটি হইল মুক্তিকামী জনগণের জীবন-বেদ এবং আধুনিক গণতন্ত্রের অগ্রদূত।

কিন্তু তাঁহার 'নীলদর্পণে' নীলকর-নিপীড়িত প্রজাদের যে বন্ধন হইতে মুক্তি ঘটিয়াছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার গানেও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'নীলদর্পণ' প্রসঙ্গে অমৃতলাল[১৩৫] বসু মহাশয় একবার এক থিয়েটারের বিজ্ঞাপনপত্রে লিখিয়াছিলেন—"নীলদর্পণ কি করিয়াছে? হাতি ঘোড়া এমন কিছু বেশী নয়, তবে বাঙ্গালীর মূর্চ্ছাগত মনকে প্রথমে একটু মনুষ্যত্বের তেজে উদ্দীপ্ত জাগরিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যে বাঙ্গালী দেশের দুঃখে কাঁদিতেছে, 'ভারতবিলাপ' বলিয়া একটু হাত পা নাড়িতেছে, 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের পূর্বে এই অবস্থার কতটুকু অস্তিত্ব ছিল? কই,—১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের পূর্বের খাতা-পত্র দেখিলে এ হিসাব তো তত বেশী জমা দেখা যায় না, যেটুকুও দেখা যায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে নাটকাকারে 'নীলদর্পণ' গ্রন্থের

১৩৫. অমৃতলাল বসু—(১২৬০-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। কলিকাতার প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার। ইনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুবক্তা এবং সুরসিক ছিলেন। কলিকাতার 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সংস্থাপনে ইনি প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইহাতে কিছুকাল অভিনয় করিবার পর ইনি 'বেঙ্গল থিয়েটারে' গমন করেন এবং এবং তাহার কিছুকাল পরে পুনরায় 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ফিরিয়া যান। 'স্টার থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহাতে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ইনি সকল রকম ভূমিকারই অভিনয়ে নিপুণ ছিলেন, তবে হাস্যরসের ভূমিকায় ইনি অদ্বিতীয় অভিনেতা ছিলেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে নির্বাক্ ছায়াচিত্রে ইনি "কৃষ্ণকান্তের উইলে" 'কৃষ্ণকান্তে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইনি প্রথম জীবন হইতেই নাটক-প্রহসনাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'বিজয়বসন্ত', 'হরিশচন্দ্র' ও তরুবালা' এবং 'বিবাহবিভ্রাট', 'অবতার', 'খাসদখল', 'ব্যাপিকা বিদায়', 'যাজ্ঞসেনী', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। শেষ-জীবনে ইনি রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের তত্ত্বাবধানে সময় অতিবাহিত করিতেন। ইনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের পরম ভক্ত ছিলেন।

প্রচারের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"—এই উক্তির মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকিলেও সত্যতা সম্বন্ধে সবাই নিঃসন্দেহ।

ঈশ্বর গুপ্তের পর রঙ্গলাল, রঙ্গলালের পর মধুসূদন ও দীনবন্ধু এবং এই দুই কবির পরেই আমরা হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বদেশপ্রেমের অনুরাগ দেখিতে পাই। 'মেঘনাদবধ' এবং 'নীলদর্পণ'—এই দুই গ্রন্থ প্রকাশের প্রায় চার বৎসর পরে—অর্থাৎ ১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু' কাব্য প্রকাশিত হয়। দেশাত্মবোধই এই কাব্যের প্রধান সুর। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে স্বদেশ-প্রেমের হাওয়া সারা বাঙলা দেশের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল, দেশের প্রাচীন কাহিনী ও ঐতিহ্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও সেই উদ্দেশ্যে একপ্রকার উদ্দীপনা এই সময়কার কবি-সম্প্রদায়কে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। কবিরা ইতিহাসের পাতা হইতে তখন জাতির গরিমা ও গৌরব খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে সেই চেতনা স্থান লাভ করিল এবং একটি নূতন স্বাতন্ত্র্য লইয়া জাগিয়া উঠিল দেশবাসীর সামনে। জাতিকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করিবার জন্য তিনি সৃষ্টি করিলেন—"বীরবাহু কাব্য"। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ন্যায় ইহা ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক আখ্যানমূলক নহে। কাব্যটি একটি মাত্র আখ্যান লইয়া রচিত এবং এই আখ্যান সম্পর্কে কবি নিজেই বলিয়াছেন, "উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোনো ইতিহাসমূলক নহে। পুরাকালে হিন্দু-কুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" গল্পটি কাল্পনিক হইলেও ইহাতে হিন্দু যুবক বীরবাহুর জ্বলন্ত দেশপ্রীতি, তাঁহার বীর্যবত্তা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কথাবস্তুর দিক্ দিয়া কাব্যখানি আধুনিক। কিন্তু শিল্পাদর্শের দিক্ দিয়া প্রাচীনপন্থী।

রঙ্গলালের রচনায় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু স্বদেশবন্দনা

নাই, 'বীরবাহু'তে আছে। ইহার নায়ক জন্মভূমির উদ্দেশ্যে বলিতেছে—

"রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলংকার॥
উচ্চ হিমগিরি চূড়া হিমানী মণ্ডিত।
গর্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথ-রোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি॥
গোমুখী বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবারাত্রি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নর অংশে জন্ম সেই রাম-নারায়ণ।
তোমারে জননী ভাবে করিলা পালন॥
* * *
এবে সেই দেশমাতা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥"

'বীরবাহু' কাব্যে এই দেশভক্তির পরিচয় পাইয়া মনে হয় সেই সময় বঙ্গভাষায় দেশপ্রীতি বা দেশভক্তির গান রচনা যে একেবারে বন্ধ ছিল তাহা নয়। তাই মধুসূদনের বিয়োগের পর বঙ্কিমচন্দ্র এই বলিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন—

"মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক।" সত্যই মধুসূদনের পর হইতে রবীন্দ্রনাথের উদয়কাল পর্যন্ত বাঙলা কাব্যজগতে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ও নবীনচন্দ্র সেনই (১৮৪৭-১৯০৯) বাঙালীর গৌরব, দুই পরম-সমাদৃত কবি।

হেমচন্দ্রের প্রতিভার আর একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি—'বৃত্রসংহার-কাব্য' (প্রথম খণ্ড ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৭৭)। বিপুলায়তন

কাব্যটি চারিটি সর্গে বিভক্ত। কাব্যের আখ্যায়িকা পৌরাণিক, কিন্তু পুরাণকে তিনি যথাযথ অনুসরণ করেন নাই। কিছুটা কল্পনা, কিছুটা ইংরাজী কাব্যের অনুরূপ। কবি মহাভারত হইতে কাহিনী-কাঠামো লইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজ কল্পনাই মূর্ত হইয়াছে। কাব্যটির কাহিনীতে আছে মহত্ত্বের সুর। পশুশক্তির উপর দৈবশক্তির প্রতিষ্ঠা উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—পরাধীন ভারতবাসীর লুপ্ত চৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা। তাই কবি প্রশ্ন করিয়াছেন—'জাগ্রত কি দানবারি সুরবৃন্দ আজ?' কিন্তু এই প্রশ্ন দেবতাদের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় নাই। এই প্রশ্ন ব্যবহৃত হইয়াছিল পরাধীন ভারতবাসীর উদ্দেশ্যেই। কাব্যখানির সমস্ত অংশেই কবি ভারতবাসীকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইবার আবেদন জানাইয়াছেন। রঙ্গলালের কাব্যে যে স্বদেশপ্রেমের ছোঁয়াচ ছিল, হেমচন্দ্রের কাব্যে তাহা অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

মূলতঃ হেমচন্দ্র পরাধীন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছেন—

"আর কি সেদিন হবে জগৎ জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস শুনায়ে মধুর ভাষ
ভারতবাসীর মন নানা রসে তুষিত।।"

তাঁহার 'ভারতবিলাপ', 'ভারত-ভিক্ষা' ও 'ভারত-সঙ্গীতে' পরাধীন জাতির মর্মবেদনা এবং বন্ধন-মুক্তির উদ্দীপনা স্মরণীয় বাণীরূপ লাভ করে—

"বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

শুধু তাহাই নয়, আরও মর্মজ্বালাভরা বিদ্রূপ—যাহা বাঙালীকে বিংশশতকে আত্মবলিদানে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে—

"পরের অধীন দাসের জাতি 'নেশন' আবার তারা।
তাদের আবার 'এজিটেশন'—নরুণ উঁচু করা।"

এই আত্মধিক্কার ও পরাধীনতার পাপ-ক্ষালনের আকাঙ্ক্ষাই নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে'র[১৩৬] মূল সুর। বাংলা দেশের পলাশীক্ষেত্রের আম্রবন আমাদের অতি পরিচিত। বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্যের যে করুণ সুর এই কাব্যে বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর মনকে স্পর্শ করিয়া থাকে। জাতির দুর্ভাগ্যের কথা তীব্র আবেগ ও জ্বালাময়ী ভাষায় কবি প্রকাশ করিয়াছেন—

---

১৩৬. পলাশীর যুদ্ধ—কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। কাব্যখানি নবীনচন্দ্রকে অল্পদিনেই কবিখ্যাতি দান করিয়াছিল। কারণ, তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী কবিদের মত পুরাণ হইতে কাহিনী গ্রহণ করেন নাই। এই পর্যন্ত যাহা দুই-একখানি ইতিহাসাশ্রয়ী কাব্য, নাটক রচিত হইয়াছে তাহা বাঙলার ইতিহাস নয়। বাঙলার ইতিহাসের সঙ্গে তার কোন নিবিড় যোগ নাই—তাহা একান্তপক্ষে রাজপুতনার। নবীনচন্দ্র প্রথম বাংলার ও বাঙালির ইতিহাসকে নিজ কাব্যে স্থান দিয়াছেন। তাই তাঁহার কাব্যের উপাদান হইয়াছে সর্বাংশে বাংলার। পলাশীর মাঠ, আমবাগান, বাংলার নবাব সিরাজ, রাজা রাজবল্লভ—সবাই বাঙালির অতি পরিচিত। কাব্যটির ভাষা সহজ অথচ তীব্র গতিসম্পন্ন। ভাব, ভাষা ও ছন্দের কোথাও জড়তা নাই।

"বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি—
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।"

—এই কাব্যে রাণী ভবানী ও মোহনলালের খেদোক্তিতে কবি-হৃদয়ের বেদনার্তিরই সোচ্চার প্রকাশ। মৃত্যুমুখী মোহনলালের খেদোক্তি তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্যের পরিচয় নির্দেশ করে—

"কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্র কিরণ।
বারেক ফিরিয়া যাও, ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদ রজনী।
কী ক্ষণে উদয় আজি হইলে তপন।
কী ক্ষণে প্রভাত হল বিগত শর্বরী,
আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।"

—মোহনলালের এই খেদ তাহা কবির নিজেরই খেদ, অপর দিকে পরাধীন বাঙালী জাতির খেদ।

বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থান্ধ, নীচতা ও হীনতায় তিনি সাংঘাতিক মর্মপীড়া অনুভব করিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন স্বজাতি-নিন্দা, আত্মকলহ কোনদিনই জাতিকে, দেশকে স্বাধীন মর্যাদা দিতে পারে না, জাতির জীবনে ডাকিয়া আনে সর্বনাশ। তাই এই আত্ম-কলহপ্রিয় জাতিকে তিনি ধিক্কার দিয়া বলিয়াছেন—

"সাধে কি বাঙালি মোরা চিরপরাধীন?
সাধে কি বিদেশি আসি দলি পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন? করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে,

স্বর্গ মর্ত করে যদি স্থান বিনিময়,
তথাপি বাঙালি নাহি হবে একমত,
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জয়।
কার্যকালে খোঁজে সব নিজ নিজ পথ।”

—নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব-কাল ছিল আর্যজাতি বা হিন্দুজাতি পুনরুত্থানের কাল। তাঁহার 'রঙ্গমতী' সেই কালের সেই আশারই রূপায়ণ। তাহা ছাড়া 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'—এই তিনখানি অভিনব কাব্য, যাহাকে 'ত্রয়ী' বলা হয়, তাহা তাঁহার স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক।

কবি নবীনচন্দ্র নব ভাবের নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কাব্য তিনখানিতে আর্য-অনার্যের মিলন ঘটাইয়া একটি অখণ্ড ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এক মহাজাতি-গঠনের মহৎ স্বপ্ন ও ভারতজোড়া হিন্দু-সংস্কৃতির পত্তন কাব্যত্রয়ীর মর্মকথা। তিনি কৃষ্ণকে কল্পনা করিয়াছেন নিষ্কাম ধর্মের ও অখণ্ড মহাভারতের আদর্শ প্রবর্তকরূপে। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখিয়াছিলেন খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতের অখণ্ড ধর্মরাজ্য-সংস্থাপনের বিপুল প্রয়াস। তিনি মহাজাতি গঠনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যের নায়ক হইয়াছেন ভারতনাট্যের সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণ। কবির চোখে শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের নায়ক—মহাভারতের প্রতিষ্ঠাতা। কবি তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে কৃষ্ণের মনুষ্য-জীবনের নানা বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—কৃষ্ণ হইতেছেন একটি জীবন্ত চরিত্র। “রৈবতক কাব্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্র কাব্য মধ্যলীলা, প্রভাসকাব্য অন্ত্যলীলা লইয়া রচিত। রৈবতকে কাব্যের উন্মেষ, কুরুক্ষেত্রে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।” গীতায় প্রকাশিত জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম—এই 'ত্রয়ী'-তে অপূর্ব সমন্বয় লাভ করিয়াছে। কবি চাহিয়াছেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া একটি অখণ্ড মহারাজ্য গড়িয়া তুলিবেন; সেখানে

থাকিবে না কোন জাতিভেদ, ধর্মভেদ, রাজ্যভেদ ; সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইবে সাম্য, প্রীতি, দয়া, ন্যায়। সেইজন্য নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"এক ধর্ম, এক জাতি
একই সাম্রাজ্যনীতি,
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূতহিত।
সাধনা নিষ্কাম কর্ম,
লক্ষ্য যে পরম ব্রহ্ম—
একমেবাদ্বিতীয়ম্ করিব নিশ্চিত,
এই ধর্মরাজ্য, 'মহাভারত' স্থাপিত।"

—তাঁহার এই রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস এই যুগের নূতন মহাভারত। ইহার পরিকল্পনা বিশাল, ভাবাদর্শ মহত্ত্বব্যঞ্জক, লক্ষ্য স্বদেশপ্রেম, ঘটনা বহুধাবিস্তৃত। এক কথায়, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতা-স্পৃহা তাঁহার সকল কৃতিত্বের উৎস। এই উৎস হইতে তাঁহার অধিকাংশ কাব্য উৎসারিত হইয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে ও সঙ্গীতে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল 'হিন্দুমেলা'-র[১৩৭] (১৮৬৭)। ১২৭৩ সালে

১৩৭. হিন্দুমেলা—স্বদেশী মেলা। প্রথমে এই মেলার নাম হইয়াছিল 'চৈত্রমেলা'। কারণ প্রতি বৎসর চড়ক সংক্রান্তিতে হিন্দুরা যখন গাজন উৎসবে বাণফোঁড়া ইত্যাদি আমোদ-অনুষ্ঠান করিয়া অযথা সময় নষ্ট করিত, সেই সময় নবগোপাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দ স্ত্রীশিক্ষা, শিল্পপ্রসার ও গুণীজন-সম্বর্ধনা ইত্যাদির মধ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য এই মেলা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাংলার জতীয় ইতিহাসে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। কারণ ভারতকে 'স্বদেশ' বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এই মেলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার বেলগাছিয়ায় জানকিন সাহেবের বাগানে বাংলা ১২৭৩ সালের (ইং ১৮৬৭) চৈত্র সংক্রান্তির দিন এই মেলা প্রথম বসে।

অর্থাৎ 'বীরবাহু' রচনার প্রায় দুই বৎসর পরে মনীষী রাজনারায়ণ বসু[১৩৮] মহাশয় "শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী-সভা সংস্থাপনে"র উদ্দেশ্যে ইংরেজী ভাষায় একটি প্রস্তাব পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ইহারই ফলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে নবগোপাল মিত্র[১৩৯] কর্তৃক 'হিন্দুমেলা' ও 'জাতীয় সভা' সংস্থাপিত হয়। এই সভার প্রথম অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর[১৪০] রচিত এই গানটি গীত হইয়াছিল—

---

১৩৮. রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ-লেখক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। ইনি ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ইনি ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় বহু উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইঁহার লিখিত রচনাসমূহ লইয়া ভারতে ও ইংলণ্ডে বহুবার বহু আলোচনা হয়। বিদ্যা-সাগর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি বিধবা-বিবাহ প্রচার করিতে থাকেন এবং নিজের দুই ভ্রাতাকে বিধবা-বিবাহে প্রবৃত্ত করেন। ইনি সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরেজী শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া প্রায় দুই বৎসরকাল প্রশংসার সহিত উক্ত কার্য করেন। অতঃপর ইনি মেদিনীপুর স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষ জীবনে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ইনি বৈদ্যনাথে গমন করেন এবং মৃত্যুদিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন। ইনি মাইকেল মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন। ইনি একজন স্বনামখ্যাত পণ্ডিত, দেশকর্মী এবং সমাজসেবক ছিলেন। ইনি সঞ্জীবনী সভার সভাপতি ছিলেন।

১৩৯. নবগোপাল মিত্র—প্রখ্যাতনামা সাংবাদিক এবং হিন্দুমেলার কর্মকর্তা ছিলেন। ইঁহার সম্পাদিত পত্রিকাখানির নাম ছিল—'ন্যাশনাল পেপার'। প্রথম যুগে যে কয়েকজন ব্যক্তি দেশবাসীর মনে জাতীয় ভাব উন্মেষের চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, নবগোপাল মিত্র তাঁহাদের মধ্যে একজন।

১৪০. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠাগ্রজ। ইঁহার দ্বারা আদি ব্রাহ্ম-সমাজের বিশেষ উন্নতি হয়। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। অনেকদিন পর্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী' এবং 'ভারতী' পত্রিকা ইঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

"মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত, তোমারি।
রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচন-বারি॥
চন্দ্র জিনি কান্তি নিরখিয়ে ভাসিতাম আনন্দে।
আজি এ মলিন মুখ কেমনে নেহারি।
এ দুঃখ তোমার হায় রে, সহিতে না পারি॥"

—এই গানটি পরবর্তী কালে "ভারতমাতা" নামে ক্ষুদ্র নাট্য-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। এই 'হিন্দুমেলা' উপলক্ষ্যে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত "লজ্জায় ভারতযশ গাহিব কি করে" গানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। আর 'হিন্দুমেলা'-র দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮) গীত হইয়াছিল সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের[১৪১] রচিত সেকালের সুবিখ্যাত গানটি—

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং কিছুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ইঁহার রচিত সঙ্গীত এবং প্রবন্ধসমূহ জ্ঞানগর্ভ এবং উপদেশাত্মক।

১৪১. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের 'মেজদাদা' সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (জন্ম ১৮৪২ খ্রীঃ—মৃত্যু ১৯২৩ খ্রীঃ)। ইনিই প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ভারতীয় স্ত্রীলোকের পর্দাপ্রথা-নিবারণের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই প্রথম আধুনিক ধরনে বাঙালী মেয়েদের শাড়ী পরার রীতি প্রচলন করেন। ইঁহার কন্যা ইন্দিরাদেবী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর (বীরবলের) পত্নী। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছেন। ইনি বোম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়া ১৮৯৬ খ্রীঃ শোলাপুরের সেসন জজ হন। 'আমার বাল্যকথা' ও 'বোম্বাই প্রবাস' ইঁহার লিখিত গ্রন্থ।

"মিলে সব ভারত সন্তান
একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
*　　*　　*
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়,
কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়॥"

—'হিন্দুমেলা'য় এই গানটি গীত হইবার পর ইহা সকলের মনে প্রচুর উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পর্কে 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছিলেন—"এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-নর্মদা-গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক। পূর্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।" সত্যই জাতীয় সঙ্গীতের ইতিহাসে এই সঙ্গীতটির মূল্য অপরিসীম। সমসাময়িককালে আর যে গানটি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে, তাহা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের[১৪২] রচিত—

---

১৪২. দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৬—১৮৯৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত কবি। ঢাকা জেলার মাগুরখণ্ড গ্রামে ইঁহার জন্ম। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গঙ্গোপাধ্যায়। ইনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। "না জাগিলে সব ভারত ললনা" গানটি ইঁহার রচিত। 'অবলা-বান্ধব' নামক একখানি মাসিক পত্র ইনি প্রকাশ করেন। ইঁহারই প্রচেষ্টায় কলিকাতায় 'হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়' ও 'ভারতসভা' স্থাপিত হয়। ইনি পরে ব্রাহ্ম হন। 'কবিগাথা'

"না জাগিলে সব ভারতললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।

*　　*　　*

তোরা না করিলে এ মহাসাধনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা॥"

—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকাশলাভ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময় বাঙ্গলার প্রত্যেক সাহিত্যিকের অন্যতম ব্রত হইয়াছে স্বদেশপ্রেম-প্রচার। ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃতবিদ্য মনীষীদের স্বদেশপ্রেম লোকশিক্ষা-প্রচারে অভিব্যক্ত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ ইত্যাদি মনীষীরা স্বদেশপ্রেমিক লোকশিক্ষক। ইঁহাদের রচিত প্রবন্ধে নানাভাবে স্বদেশপ্রেমের মহিমাই কীর্তিত হইয়াছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়[১৪৩] স্বদেশপ্রেম বলিতে বুঝিতেন—স্বদেশের ধর্ম ও

ও 'কবিতাকুসুম' ইঁহার লিখিত কাব্যগ্রন্থ এবং 'সুরুচির কুমীর' ইঁহার লিখিত উপন্যাস।

১৪৩. ভূদেব মুখোপাধ্যায়—(১৮২৫—১৮৯৪ খ্রীঃ)। জন্মস্থান কলিকাতা, পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। মাইকেল মধুসূদন ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় ইঁহার একবার ধর্মান্তর-গ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু পিতার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ইনি সেই সংকল্প ত্যাগ করেন এবং নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় জীবন যাপন করেন। ইনি মাসিক ৫০্ টাকা বেতনে সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ক্রমে উন্নতিলাভপূর্বক বিদ্যালয়-পরিদর্শকের পদ লাভ করেন। কিছুকাল ইনি বঙ্গের Director of Public Instruction ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন এবং পরবৎসর সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'পুষ্পাঞ্জলি' ও বিদ্যালয়-পাঠ্য 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'পুরাবৃত্তসার', 'ইংলণ্ডের ইতিহাস'

সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। ১২৭৫ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বয়ং 'এডুকেশন গেজেটের' পরিচালনভার গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু ও বাল্য সহপাঠী রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে স্বদেশপ্রেম জাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"আর্য-বংশীয়দিগের চক্ষুতে বাহান্ন পীঠ সমন্বিত মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ"। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন—"ভারতবাসী 'জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়' বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না, পরজাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি-বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটি মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।"

মূলতঃ স্বদেশপ্রেমের প্রথম অভিব্যক্তি বিদ্রোহী ডিরোজিও-র কবিতায়, কবি ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় তাহার ভাবসঞ্চার, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়[১৪৪] পর্যন্ত তাহার ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য।

এবং 'রোমের ইতিহাস' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কিছুকাল ইনি 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদনা করিয়াছিলেন। ইনি স্বোপার্জিত অর্থদ্বারা স্থাপিত পিতার নামে 'বিশ্বনাথ ট্রাস্ট ফাণ্ড' হইতে চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং পিতা ও মাতার নামে 'বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী' ও 'ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়' স্থাপন করেন।

১৪৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়)—(১৮৬৩-১৯১৩ খ্রীঃ)। কবি ও নাট্যকার। কৃষ্ণনগরে ইঁহার জন্ম। পিতা দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায়। ইনি সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। সেখানে হইতে ফিরিয়া ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইঁহার নাটক, স্বদেশ-সঙ্গীত ও হাসির গান বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'হাসির গান', 'আষাঢ়ে', 'ত্র্যহস্পর্শ', 'মেবারপতন', 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'পুনর্জন্ম', 'পরপারে' প্রভৃতি ইঁহার রচিত

কিন্তু এই স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'[১৪৫]। তাঁহার ১২৭৯ সালে রচিত 'বন্দে মাতরম্' গান আনন্দমঠের মেরুদণ্ড। বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে ইহা এক অপূর্ব স্বর্গীয় সংগীত। ইহার লক্ষ্য বঙ্গভূমি—ভারতভূমি নয়, তথাপি ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করিয়া ইহার প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে, প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট ইহা ছিল এক মহামন্ত্র। বঙ্কিমের পূর্বে আর কেহ বঙ্গভূমির উদ্দেশ্যে বা ভারতভূমির উদ্দেশ্যে এইরূপ স্তবস্তুতি বন্দনা করেন নাই। এই "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি বন্ধ করিবার জন্য ইংরাজের শাসনযন্ত্র যত সক্রিয় হইয়াছিল, ততোধিক অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল স্বদেশপ্রেমিকরা। বাহুতে শক্তি ও হৃদয়ে ভক্তি লইয়া স্বদেশপ্রেমিকরা 'জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' হইয়া পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে অগ্রসর হইয়াছে, 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' অতিক্রম করিয়াছে এবং ফাঁসির মঞ্চে গাহিয়া গিয়াছে 'জীবনের জয়গান'। সে কী উদ্দীপনা! সে কী আলোড়ন!

পুস্তক। ইংরাজীতে ইনি 'Lyrics of Ind' ও 'Crops of Bengal' নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। 'পূর্ণিমা-মিলন' নামক সাহিত্যিকদের সম্মেলন এবং 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা।

১৪৫. আনন্দমঠ—১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। ইহার সন্তানধর্ম পরাধীনতার বন্ধন-মোচনের একটি পরিকল্পিত সাধনার পথ-নির্দেশ। তাই ইহাতে উপন্যাসের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নাই। ইহা যেন কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি। উত্তরবঙ্গে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ঘটনার উপরে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীটি গড়িয়াছেন বটে, কিন্তু উপন্যাসে যে চিত্রগুলি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা সবই কাল্পনিক। দেশের উন্নতির কাজে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে নিজের সুখ-দুঃখ উপেক্ষা করিয়া গীতায় উপদিষ্ট নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করিতে হইবে, ইহাই 'আনন্দমঠে'র মর্মবাণী। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' গানটি ইহাতে সন্নিবেশিত আছে।

সে কী জাগরণ! এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া 'হিতবাদী'-র কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ[১৪৬] গান লিখিয়াছিলেন—

"মাগো, যায় যেন জীবন চ'লে
শুধু্ জগৎ-মাঝে তোমার কাজে
'বন্দেমাতরম্' বলে
* * *
আমায় বেত মেরে কি 'মা' ভোলাবে?
আমি কি মা'র সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি, বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যদি সাহিত্য দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন করা যায় না মনে করিতাম, তাহা হইলে আমি 'আনন্দমঠ' লিখিতাম না। আমার বিশ্বাস, আমার 'আনন্দমঠে' স্বদেশের একদিন উপকার সাধিত হইবে।...[১৪৭]

---

১৪৬. কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—বাঙ্গালা সংবাদপত্র-জগতে ইঁহার নাম সুপরিচিত। কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুরে ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বারো বৎসর কাল 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন', 'এন্টি-ক্রিস্টিয়ান', 'কস্‌মোপলিটান' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ইনি সঙ্গীত ও কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। সমালোচক হিসাবে ইনি নির্ভীক ছিলেন। 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রুচিবিকার' নামক একটি পদ্যময় প্রবন্ধের জন্য ইঁহার বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আনীত হয়। এই অভিযোগের ফলে ইনি কারাভোগ করেন। স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য ইনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। জাপান হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজে ১৯০৭ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

১৪৭. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় লিখিত "আনন্দমঠ ও স্বদেশপ্রেম"—বঙ্গদর্শন, ১৩১৩।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভবিষ্যদ্বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন। এই স্বদেশী আন্দোলন হইতেই বাঙ্গালী "বন্দেমাতরম্"-কে 'মন্ত্র' এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলিতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ[১৪৮] যথার্থ

---

১৪৮. রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮—১৯২৫ খ্রীঃ)। কলিকাতা নিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণের পুত্র। ইনি একজন প্রসিদ্ধ দেশসেবক ও খ্যাতনামা বাগ্মী ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে আসিয়া শ্রীহট্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু আদালতের নথিপত্র নষ্ট করার অজুহাতে ইঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হয়। ইহার পর ইনি কলিকাতার কয়েকটি কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্যে ব্রতী হন। পরে ১৮৮২ খ্রীঃ সুপ্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি 'বেঙ্গলী' পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন ও উহার সম্পাদনা করেন। ইনি সাধারণের হিতার্থে কয়েকটি নবপ্রবর্তিত আইনের বিরোধিতা করেন। লিটনের সংবাদপত্র দমনমূলক আইন তন্মধ্যে অন্যতম। ১৮৭৬ খ্রীঃ ইনি 'Indian Association' প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহুদিন উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ইনি মিউনিসিপ্যাল সভায় প্রবেশ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ মতবিরোধ হওয়ায় ইনি অপর ২৭ জনের সহিত উহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিরূপে ইনি আইন-সভায় প্রবেশ করেন এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ নূতন মিউনিসিপ্যাল আইনের বিরোধিতা করেন। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনের ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ১৮৯৫ খ্রীঃ পুণা অধিবেশনের ইনি সভাপতি হন। ১৯০২ খ্রীঃ অষ্টাদশ অধিবেশনে (আমেদাবাদে) ইনি পুনরায় সভাপতি হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি রয়্যাল কমিশনে যে সাক্ষ্য দেন, তাহাতে ইঁহার গভীর রাজনীতিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলনে ইনি একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ বরিশালে ঐ আন্দোলন উপলক্ষে ইনি ধৃত হন, কিন্তু হাইকোর্টে ইঁহার দণ্ডাজ্ঞা রহিত করা হয়। ইনি ১৯০৯ খ্রীঃ 'Press Conference' উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডে যান। ইনি চিরকাল নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার সহিত বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়া জনমত প্রচার করিয়া

বলিয়াছেন যে, "ইহার গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে"।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রসঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'A Nation is Making' নামক বিখ্যাত গ্রন্থের একস্থানে 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সারমর্ম এই যে, "পূর্ববঙ্গের নব-গঠিত শাসন-বিভাগ কর্তৃক যখন ঘোষিত হয়—জনসাধারণের নিকট 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, সে সময়ে এই নিষিদ্ধ ধ্বনি সমগ্র ভারতের জাতীয় সম্পদে পরিণত হইয়াছিল এবং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া কোথাও মিলিত হইলে প্রত্যেকের মুখেই তখন এই ধ্বনি শুনা যাইত। ইহা বাংলা সঙ্গীত হইলেও এত সংস্কৃতবহুল যে ভারতের যে-কোন স্থানের শিক্ষিত ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারে। ইহার সুন্দর শব্দ-বিন্যাস, মধুর ছন্দ এবং সর্বোপরি গভীর স্বদেশানুরাগ ইহাকে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত করিয়াছে।"

সত্যই 'যা কিছু স্ববশে, তাই তো স্বদেশ'। আর এই স্বদেশ-প্রীতিই—স্বদেশপ্রেম। তাই 'স্বদেশ-প্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত' বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিতেন। এই সময় 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'আর্যদর্শন' নামক মাসিক পত্রদ্বয়ের উপরও 'বঙ্গদর্শনে'র বিলক্ষণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তাহা ছাড়া, সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার[১৪৯]

আসিয়াছেন। ১৯২০ খ্রীঃ ইনি বাংলা গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন' প্রবর্তিত হন।

১৪৯. অক্ষয়চন্দ্র সরকার—(১৮৪৬—১৯১৭ খ্রীঃ)। জন্মস্থান হুগলী জেলার চুঁচুড়া। ইঁহার পিতা রায় বাহাদুর গঙ্গাচরণ সরকার সাবজজ ছিলেন। ইনি ১৮৬৩ খ্রীঃ হুগলী কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৮ খ্রীঃ বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চারি বৎসর বহরমপুরে ব্যবহারজীবীর কার্য করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ইহার বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। তাঁহার

যে সহজ-সরল-সুন্দর সতেজ গদ্যে স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচার করিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার 'দশমহাবিদ্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতমাতারই চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাই। রামেন্দ্রসুন্দর এই বিষয়ে বলেন—"সমস্ত ভারতভূমি যে আমাদের জননী, সমস্ত ভারতকে যে আমাদের 'মা' বলিয়া ডাকিতে হইবে, এই ভাব ও নির্দেশ আমরা 'দশমহাবিদ্যা' হইতে পাই। অক্ষয়বাবু উক্ত 'দশমহাবিদ্যা' প্রবন্ধে ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস দিয়াছিলেন। 'দশমহাবিদ্যা' ভারতের দশটি অবস্থা।" অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের এই 'দশমহাবিদ্যা'র নিকট কমলাকান্তের[১৫০] 'দুর্গোৎসব' ভাবের হিসাবে ঋণী কিনা কে বলিবে?

'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ইঁহার প্রবন্ধ এবং সমালোচনাসমূহ প্রকাশিত হইত। ইনি 'সাধারণী' নামক রাজনীতি-বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার এবং 'নবজীবন' নামক ধর্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইনি কবিকঙ্কণ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের পদাবলী সংগ্রহ করিয়া 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইঁহার রচিত 'কবি হেমচন্দ্র', 'মহাপূজা', 'সনাতনী', 'গোচারণের মাঠ', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি ইঁহার অপূর্ব প্রতিভার পরিচয় বহন করিতেছে। ইনি বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত উহার সদস্য ছিলেন। ইঁহার পত্নীও পরমা বিদুষী এবং অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহাকে ইনি 'অসাধারণী' নাম দিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র ধার্মিক, প্রতিভাবান, তেজস্বী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন।

১৫০. কমলাকান্তের দপ্তর—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'কমলাকান্তের দপ্তর' একটি রসরচনামূলক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। গ্রন্থখানি ডি-কুইন্স রচিত গ্রন্থের অনুসরণে রচিত—তবে ইহার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। এই গ্রন্থের রচনাগুলি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের ছদ্মনাম। কমলাকান্ত আফিঙ খাইত, কিন্তু আফিঙের ঝোঁকেই সে যে-সব কথা বলিয়াছে, তাহা দিব্যদৃষ্টি লাভ না করিলে বলা যায় না। ফলে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' যে

তাঁহার প্রথম জীবনে লিখিত 'ভারতবর্ষ' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ কবিতার এক স্থানে আছে—

"সিন্ধু হতে ব্রহ্মপুত্র হিন্দুস্থানভূমি,
অবস্মৃত অগণিত বীরপ্রসূ তুমি।
স্বাধীনতা-দেবী ছিলে সুখ পীঠস্থান,
গৌরব কবর এবে অসুখ আধান,
আর্যলোক বাস বলি আর্যাবর্ত্ত নাম,
তব গরিমার বুঝি এই পরিণাম!"

এই ধরনের দেশাত্মবোধক রচনা তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাধারণী'তেও প্রকাশিত হয়। বাংলা সংবাদপত্রের রাজ্যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোমপ্রকাশ'- অবশ্য এই বিষয়ের অগ্রদূত। তবে 'সাধারণী'-ই সর্বপ্রথম এই বিষয়টি সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরেন। ১২৮৩ সালের 'বান্ধব' নামক মাসিক পত্রে নবীনচন্দ্রের 'শবসাধন' শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হইলে অক্ষয়চন্দ্র তাঁহার 'সাধারণী'তে লিখিয়াছিলেন—"এক মাস হইল, আমরা 'সাধারণী'তে বলিয়াছিলাম যে, এখন ভারত যেরূপ বিপন্ন, যেরূপ রোগগ্রস্ত, শব-সাধন ব্যতীত এ রোগের প্রতিকারের অন্য উপায় নাই। আমরা আহ্লাদিত হইলাম যে, সেই কথাগুলি নবীনচন্দ্রের উদ্দীপ্ত পদ্যে প্রদীপ্ত হইয়াছে।" কবি বলিতেছেন—

ব রচনা স্থান পাইয়াছে, তাহা বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থে সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয় অতি সংযত ও রুচিপূর্ণ ব্যঙ্গের আবরণে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের সর্বত্র তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশপ্রীতির সুরটি শোনা যায়।

"ভারত সন্তান। দেখ না মাতার
লোল জিহ্বা শুষ্ক শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বামকর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতের হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি' বিদারণ
করে জননীর পিপাসা নিবারি
ভারত শ্মশানে শক্তি-আরাধন।"

এই 'ভারত শ্মশানে শক্তি-আরাধনা' যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গভাষায় স্বদেশ ও বিদেশের দেশভক্তগণের জীবন-কথা লিখিয়া দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। যে ভাব-প্রণোদিত হইয়া তিনি এই দুরূহ কার্য করিয়াছিলেন, তাহা দেশপ্রেমেরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি লিখিয়াছিলেন, "যে উপাদান-সামগ্রীতে জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, তাহার মধ্যে জননী জন্মভূমির চরণে আত্মবলিপ্রদান সর্বপ্রধান। যখন অধিকাংশ ভারতবাসী জননী জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিবেন, তখন দেবীপ্রসাদে ভারতবাসীর চরণ হইতে বৈদেশিক শৃংখল আপনিই উন্মুক্ত হইবে। ইতালীবাসীরাও বহুদিনের দাসত্বে জাতীয় জীবন ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ বিশ্বাসশূন্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহুকালব্যাপিনী অধীনতায় তাঁহারাও জাতীয় অভিমান ভুলিয়া বৈদেশিক গোলামিতে বিশেষ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহারাও স্বদেশের জন্য ও স্বজাতির জন্য বিন্দুমাত্রও আত্মত্যাগ করিতে পারিতেন না। এই জন্য পদে পদে তাঁহাদিগকে বৈদেশিক চরণে প্রণত হইতে হইত। তখন ইউরোপীয় সমাজে তাঁহারা নগণ্য ও ঘৃণাস্পদ ছিলেন। কিন্তু সেই ইতালিই আবার ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার উদ্দীপনায়

জন্মভূমির চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে শিখিল, তখন বৈদেশিক শৃঙ্খল অনায়াসেই ইতালিয়গণের চরণ হইতে উন্মুক্ত হইল। যে যে প্রাতঃ-স্মরণীয়-চরিত মহাত্মাগণের নিরন্তর যত্নে ও আত্মোৎসর্গের মোহিনী শক্তিতে দাসত্ব-প্রপীড়িত জাতিসকল আত্মস্বার্থ ভুলিয়া জন্মভূমির চরণে আত্মবিসর্জন করিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদিগের জীবিত মালা জাতীয় ভাষায় গ্রথিত করা আমার জীবনের একটি ব্রত। সেই সকল জীবনের বলবতী উদ্দীপনায় যদি একজন ভারতবাসীও জন্মভূমির চরণে জীবন উৎসর্গ করিতে শিখেন, যদি একজনও আত্মস্বার্থ জাতীয় স্বার্থে বলিদান করিতে শিখেন, যদি সেই সকল জীবনের মোহিনী শক্তিবলে দুইজন ভারতবাসীও ভারতের মঙ্গলোদ্দেশে সমবেত হইতে শিখেন—তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব।"

যদিও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্যসন্দর্ভ' নামক মাসিকপত্র দুইখানিতে ইতিপূর্বে কয়েকজন দেশপ্রেমিকের জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি উহাতে স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতি-বাৎসল্যের বিশেষ অনুভূতি না থাকায় যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য।

ইহার পর আসে রজনীকান্ত গুপ্তের[১৫১] নাম। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি 'আর্য্যকীর্তি', 'ভারতকাহিনী', 'বীরমহিমা' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' পড়িয়া

---

১৫১. রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯—১৯০০ খ্রীঃ)। রজনীকান্ত বঙ্কিমযুগের লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের ছয় বছর পর ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে তাঁহার জন্ম; মৃত্যু হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পাঁচ বছর পরে। ছাত্র-জীবনেই কবিতা রচনায় তাঁহার দক্ষতা জন্মিয়াছিল এবং তাঁহার 'জয়দেবচরিত' এই সময় রচিত হয়। 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস', 'আর্যকীর্তি', 'বীরমহিমা', 'ভারত-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য, আর পরম লক্ষ্য—স্বদেশপ্রেম।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলিয়াছিলেন—"সত্যের প্রতি অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি অনুরাগ, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠে ব্যক্ত দেখিতে পাইলাম।"

রজনীকান্তের গ্রন্থগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে স্কুলপাঠ্য, কিন্তু ভাল করিয়া পড়িলে দেখা যাইবে ইহাতে সঞ্চারিত হইয়াছে স্বাধীন জাতীয়তাবাদী মনোভাব। তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছেন—"স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না।" দ্বিতীয়তঃ বলিয়াছেন—"মনোযোগের সহিত স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে বৃটিশ রাজনীতির কৌশল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই"; এবং তৃতীয়তঃ—"ইতিহাস পড়া উচিত বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক লোকের হাতে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অনুশীলন কর্তব্য নহে।"[১৫২] সর্বশেষেরটির দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি সিরাজদ্দৌলার ঘটনা আলোচনা করিয়াছেন, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন শিখ যুদ্ধের এবং অযোধ্যাধিকারের। এই মনোভাবটি আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বিস্তার লাভ করে। রজনীকান্তের রচনাগুলির পশ্চাৎপটেও ছিল এই মনোভাব এবং ইহার সূত্রপাত হয় 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায়। তাঁহার সামনে ছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েব স্মরণীয় নেতৃত্ব এবং জ্বালাময়ী বক্তৃতা। নবস্থাপিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় রজনীকান্তের শেষ জীবনে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার বিভিন্নমুখী অনুসন্ধিৎসার দৃষ্টান্ত।

এই সময় বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরও দুইজন শক্তিশালী লেখকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, যাঁহাদের নাম যথাক্রমে রমেশচন্দ্র

১৫২. ভারত-কাহিনী—'ভারতের ইতিহাস'।

দত্ত[১৫৩] এবং ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রমেশচন্দ্র প্রথম যৌবনে ভারত-উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষায় গান ধরেন—

"Is this the land of ancient pride
Where Freedom lived, where heroes bled ?"
ইত্যাদি

—ভারতবর্ষের এই মহিমা-গীতি ইংরেজ কবির 'Rule Britannia'-র ন্যায় স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস বটে, কিন্তু এই উভয় উচ্ছ্বাস একই উদ্দেশ্যে, ঠিক একই অনুভূতিজাত নয়। একটি নিদ্রিত জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য লিখিত। অন্যটি জাগ্রত জাতিকে জাগাইয়া রাখিবার গান। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "বঙ্গদর্শনে" একবার বলিয়াছিলেন—"যে জাতির পূর্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য-রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃ প্রাপ্তির চেষ্টা করে"। —ভারতবাসী পূর্ব মাহাত্ম্য হারাইয়াছে, কিন্তু তাহার ঐতিহাসিক স্মৃতি আছে। এই স্মৃতি-চারণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া রমেশচন্দ্র

১৫৩. রমেশচন্দ্র দত্ত—(১৮৪৮—১৯০৯ খ্রীঃ)। কলিকাতার অন্তর্গত রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্ত বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম—ঈশানচন্দ্র দত্ত। আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি শাসন-বিভাগের কার্যে নিযুক্ত হন এবং শেষে বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হন। ইনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী ছিলেন। ইঁহার লিখিত 'মাধবীকঙ্কণ', 'বঙ্গবিজেতা', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' প্রভৃতি পুস্তক বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। 'Civilisation of Ancient India' ইঁহার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি ঋগ্বেদের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। চাকরি হইতে অবসর লইবার পর ইনি কিছুদিন লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রথম সভাপতি হন। সরকার ইঁহাকে সি. আই. ই.—উপাধি প্রদান করেন। শেষ জীবনে বরোদারাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন।

'ছত্রপতি শিবাজী' ও রাণা প্রতাপের জীবনকথা লইয়া 'জীবনপ্রভাত' ও 'জীবনসন্ধ্যা' নামে দুইখানি দেশাত্মবোধক উপন্যাস রচনা করেন।

এইবার ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে আসা যাক। কবি হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্র। তিনিও হেমচন্দ্রের মত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া 'কি লিখিব আজ—', 'স্বভাবে কি অর্থ নাই', 'এক অত্যাচারী ইংরাজের প্রতি' প্রভৃতি স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা লিখিয়াছিলেন। 'রাণা প্রতাপ সিংহ' যখন নিরুপায় হইয়া আকবরের নিকট সন্ধিপত্র প্রেরণ করেন, তখন পৃথ্বীরাজের রাজপুত বন্ধুবর্গ এই উপলক্ষ্যে তাঁহাকে একটি আক্ষেপপূর্ণ কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁহাদের কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই কল্পনা করিয়া ঈশানচন্দ্র 'কি লিখিব আজ—' নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তাহা বঙ্গসাহিত্যে যে দুর্লভ, এইখানে তাহার কিয়দংশ উল্লেখ করিলেই বোঝা যাইবে।—

" 'লিখ লিখ' বল, কোথায় লিখিব।
এ তীব্র যাতনা কোথায় ঢালিব।
লিখিতাম,—যদি মাতঃ আর্য্যভূমি,
সে অক্ষর বুকে ধরিতে মা তুমি।
লিখিতাম,—যদি আর্য্যের সন্তান,
তোমাদের প্রাণে দিতে তার স্থান।

* * *

বঙ্গভূমি তার কর দরশন,
যবনিকা ওই করি উত্তোলন—
দাঁড়ায়ে প্রতাপ একা নিঃসহায়
সে কাব্য পড়িতে যদি সাধ যায়,
হও অগ্রসর দলে দলে দলে—
লিখি মহাকাব্য মহা কুতূহলে।"

—এইভাবে কাব্যে সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের যেমন জোয়ার আসিয়াছে, তেমনি আসিয়াছে স্বভাব-সিদ্ধ বাগবিভূতির গুণে নিদ্রিত অধঃপতিত জাতিকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা। এই চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন—পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। বঙ্কিমের "বঙ্গদর্শনে"র যুগে তিনি একজন বক্তারূপে, প্রচারকরূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ১২৮২ সালে তাঁহার একটি বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি বলেন—"যে ভারতের উত্তর ভাগে গগনমণ্ডল ভেদ করিয়া হৃদয়ে অমূল্য রত্নমালা ধারণ করিয়া, নির্মল নীরপ্রবাহ নদ-নদী নিঃসারিত করিয়া হিমাচল অটলভাবে দণ্ডায়মান, যে ভারতের পূর্ব-পশ্চিমে মহারোল কল্লোল-তরঙ্গ-ভঙ্গমালায় আস্ফালনপূর্বক পার্ষদরূপে উপসাগরদ্বয় বিরাজমান, রত্নাকর মহাসাগর যে ভারতের নামে স্বয়ং নাম ধারণ করিয়াছে ও দক্ষিণভাগে উত্তাল তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে যে ভারতের পদ প্রক্ষালন করিয়া দিতেছে, স্বাভাবিক শৃঙ্গমালা যে ভারতকে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্যন্ত লোকচিত্ত-বিনোদন-বিহার ভূমি করিয়া রাখিয়াছে, শিক্ষা ও সভ্যতার কিরণমালা যে ভারতের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল ও উদ্ভাসিত করিয়াছে, শক্তি ও সামর্থ্যবলে যে ভারত 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া ইতিহাসে অভিহিত হইয়াছে, আজ সেই ভারতবাসী আপনার তত্ত্ব ভুলিয়া, আপনার দেশ, আপনার জাতীয়তা, আপনার কুল-মান-মর্যাদাকে তাচ্ছিল্য করিয়া, আপনার শিক্ষা ও দীক্ষা, আপনার অভ্যুদয় ও মহত্ত্ব, আপনার অতুল ঐশ্বর্য, আপনার অতুল বলবীর্য, আপনার স্বর্গীয় ধৈর্য ও শৌর্য, আপনার তপোধার্যসম্ভূত জ্ঞান-গাম্ভীর্য বিস্মৃত হইয়া, পরের কথায় আপনাকে কাঙ্গাল, পরের কথায় আপনাকে সর্বাপেক্ষা হীনবীর্য জানিয়া, পরের কথায় আপনাকে অমানুষ বোধ করিয়া, পরের কথায় আপনাকে অসভ্য ও অশিক্ষিত জ্ঞান করিয়া, পরের কথায় আপনাকে ধর্মহীন, কর্মহীন, বনের পশু অপেক্ষাও জ্ঞানহীন বিশ্বাস করিয়া, নিজ উন্নতির

জন্য সমুদ্রপারে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। আপনাকে না জানিয়া হতভাগ্য ভারত আজ দুঃখের পরাকাষ্ঠার পদসেবা করিতেছে।"

॥ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও গোবিন্দদাস ॥

এইভাবে স্বদেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভারতপথিক বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার রচনায় জাতীয় ভাব উদ্দীপনার যে উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অমূল্য। মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে যে প্রাণ-ভরা ভালবাসা, যে হৃদয়স্পর্শী উক্তি, যে প্রগাঢ় ভক্তি, যে নিঃশেষ আত্মদান ও যে নিঃসংকোচ আত্মীয়তা তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট, তাহা শুধু অতুলনীয় নয়, অনুপম। তিনি বলিয়াছেন—"হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই ; বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী। বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ"। ইহা প্রকৃত দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি। "সকল ধর্মের উপরে স্বদেশ-প্রীতি"— এই কথা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে প্রথম শুনাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দও অনেকটা এইভাবের ভাবুক, এই মন্ত্রের দ্রষ্টা। দেশবাসীর প্রতি তাঁহার প্রধান উপদেশ—"এক্ষণে অন্ততঃ পঞ্চাশৎ বর্ষ ধরিয়া সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন, অন্যান্য অকেজো দেবতাগণকে এই কয়েক বর্ষ ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন—এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত—সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার, তিনি সকল ব্যাপিয়া

আছেন।...তোমার চতুর্দিকে যে দেবতাকে দেখিতেছ, সেই বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সক্ষম হইবে, তখন অন্যান্য দেবতাকেও পূজা করিতে তোমার ক্ষমতা হইবে।" এই কথা যিনি বলিতে পারেন তিনি যে আত্মশক্তিতে কতখানি বিশ্বাসী তাহা ভাবিলে শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসে। স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন—"তোমার স্বদেশবাসিগণই তোমার প্রথম উপাস্য। তোমাদিগকে পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পরে বিবাদ না করিয়া প্রথমে এই স্বদেশিগণের পূজা করিতে হইবে। তোমরা নিজেদের ঘোর কুকর্ম-ফলে কষ্ট পাইতেছ, তথাপি এত কষ্টেও তোমাদের চোখ খুলিতেছে না।"

বস্তুতঃ, ধর্মের বেদীর উপরে স্বদেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা করাই স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দৃপ্ত ভঙ্গিতে বলিতেন—"এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম,—আর তোমার রাজনীতি, রাস্তা ঝেঁটান, প্লেগ নিবারণ, দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যা হয়েছে, তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় ত হবে, নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার।" তাঁহার গুরুভাই গিরিশচন্দ্রও এই মতাবলম্বী ছিলেন। বিবেকানন্দের বিয়োগের অনতিকাল পরেই গিরিশের 'সৎনাম' নাটক লিখিত হয়। এই গ্রন্থে দেখা যায় গীতার

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ।"

এই উপদেশকে মূলমন্ত্র করিয়া জাতি-জাগরণের চিত্র ইহাতে প্রতি-ফলিত হইয়াছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির স্মৃতিচারণ করিয়া কবি সত্যেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিসে অমৃতের টিকা পরি'।

দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরই এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি,
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া—অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

('আমরা'—"কুহু ও কেকা", ১৯২২)

—ইহা কবি-কল্পনা নয়, বাস্তব সত্য, ঐতিহাসিক সত্য। কারণ বাঙ্গালীর ধৈর্য-শক্তি, সহ্য-শক্তি অন্যান্য জাতির তুলনায় বেশী। 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা'র মধ্য দিয়া সে 'মানুষের ঠাকুরালি,' উপলব্ধি করে এবং' 'জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভ করে। আর বাঙ্গালীর হৃদয়রূপ অমৃত মন্থন করিয়া যে ঘনীভূত নির্যাস উঠিয়াছে, তাহারই প্রত্যক্ষ রূপই হইতেছেন 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং তনু' শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর। তাঁহার স্বদেশপ্রেম বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইয়াছে, এবং 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম' সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ধর্মের উপর কাজীর নিষেধাজ্ঞা তিনিই সেইদিন ভঙ্গ করিয়াছিলেন এবং 'আচণ্ডালে হরিনাম' বিলাইয়া দিয়া তিনিই সেইদিন প্রমাণ করিয়াছিলেন—'পৃথিবীতে এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মানুষ জাতি'। আজ যাহাকে আমরা '১৪৪ ধারা' বলি, মহাপ্রভু সেইদিন তাহাই ভঙ্গ করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই মানবতা ও জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন—'Sisters and Brothers of America'. ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে আমেরিকার শিকাগো শহরে Parliament of Religions নামে এক বিশ্ব-ধর্মসভায় যোগদান করেন এবং এই সভায় ভাষণ দিতে উঠিয়াই তিনি 'প্রিয় ভগিনী ও ভাই' বলিয়া সম্বোধন করায় সভাস্থ সকলেই মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে 'New York

Herald' নামে এক প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—"হিন্দুজাতির মধ্যে খ্রীষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্বুদ্ধিতার কার্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার পরে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" লণ্ডন ও প্যারিস নগরীতেও বিবেকানন্দ হিন্দুদর্শন সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। শ্রীচৈতন্যদেব অচৈতন্যজীবকে চৈতন্যসম্পাদনে যে ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাহাই বীর সন্ন্যাসীর মত বাস্তবে রূপায়িত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ও মানবধর্ম বিবেকানন্দের বিশ্বমৈত্রী ও ভালবাসায় বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছিল।

আবার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সাধক বিবেকানন্দের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" মন্ত্রে রূপলাভ করিয়াছিল। আর নেতাজী সুভাষচন্দ্র[১৫৪] এই মন্ত্রেই জাতিকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন

১৫৪. সুভাষচন্দ্র—ভারতের বীর সন্তান, স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্রদূত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নাম চিরকাল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারি উড়িষ্যার অন্তর্গত কটকে সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জানকীনাথ বসু কটকের সরকারী উকিল ছিলেন, মাতা প্রভাবতী দেবী বুদ্ধিমতী ও নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল ২৪ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে এবং ইঁহারা বাস করিতেন কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে।

ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা-পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এ. পড়িবার সময় উক্ত কলেজের অধ্যাপক ওটন সাহেব একদিন ভারতীয়দের সম্বন্ধে এক অপমানসূচক উক্তি করিলে তিনি উক্ত অধ্যাপককে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য তাহাকে প্রহার করেন। ফলে উক্ত কলেজ হইতে তিনি বহিষ্কৃত হন। অবশেষে স্যার আশুতোষের চেষ্টায় তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন এবং উক্ত কলেজ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি. এ. পাশ করিয়া তিনি আই. সি. এস. পড়িবার জন্য বিলাতে

—"তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দিব"। এই স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং "কদম কদম্ বঢ়ায়ে" দিল্লী যাওয়ার অভিযান সম্পূর্ণ না হইলেও ইহার ফল সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। এই ঐতিহাসিক কীর্তিমান মরণজয়ী বীরের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন"—

"জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"[১৫৫]

জাতীয় সংগ্রামে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার কথা চিন্তা করিলে তাঁহার জীবনাদর্শের কথাই সকলের মনে পড়ে। তিনি আসলে ছিলেন কর্মযোগী বিবেকানন্দের অনুসারী। বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও জীবনাদর্শই তাঁহার জীবনকে সংগঠিত করিয়াছে। বিবেকানন্দের শক্তি-সাধনা একদিকে যেমন সুভাষচন্দ্রের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁহার জনসেবা সুভাষচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে ত্যাগে ও ধর্মে। রাজা রামমোহন ও বিবেকানন্দের মাধ্যমে দেশপ্রেমের যে ঐতিহ্য ও সমন্বয়-বাণী দিকে দিকে প্রচারিত ও প্রসারিত হইয়াছে, সুভাষচন্দ্র ছিলেন সেই ধারারই বাহক।

যান। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে আই. সি. এস. পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করিয়া ফুল ভ সরকারী চাকরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সরকারী চাকরি প্রত্যাখ্যান করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলনে' তথা জাতীয় সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের সকল কর্মশক্তি ব্যয়িত হইয়াছিল স্বাধীনতা-সংগ্রামে। তাঁহার কর্মশক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত 'আজাদ হিন্দ সরকার' এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠন। তাঁহার অন্তর্ধান বিস্ময়কর হইলেও সুভাষচন্দ্র ভারতবাসীর হৃদয়রাজ্যে 'রাজা' হইয়া আজও বাঁচিয়া আছেন।

১৫৫. রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি"—'অসমাপ্ত', গীতি-সংখ্যা—১৪৭, পৃঃ ১৬৭।

বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণ সেবার মূলে রহিয়াছে গভীর অধ্যাত্মবোধ এবং এই অধ্যাত্মবোধই তাঁহার মানবতা ও মানসিক মূল্যবোধের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। বিবেকানন্দের এই মানবতার রাষ্ট্রতাত্ত্বিক প্রকাশকেই আমরা গণতন্ত্র বলিতে পারি। এই সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে গণতন্ত্র বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, সেই গণতন্ত্রই দেশবন্ধু দাশের লেখায় ও কার্যে প্রকাশ পেয়েছে। নারায়ণ বাস করেন তাঁদেরই মধ্যে যাঁরা চাষ কবেন, কঠিন পরিশ্রম করেন দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট হয়েও যাঁরা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের আলোক জ্বালিয়ে রেখেছেন।" সুভাষচন্দ্রের এই দেশাত্মবোধ ও মানবতাবোধই তাঁহাকে ভারতবর্ষের জনমানসে স্থায়ী আসন দিয়াছে। আর জাতীয় সংগ্রামের মূলে তিনি যে প্রেরণা দিয়াছেন, মানবতা ও দেশাত্মবোধই তাহার ভিত্তি। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জীবনাদর্শ তাই আজও লক্ষ লক্ষ তরুণ মনে আশা-আকাঙ্খা জাগায় ও নব-ভারত গঠনে প্রেরণা দেয়। সুভাষচন্দ্রের এই নেতৃত্বকে শ্রদ্ধা করিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি।…আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট।… তোমার এই পবিত্র শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।…আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছো। দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।" সত্যই কবিগুরুর আশীর্বাদধন্য সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার পূজারী, সংগ্রামে মরণজয়ী, রাত্রি-নিশীথে অতন্দ্রপ্রহরী ও পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে দুঃসাহসী পরিব্রাজক ছিলেন। ভারতের জাতীয় সংগ্রামে সেই মহান অধিনায়ক চিরস্মরণীয় ও বরণীয়।

সুভাষচন্দ্রের দেশসেবার মূল মন্ত্র ছিল "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর

পাতন"। এই মন্ত্রের আর এক দীপ্তিময় রূপ দেখি স্বদেশপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার উন্মেষ ঘটিয়াছিল তাঁহার শৈশবেই। সিপাহী অভ্যুত্থানের মাত্র চার বৎসর পরেই তাঁহার জন্ম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার তখন ধনে-মানে ও বিদ্যাবুদ্ধিতেই কলিকাতার সমাজে অভিজাত ছিলেন তাহাই নয়, দেশের নারী-শিক্ষার প্রসার, সমাজ-সংস্কার এবং ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনেরও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁহারা। ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগেই বাংলাদেশে "হিন্দুমেলা"র উদ্ভব। আর সেই মেলার প্রধান উদ্দেশ্যও ছিল স্বদেশী ভাবধারার প্রচার, তথা স্বদেশী শিল্পের উন্নতি, সাহিত্যের বিকাশ, সঙ্গীতাদি, ললিতকলার চর্চা, শারীরিক অনুশীলন প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ তখন মাত্র ছয় বৎসরের বালক। কিন্তু 'হিন্দুমেলা'র বিভিন্ন কাজকর্মে তিনি সেই বয়সেই যোগ দিয়াছিলেন পরিবারের অন্যান্য কিশোরদের সঙ্গে। এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন তাঁহার সেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৫৬] রবীন্দ্রনাথের চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাবলম্বন ও দেশপ্রীতির যে পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁহার উত্তরজীবনে লক্ষ্য করা যায়, তাহা প্রধানতঃ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বভাবেরই সুফল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাড়া দিয়াছিলেন, তাহা

---

১৫৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর :—(১২৫৫—১৩৩১ বঙ্গাব্দ)। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম ভ্রাতা। ইনি ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করেন এবং বহু ফরাসী লেখকের রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সঙ্গীত-বিজ্ঞানেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি উত্তম সঙ্গীত রচনাও করিতে পারিতেন। কিছুকাল ইনি 'তত্ত্ববোধিনী' ও ও 'সঙ্গীত প্রকাশিকা' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ইনি স্বর-বিজ্ঞানে (Phonology) বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। 'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' প্রভৃতি ইঁহার রচিত পুস্তক।

হইতেই দেশবাসী তাঁহার স্বাদেশিকতাপূর্ণ পরিচয় লাভ করে। এই সময় তিনি কংগ্রেস-সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় 'রাখীবন্ধনে'র আয়োজন করিয়াছেন, জাতীয় ভাবোদ্দীপক সঙ্গীত রচনা করিয়া ও গাহিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন দেশবাসীকে। বাংলাদেশের অখণ্ডতার সমর্থনে এবং জাতীয় ঐক্যরক্ষার উদ্দেশ্যে এই সময় তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান্ ॥
... ...
বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান ॥"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার বিভিন্ন রচনায়। এই সব রচনা যে দেশবাসীর স্বদেশচেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে বেশী কার্যকরী হইয়াছিল বোধ হয় তাঁহার স্বদেশপ্রেমমূলক অতুলনীয় সঙ্গীতগুলি। যেমন—'আমার সোনার বাংলা, তোমায় ভালবাসি', 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল্‌রে', 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে', 'আমি ভয় করব না ভয় করব না', 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে', 'সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান', 'আমাদের যাত্রা হ'ল শুরু', 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগোরে ধীরে', 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী', 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই', 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে', 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী', 'সার্থক জনম আমার

জন্মেছি এই দেশে', 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান', 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে', 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান' প্রভৃতি। ভারতীয় সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথ বরাবরই বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া যখন সেই ঐতিহ্য নষ্ট হয়, আত্মিক শক্তিতে দুর্বল হইতে থাকে ভারতবাসী, রবীন্দ্রনাথ তখন প্রাচীন ভারতীয় আদর্শকে গ্রহণ করিবার ইঙ্গিত দিয়া বলিয়াছিলেন— "আমরা আজ যাহাকে অবজ্ঞা করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি না— জানিতে পারিতেছি না, ইংরেজী স্কুলের বাতায়নে বসিয়া যাহার সজ্জাহীন আভাস মাত্র চোখে পড়িতেই আমরা লাল হইয়া মুখ ফিরাইতেছি, তাহাই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ, তাহা আমাদের বাগ্মীদের বিলাতী পটতালে সভায় নৃত্য করিয়া বেড়ায় না,—তাহা আমাদের নদীতীরে রুদ্র রৌদ্রবিকীর্ণ, বিস্তীর্ণ ধূসর প্রান্তরের মধ্যে কৌপীনবস্ত্র পরিয়া তৃণাসনে একাকী মৌন হইয়া বসিয়া আছে। তাহা বলিষ্ঠ ভীষণ, তাহা দারুণ সহিষ্ণু, উপবাস-ব্রতধারী।" ইউ-রোপীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির তুলনায় সনাতন ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি যে উন্নত ও শ্রেয়ঃ, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই কথা যেমন-ভাবে উপলব্ধি করাইয়াছেন তেমনভাবে বোধ হয় আর কেহই করান নাই। তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপ কর্মকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু ভারত মানুষকে লঙ্ঘন করিয়া কর্মকে প্রাধান্য দেয় নাই। তিনি বলিয়াছেন—"য়ুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী। য়ুরোপের ধনসম্পদ, আরাম-সুখ নিজের—কিন্তু তাহার দান-ধ্যান, স্কুল-কলেজ, ধর্মচর্চা, বাণিজ্য-ব্যবসায় সমস্ত দল বাঁধিয়া। আমাদের সুখ-সম্পত্তি একলার নহে, আমাদের দান-ধ্যান, অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার"। ইউরোপীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে ভারতীয়

জীবনাদর্শের পার্থক্য এইখানেই, আর এইখানেই ভারতের মহত্ত্ব। কবির স্বদেশপ্রীতিই যে কবিকে এমন করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সেই কথা না বলিলেও চলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা চলে—"স্বদেশ যে আমাদেরই কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমনকি অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে—একথা যখন নিঃসংশয়ে বুঝিব, তখনই আর কথা বুঝিবার সময় হইবে।"[১৫৭] 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দূরে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুখে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানতঃ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞান দুর্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিখিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জন্মে।"[১৫৮] রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ছিলেন সত্য-শিব-সুন্দরের পূজারী কবি, অপরদিকে তেমনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক। স্বদেশের অপমান-বেদনা, দুর্গতি-লাঞ্ছনা তীব্র অনুভূতিতে মর্মজ্বালায় রবীন্দ্রনাথকে বার-বার যেমন ক্ষুব্ধ করিয়াছে, প্রত্যেক সংকটকালে তিনি যেভাবে তাঁহার স্বদেশবাসীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহার তুলনা আর কোন

---

১৫৭. রবীন্দ্র রচনাবলী—একাদশ খণ্ড, 'জাতীয় বিদ্যালয়', পৃঃ ৫৭৩।

১৫৮. রবীন্দ্র রচনাবলী—দ্বাদশ খণ্ড, 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ', পৃঃ ৭২৭।

দেশের আর কোন কবির জীবনে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের তুলনা রবীন্দ্রনাথ নিজেই। আবার দেখি, একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ—এই দুইজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কথাশিল্পীর পরে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তিনি যে কতখানি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন, তাহা তাঁহার নামের পূর্বে 'দরদী' ও 'মরমী' কথা দুইটির দ্বারাই বোঝা যায়। পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়াই যেন "পথের দাবী" র 'সব্যসাচী' র আবির্ভাব এবং 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—বাংলাদেশের এই সহজিয়া সত্যই যেন 'সব্যসাচী' এবং শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের জীবনবাণী। মহামতি লেনিন বলিয়াছেন —"Art belongs to the people'. শরৎসাহিত্য এই 'belongs to the people'-এরই সাহিত্য। শরৎচন্দ্র নিজেই বলিয়াছেন, "শুধু সংসারে যারা দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই, এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।" শরৎচন্দ্রের অন্তরের এই অনুভূতিই বাঙ্গালীর হৃদয়ের মূল চাবিকাঠি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

> "মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
> ভিতরে প্রবেশ করি, সে শক্তি ছিল না একেবারে।"
>
> (ঐকতান)

কিন্তু শরৎচন্দ্রের সেই 'শক্তি' ছিল। তিনি ছিলেন 'মাটির কাছাকাছি' এবং 'জীবনে জীবন যোগ করা'ই ছিল তাঁহার সাহিত্যের মূলমন্ত্র, স্বদেশপ্রেম ছিল তাঁহার মানবপ্রেমেরই প্রকাশ —"The touch of truth is the touch of life." বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে

আমাদের দেশের বরণীয় কয়েকজন মহামানবের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব হইয়া গেল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্যান্যদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য এই যে, শরৎচন্দ্র ইঁহাদের মতো অতটা আন্তর্জাতিক নন, যতটা নাকি জাতীয়। শরৎ-প্রতিভা যেন গৃহস্থ বাড়ীর তুলসীতলার প্রদীপটি, একান্তভাবে গৃহস্থের নিজস্ব। অন্যান্যরা উদার উন্মুক্ত আকাশের নক্ষত্র, গৃহস্থবাড়ী নামক স্বদেশীয় সমাজে আবদ্ধ না থাকায় বিশ্বময় আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন। শরৎ-প্রতিভার এই বিশিষ্টতার জন্যেই বাঙ্গালী তাঁহাকে আপন করিয়া যেমন পাইয়াছে, আপনভাবে তেমনি স্মরণও করিয়াছে। কবিশেখর কালিদাস রায় [১৫৯] যথার্থই বলিয়াছেন—

১৫৯. কবিশেখর কালিদাস রায়—বাঙলা ও বাঙালীর অতি আপনার কবি, চিন্তাশীল প্রবন্ধকার, মননশীল সমাজতত্ত্ববিদ্, বৈয়াকরণ, পণ্ডিত ও আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। তিনি বর্ধমান জেলার 'করুই' গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুন (৭ই আষাঢ়, ১২৯৬) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর (৭ই কার্তিক, ১৩৮২) কলিকাতায় টালিগঞ্জস্থ 'সন্ধ্যার কুলায়'-এ চিরশান্তি লাভ করেন। তাঁহার পিতার নাম—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় ও মাতার নাম রাজবালা দেবী। সাধক বৈষ্ণব পদকর্তা লোচনদাস, উদ্ধবদাস ও গোকুলানন্দ সেনের বংশে কবির জন্ম। 'কুন্দ' ও 'কিশলয়' তাঁহার শৈশবের রচনা এবং 'পূর্ণাহুতি' তাঁহার জীবনযজ্ঞের শেষ আহুতি। তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে—'পর্ণপুট' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), 'ঋতুমঙ্গল', 'বল্লরী', 'চিত্তচিতা', 'লাজাঞ্জলি', 'রসকদম্ব', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'ব্রজবেণু', 'বৈকালী', 'হৈমন্তী', 'পূর্ণাহুতি', 'তৃণদল' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—"তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল"। রংপুর সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে 'কবিশেখর' উপাধি দান করেন। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের তিনি নিকটতম বন্ধু ছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে 'দেশিকোত্তম', রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় 'ডি. লিট.', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'জগত্তারিণী' ও 'সরোজিনী' স্বর্ণপদক প্রদান

"শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য বহির্জগতের রসপরিচয় মাত্র নয়,—ইহা অন্তর্জগতের রসপরিচয়। ঘটনা-সংঘাত, দৃশ্য-পরম্পরা, বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা ইত্যাদি তাঁহার কথাসাহিত্যে গৌণ,—মানবমনের ভাবদ্বন্দ্ব ও অনুভূতি-বৈচিত্র্যই মুখ্য। ঘটনার যতটুকু বহিরাবরণ অনুভূতিকে উদ্দীপিত করে বা তাহার প্রকাশদানে সহায়তা করে, শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যে ততটুকুরই স্থান। বহির্জগতের নিজস্ব মূল্য শরৎসাহিত্যে নাই।" সত্যই শরৎচন্দ্র ছিলেন সর্বতোভাবে সমাজ-সচেতন। 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রেরই আর একজন উদ্গাতা ছিলেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি 'জাতির পাঁতি' কবিতায় বলিয়াছেন—

"জাতের নামে বজ্জাতি সব, জাত জালিয়াত খেলছ জুয়া
ছুঁলে পরেই জাত যাবে, জাত ছেলের হাতে নয় ত মোয়া।"

শরৎচন্দ্রও বলিয়াছেন—'মরার কোন জাত নাই'। 'সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে' যাহারা আছে—তাহাদের কথা শরৎ-চন্দ্র ও নজরুল উভয়েই বলিয়াছেন। বঞ্চিত-লাঞ্ছিত-নির্যাতিতের প্রতিনিধি হইয়া নজরুল ও শরৎচন্দ্রের মত 'আদি পিতা ভগবানে'র নিকট—'ফরিয়াদ' জানাইয়াছেন—

"এই ধরণীর ধূলি মাখা তব অসহায় সন্তান।
মাগে প্রতিকার উত্তর দাও, আদিপিতা ভগবান"॥

নজরুলও শরৎচন্দ্রের মত সাম্যবাদের কবি, সর্বহারার কবি—

"গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া সব এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান।
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খৃষ্টান!"

করিয়াছিলেন। ১২৬৮ সালে কবি 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করেন। রবীন্দ্র শত-বার্ষিকী বৎসরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে কবিশেখর মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করিয়াছিলেন।

সমাজের ভণ্ডামি, মূঢ়তা, বঞ্চনা ও অসাম্যের বিরুদ্ধেই—উভয়েরই বিদ্রোহ। শরৎচন্দ্র বলেন—"সব জিনিসের একটা সত্যকার অধিকার আছে, সমাজ উন্নত হয়ে যখন সেই সত্যকার সীমাকে লঙ্ঘন করে তখন তাকে আঘাত করাই উচিত ; সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্য হয়, মোহ ছুটে যায়"। এই 'মোহ ছুটে' যাওয়ার গানও শুনা যায় নজরুলের কণ্ঠে—

"প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ।"

তবে নজরুলের বিদ্রোহ ধ্বংসমূলক নয়, গঠনমূলক, আত্মসমীক্ষামূলক। তিনি চাহিয়াছিলেন, একটা সুন্দর সমাজব্যবস্থা—যে ব্যবস্থায় মানুষ স্বাধীনভাবে, উন্নতশিরে বাস করিতে পারিবে। সেই জন্য বদ্ধ জীবন-কারার রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিতে তিনি আহ্বান জানাইয়াছিলেন—

"কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙ্গে ফেল কর রে লোপাট।
রক্তজমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।"

এই আহ্বান তাঁহার পক্ষেই সম্ভব যিনি আত্মশক্তিকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ নজরুল শুধুমাত্র বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, বিদ্রোহ করিয়াছিলেন সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে এবং দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।"

'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল' থামার আগে যিনি থামিতে চান নাই, 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ' হস্তচ্যুত হওয়ার আগে যিনি শান্ত হইতে চান নাই—আজ তিনি শান্তির পরপারে চলিয়া গেলেও তাঁহার

কবিতা রহিল 'suffering humanity' রূপে, যাহা আগামী যুগে স্বাধীনতা-প্রেমিকদের নব নব প্রেরণা দিবে। তিনি তারুণ্যের কবি —আজীবন সুন্দরের জয়গান করিয়াছেন। গীতিকার নজরুল বড়, তার চেয়ে বড় ব্যক্তি নজরুল, আর সবার চেয়ে বড় নজরুলের ব্যক্তিত্ব। তাই বায়রন-সম্পর্কিত বহুশ্রুত মন্তব্যটি নজরুল প্রসঙ্গে শেষ কথা —"His personality is the greatest point about his poetry".

কবি নজরুলের মত আর যাঁহারা স্বদেশী গান লিখিয়া জাতিকে স্বদেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চারণকবি মুকুন্দদাস, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ সেনও উল্লেখযোগ্য।

মুকুন্দদাসের একটি জনপ্রিয় গান :—

"ফেলে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী,
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না।"

ঘুমন্ত মানুষের 'ঘুম' ভাঙ্গানোর জন্য মুকুন্দদাস গাহিয়াছেন—

"করমেরই যুগ এসেছে, সবাই কাজে লেগে গেছে,
মোরাই শুধু রব কি শয়ান।"

আবার—

"হাসিতে খেলিতে আসিনি এজগতে
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা।"

মুকুন্দদাস ছিলেন অগ্নিযুগের অন্যতম ঋত্বিক। তাঁহার স্বদেশী গান ও স্বদেশী যাত্রা বৃটিশ সরকারের settled fact-কে unsettled করিয়াছিল। নজরুল সত্যই বলিয়াছিলেন—"বাংলা মায়ের দামাল ছেলে চারণকবি মুকুন্দদাস"। তাঁহার 'মাতৃপূজা' একটি গান আজিও গীত হয়—

"আর আমরা পরের মাকে মা বলে আর ডাকব না।
জয় জননী জন্মভূমি তোমার চরণ ছাড়ব না।
ফিরব না আর দ্বারে দ্বারে, ভাসব না আর নয়ন-নীরে,
কি সুধা তোর হৃদয়-ক্ষীরে—জীবনে মা ভুলব না।
কি করুণা, কি মহিমা, কি অতুল মধুরিমা,
সুজলা-সুফলা শ্যামা এমন মা আর পাব না।"

কবি দ্বিজেন্দ্রনাল রায়-ও এই সুরেই গান গাহিয়াছিলেন—

"ধন-ধান্যে-পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা,
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা,
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

অতুলপ্রসাদ সেন চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন সুরকার ও সঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে। তাঁহার একটি অপরূপ রচনা—

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালবাসা।"

কান্তকবি রজনীকান্তও গাহিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই,
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

কবি অমৃতলালের মুখে শোনা যায় ইহারই প্রতিধ্বনি—

"আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক,
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক
তোদের ওই চক্‌চকান মধুর চাকে
করবো না আর বিষ-পান।
তোদের কাচের বাসন কাচের চুড়ি,
ফেলবো ভেঙ্গে মেরে তুড়ি
করে দেবতা সাক্ষী ঘরের লক্ষ্মী
শাঁখার আবার রাখবো মান।"

দেশবাসীর প্রাণে ঐ বিদেশী বর্জনের ভাব জাগাইবার জন্য 'হিতবাদী'র কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গান লিখিলেন—

"দেখরে চেয়ে বাজার ছেয়ে, আসতেছে মাল বিদেশ হতে?
আমাদের বেচাকেনা, পাওনা দেনা অভাব মোচন পরের হাতে,
আমাদের পিতল কাঁসা, ছিল খাসা, কাজ চালাতাম কলার পাতে।
এখন এনামেলে, মাথা খেলে কলাই করার ব্যবসাতে।
এখানে পরশ পাথর পায় না আদর, চটা উঠছে পেয়ালাতে।
যত ঠুনকো, পলকা দূরে হালকা—দ্বিগুণ মূল্যে পালটে নিতে॥
ঘরে নাইকো আহার, বেশের বাহার, যাহার তাহার পথে ঘাটে।
হায়রে নিজের দেশে যায় না অভাব, অশন বসন সব বিলাতে।
ছেড়ে পরের ঠাকুর, ঘরের কুকুর ইচ্ছা করে মাথায় নিতে।
বিশারদ, ছাড়তে নারে কেঁদে ঘরে, কার্য্য সারে কোনমতে।"

এই স্বদেশী গানটি তখন হাটে-মাঠে-ঘাটে-বাটে সকলের মুখে মুখে গীত হইত। সুর নাই, ছন্দ নাই, তবুও মনের আনন্দে সবাই গাহিত—বিষয়বস্তুর গৌরবে ও ভাবের উন্মাদনায়। ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, গানটি কতখানি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। এই সময়

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়[১৬০] ঘরের ছেলেদের ঘরে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল-ভাবে বলিয়াছিলেন—"গণ্ডিভ্রষ্ট হইও না। নিজেদের সর্বস্বের প্রতি মমতাযুক্ত হও। যে শক্তি আজ সুষুপ্ত, তাহাই মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত উদ্ভাসিত হইয়া সর্ব দুর্গতি মোচন করিবে। কিন্তু পরমুখী হইলেই সর্বনাশ।" শুধু উপাধ্যায়ই নন, নাট্যকার গিরিশচন্দ্রও 'সন্তানের উক্তি' নাম দিয়া এইরূপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন—

"শুনি মা তুই সোনার বাংলা,
শুনি যেমন সোনার কাশী।
তুই যদি মা সোনার বাংলা,
আমরা কেন উপবাসী।
ঘর ফুঁড়ে তোর আসে আকাশ,
দীর্ঘশ্বাসে তোমার বাতাস,
কানের কাছে সদাই হা হা
সে তো নয় মা মধুর বাঁশী।

* * *

নাইকো মা তোর আমের বাগান,
ম্যালেরিয়ায় করলে শ্মশান,

---

১৬০. ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—(১৮৬১-১৯০৭)। পিতা দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মস্থান কলিকাতা। ইঁহার বাল্যনাম ভবানীচরণ। প্রথমে ইনি কেশবচন্দ্রের শিষ্য হন। পরে সিন্ধুদেশে গমন করিয়া পাদ্রীদের সঙ্গে মিশিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি "Twentieth Century" প্রভৃতি কয়েকখানি সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন। ইউরোপের নানাস্থানে ইনি বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন তর্করত্নের উপদেশে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় ইনি হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং দেশসেবায় যোগ দেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অঃ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকালে ইনি "সন্ধ্যা" নামক দৈনিক পত্র বাহির করেন।

নাইকো শোভা, নাইকো ছায়া,
পাখী হয়েছে উদাসী।

অন্ন নাই রাখালের পেটে,
গরু গেছে 'নিউ মারকেটে',
আঙিনাতে ধুলো উঠে,
ধুঁকে পড়ে আছে চাষী।"

আবার এই কবিতারই সঙ্গে সঙ্গে কবি নিজেই উহার প্রত্যুত্তরে মায়ের উক্তি হিসাবে বলিয়াছিলেন—

"ঘুমিয়ে আছ অঘোর হয়ে,
তাইতে থাক উপবাসী।
ডাকি কত উঠো না তো,
চোখের জলে সদাই ভাসি।

নগ্ন থাকো বসন বিনে,
পরের কাছে আনি কিনে,
আরো কি হয় দিনে দিনে
হয়েছি তো পরের দাসী।

* * *

নির্ভাবনায় টাকা আনো
চাকরী বড় জবর জানো,
ফুলের মালা বলে গলাই
পরেছ গোলামী ফাঁসী।

* * *

সোনার আমি যাদুমণি
ক্ষেত্র আমার সোনার খনি,
ভ্রাতৃপ্রেমের বিমল জলে
ধোও রে মায়ের মলরাশি।"

এইরূপ 'আমার দেশ', 'আমার সোনার বাংলা', 'আমার জন্মভূমি', প্রভৃতি ধুয়াবিশিষ্ট গানে ও কবিতায় বঙ্গদেশ যখন মুখরিত, তখন পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল কবি গোবিন্দদাস বাঙ্গালীকে শুনাইয়াছিলেন—

"স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়।
এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হত যদি,
পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলককুণ্ডা হীরার খনি, বর্ম্মা ভরা চুনি মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়।"

আবার ইহারই প্রায় এক বৎসর পরে তিনি 'মিলন-মঙ্গল' গান গাহিয়াছিলেন—

"আমার হরিহর,
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম,
হোক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই সাদিয়া সিন্ধু সেতু রামেশ্বর।
* * * *
একই মোদের দণ্ডবিধি,
একই মোদের গুণের নিধি,
এক চরণে তিরিশ কোটি লুঠি নারী-নর।"

এই সময় যোগীন্দ্রনাথ বসু[১৬১] 'ভারতের মানচিত্র' ও 'দেশ-ভক্তি' প্রভৃতি কবিতা লিখিয়া বালক-যুবকদের মনে স্বদেশ-হিতৈষণার ভাব

জাগাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। 'দেশভক্তি' কবিতার একস্থানে আছে—

"সত্য কি তোমারে আমি বাসি ভাল স্বদেশ জননী?
কহি বটে, তুমি মোর সাধনার ধন, নয়নের মণি।"
কিন্তু যবে অন্তরের অন্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি, সব শূন্যগর্ভ, অর্থহীন, অলীক বচন।

* * * *

সত্য দেশ-ভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয়,
দেশ-ভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, প্রেমে,—বচনেতে নয়।"

পূর্ববঙ্গের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার বলিয়াছেন—

"কোটি-কল্প নরকের বাস ইচ্ছা হয়,
পলকের অধীনতা তবু প্রিয় নয়।"

তাঁহার 'জন্মভূমি' শীর্ষক কবিতাও বিশেষ স্মরণযোগ্য—

"ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
নয় নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
'স্বর্গ' 'স্বর্গ' করে লোক সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য-বিহীন,
থাক্, তার চারিপাশে বিজন বিপিন।

---

১৬১. যোগীন্দ্রনাথ বসু—(১৮৫৭-১৯২৭ খ্রীঃ)। জন্মস্থান চব্বিশপরগণা জেলার নিতাড়া গ্রাম। ইনি একজন সুসাহিত্যিক ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার লিখিত 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত', 'পৃথ্বীরাজ', 'অহল্যাবাঈ', 'পতিব্রতা', 'শিবাজী', 'তুকারাম', 'দেববালা' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। স্যার আশুতোষ প্রভৃতি মনীষিগণ এক সভায় ইঁহাকে "কবিভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

না থাক্ নিকটে—নদ-নদী-সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য পরিকর,
তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার।
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।”

‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’—এই প্রাচীন ভক্তি-নিবেদনেরই ইহা ভাষ্য। দেশ সুন্দর বলিয়া কবি কৃষ্ণচন্দ্র স্বদেশকে ভালবাসেন নাই, দেশ ‘জন্মভূমি’. তিনি দেশকে ‘সুখের স্বর্গ’ মনে করিতেন।

এই যুগেরই আর এক কবি গোবিন্দচন্দ্র রায়ের কণ্ঠ হইতেও অনুরূপ গান ধ্বনিত হইয়াছিল—

“কত কাল পরে, বল ভারত রে।
দুখ-সাগর সাঁতারে পার হবে।
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে, ও কি শেষ নিবেশ রসাতলরে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে, পরদাস খতে সমুদায় দিলে।
পর হাতে দিয়ে, ধন রত্ন সুখে, বহু লৌহ-বিনির্মিত হার বুকে।
পর ভাষণ আসন আনন রে, পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে।
পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।
খুচি কাঞ্চনভাজন সৌধ-শিরে হ'ল ইন্ধন কাচ প্রচার ঘরে।
খনি খাত খুঁড়ে খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে পুঁজিপাত নিলে জুটিয়ে লুটিয়ে।
নিজ অন্ন পরে, করপণ্যে দিলে, পরিবর্ত্ত ধনে দুরভিক্ষ নিলে।
মথি অঙ্গ হরে, পর স্বর্গ সুখে তুমি আজও দুখে, তুমি কালও দুখে।
নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে, ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে।
বিধি বাদী হলে, পরমাদ রটে, পরমাদ হলে হিতবোধ ঘটে।
কি ছিলে, কি হলে, কি হ'তে চলিলে, অবিবেক বশে কিছু না
বুঝিলে।” ইত্যাদি

এই জনজাগরণের গান এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে গীত হইয়াছিল।

এই কবির 'যমুনা-লহরী'র করুণ কল্লোলও তখনকার বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছিল।

'ঢাকা প্রকাশে'র সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মিত্র-ও এই সময়ে একেবারে নীরব ছিলেন না। তাঁহার 'সুশিক্ষিতদিগকে উত্তেজনা' ও 'পিতার নিকট বীরের বিদায় গ্রহণ' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে তেমন কবিত্ব না থাকিলেও দেশহিতৈষণা পুরোমাত্রায় ছিল। "সুশিক্ষিতদিগকে উত্তেজনা" কবিতার একস্থানে আছে—

"তোমাদের জন্মভূমি স্নেহের আধার
আহা। তার দশা চেয়ে দেখ একবার
পুত্রহীনা মাতা-মত, করি শির অবনত.
অবিরত ফেলিতেছে অশ্রুবারি-ধার।
নিবারিতে তার নয়নের জল—
নিবারিতে তার হৃদয়-অনল,
কত যত্ন কত করিলে কৌশল,
বল দেখি? নিবারিতে মাতৃ-দুঃখচয়
উপযুক্ত পুত্রদের উচিত কি নয়?"

তাঁহার দ্বিতীয় কবিতার শেষ কয় ছত্র এইরূপ :—

"অয়ে তাত। মানব জীবন,
নহে কিছু চিরস্থায়ী, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই.
অবশ্য একদা গ্রাস করিবে শমন,
দেশের—দেশীয়দের হিতে হেন প্রাণ
দিব, কি সৌভাগ্য যার ইহার সমান।"

তারপর আনন্দচন্দ্র মিত্র গাহিলেন—

"যে দেশে জনম মোর, বাস সেই দেশে
যে দেশের বায়ু বহে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে.

যে দেশের রবি তাপ বিতরে আমায়,
যে দেশের স্রোতস্বতী সলিল যোগায়,
যার ফল-শস্যে করি জীবন ধারণ,
যার বক্ষে সদা সুখে করি বিচরণ,
ধরাতলে কোথা আছে তার মত স্থান ?
সেই মম জন্মভূমি জননী সমান।

* * *

যার অন্ন-জল খেয়ে শরীর জীবিত,
যার নামে ধরাতলে হই পরিচিত,
যাহার গৌরবে কত সুখের উদয়,
যাহার পতনে হয় পতন নিশ্চয়,
দূর দেশে থাকি যারে করিলে স্মরণ,
উথলে হৃদয়, আর ঝরে দু-নয়ন,
তার তার শরীরের রক্ত-বিন্দু দান
যে না করে, কৃতঘ্ন সে পশুর সমান।"

এই যুগে এই ভাব-প্রভাব হইতে বঙ্গ রঙ্গালয়ও মুক্তি পায় নাই ; ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশাত্মবোধক গানের একটি সংকলন "জাতীয় সঙ্গীত" ১ম ভাগ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে লেখক বা সম্পাদকের নাম ছিল না। বিজ্ঞাপনে বলা হইয়াছিল, "যদি এই গ্রন্থ দ্বারা অন্ততঃ এক ব্যক্তিরও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হয়, তবে সংগ্রাহক কৃতার্থ হইবেন···এই গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা কিছু লাভ হইবে তাহা কোন প্রকার জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত হইবে।" ইহাতে 'হিন্দুমেলা' উপলক্ষ্যে রচিত কিছু গান ছাড়াও পুরাতন কয়েকটি গান সংকলিত হইয়াছিল। উদাহরণ হিসাবে 'নীলদর্পণ' নাটক হইতে সংগৃহীত দুইটি গান—'নীলবানরে সোনার বাংলা' ও 'হে নিরদয় নীলকর'-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ইহা ছাড়া হেমচন্দ্রের 'বাজরে শিঙ্গা,' 'প্রাণ কাঁদে বলিতে ভারতের বিবরণ',

গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কতকাল পরে' ও 'নির্মল সলিলে বহিছ সাগর' ইত্যাদি গানগুলি উল্লেখযোগ্য। "নীলদর্পণ" নাটক ছাড়া আরও কয়েকটি নাটকের গানের ভিতর দিয়া স্বাদেশিকতা প্রচারিত হয়। 'ভারতমাতা', 'ভারতে যবন', 'বীরনারী', 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' ইত্যাদি নাটকের কোনো কোনো গান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার 'পুরু বিক্রমে' (১৮৭৪) নাটকে তেরো বছরের কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি' গানটি জুড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া, গিরিশচন্দ্রের 'সৎনাম' ও ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' এই দুইখানি নাট্যগ্রন্থও এই যুগের মূল্যবান সামগ্রী।

"নীলদর্পণ" অভিনয়ের পর ১২৮০ সালে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতমাতা" নামে একটি ক্ষুদ্র নাট্যগ্রন্থ কলিকাতা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। অমৃতলাল লিখিয়াছেন—

> "ভারতমাতার অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চে জননী
> জন্মভূমির প্রথম পূজা।"—একটি গান

অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল—

> "দেখ গো ভারত-মাতা তোমারি সন্তান,
> ঘুমায়ে রয়েছ সবে হয়ে হতজ্ঞান।
> সবে বলে বীর্য্যহীন, অন্ন বিনা তনু ক্ষীণ,
> হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়া যায় প্রাণ।
> মরি এ দশা তোমার, সহিতে না পারি আর,
> অপার জলধি পার চলিলাম ছাড়ি স্থান।"

"নীলদর্পণ" ও "ভারতমাতা"র পর উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী', 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' প্রভৃতি স্বদেশ-প্রীতিমূলক নাটক যখন অভিনীত হইতেছিল, তখন মনোমোহনের 'হরিশ্চন্দ্র' নামক পৌরাণিক নাটক সকলকে গান শুনাইয়াছিল—

"দিনের দিন, সবে দীন হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ,
অপমানে তনু ক্ষীণ॥

* * *

ছুঁই সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশালাই কাটি, তাও আসে পোতে,
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে,
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

এই প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাম স্মরণীয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম' ছাড়া 'অশ্রুমতী', 'সরোজিনী', 'স্বপ্নময়ী' প্রভৃতি নাটকগুলি স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত। তাঁহার 'পুরুবিক্রম' নাটকে পুরু বলিতেছেন—

"স্বদেশ উদ্ধার তার, সরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে শত ধিক্ তারে,
পচুক্ সে চিরকাল দাসত্ব আঁধারে।
স্বাধীনতা-বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ, ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক্ প্রাণ যাক্ স্বাধীনতা বেঁচে থাক
বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

এইবার বীরগণ। কর সবে দৃঢ় পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা বিজয় সাধন।"

সুরেন্দ্রনাথের "হাসির" নামক নাটকেও এই সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। 'হাসির' নামক ভার্যের মুখে যে সকল গান আছে, তাহা তেজোদীপ্ত ও উদ্দীপনাপূর্ণ। যথা—

"লাগিল স্বপন পরাধীন জন,
এবে অধীনতা—দুখরাশি।
দেশ-অনুরাগে, ধীর ধীর জাগে
জাগে জন্মভূমি-সুখ-প্রয়াসী।
পবন গাইছে শুন, সঙ্গীত সকরুণ,
পদ্মিনী-কাহিনী হে চিতোরবাসী।
তপন-আলোকে, প্রকাশিছে লোকে,
বীর-শোণিত-স্রোত বৈরি-বিনাশি।
ধীর ধীর জাগো, বিদায় মাগো,
কার্য্যকাল হ'লো উদয় আসি।"

এই নাটকটি ১২৮৭ সালে মুদ্রিত হয় এবং পরে অভিনীত হয়। ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন 'ভারতের সুখ-শশী যবন-কবলে' নাম দিয়া যে স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক প্রণয়ন করেন, তাহা অভিনীত হয় নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই অভিনয়ে জমিয়াছিল। কারণ তাহা ছিল দেশমাতার আরাধনাস্বরূপ। যথা—

"কে আমারে বক্ষে ক'রে করেছে পোষণ?
কে মোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে?
ধন ধান্যে রত্নে পূর্ণ কাহার ভাণ্ডার?
কে মোর পিতার পিতা, মাতার জননী?
কোথা হতে পিতা মোর পেয়েছেন জ্ঞান?
কোথা হতে মাতা মোর পেয়েছেন স্নেহ?

কে তিনি আমার মাতা ? — তিনি জন্মভূমি !
হাঁ, সেই জননী মম মোর জন্মভূমি।
সেই মাতা স্নেহময়ী জননী মোদের।
দ্যাখো দ্যাখো আজি তাঁর একি দুরদশা,
বাম হস্তে ছিল যার কমলার বাস,
দক্ষিণ কমলকরে দেবী বীণাপাণি,
সেই দুই হস্তে আজি পড়েছে শৃংখল।"

এই প্রসঙ্গে নাট্যকার রাজকৃষ্ণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; আশা-উৎসাহহীন বাঙ্গালী জাতির প্রাণে প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে তিনি "ভারত-সান্ত্বনা" নামে একখানি 'দৃশ্যরূপক' রচনা করেন। রূপক-টিতে ব্রহ্মা ও ভারতমাতার কথোপকথনে যে ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক। সংলাপের কিয়দংশ পাঠ করিলেই বিষয়টি বোঝা যাইবে।

ব্রহ্মা।—(ভারত-মাতার প্রতি)

তোমার মঙ্গল তরে, ঐক্য আর সাহসেরে
পাঠাইনু পুনরায় আবাসে তোমার,
ব'ল তব পুত্রগণে, প্রাণপণে সযতনে
পালে যেন উপদেশ সেই দু'জনার।

ভারত-মাতা।—(প্রণাম করিয়া)

হে পিতঃ জগৎ-স্বামি ! অবশ্য বলিব আমি
আমার তনয়গণে যত্ন-সহকারে,
ঐক্য আর সাহসেরে, দৃঢ়তম পণ করে
হৃদয়ের অন্তস্তলে অবলম্বিবারে।

ব্রহ্মা।—

যদি তা'রা অবলম্বে সেই দেবদ্বয়ে,
পুনঃ 'স্বাধীনতা' তব উদিবে হৃদয়ে।

ভারত-মাতা।—

ভাল কথা হ'ল মনে, দেখি নাই তু'নয়নে
বহুদিন স্বাধীনতা-দেবীর চরণ,
যদি দয়া করি পিতঃ জুড়াও তাপিত চিত
সেই মহা ঈশ্বরীরে করি প্রদর্শন।

এই ক্ষুদ্র দৃশ্যরূপক ছাড়া, রাজকৃষ্ণ রায়ের আরও অনেক স্বদেশ-প্রেমমূলক গান ও কবিতা আছে। ১২৮৩ সালে তাঁহার 'ভারত-ভাগ্য', 'ভারত-বিলাপ-গীতিকা' ও 'স্বদেশপ্রিয়ের শেষ দেখা' শীর্ষক কবিতাগুলি এবং ১৮৮৫ সালে 'ভারত গান' নামক গানের বই প্রকাশিত হয়। একশত দেশাত্মবোধপূর্ণ সঙ্গীতে 'ভারত-গান' সম্পূর্ণ। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই মর্মস্পর্শী।

হেমচন্দ্রের 'ভারতবিলাপ' ও 'ভারত-সঙ্গীত' ১২৭৭ সালে প্রকাশিত হয়। ঈশানচন্দ্রের 'কি-লিখিব আজ', 'স্বভাবে কি অর্থ নাই' প্রভৃতি কবিতা ১২৯২ সালে 'চিন্তা' কাব্যে মুদ্রিত হয়। ১২৯২ সালে কংগ্রেসের জন্ম হয় এবং ইহার পর হইতে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম নূতন রূপ লাভ করে। কৃষ্ণদাস পাল তখন অস্তমিত, রাজনীতিক গগনে সুরেন্দ্রনাথ তখন নবোদিত অরুণের ন্যায় উদীয়মান। নরেন্দ্র সেনের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও শিশির কুমার ঘোষের[১৬২]

---

১৬২. শিশিরকুমার ঘোষ—(১৮৪২—১৯১১ খ্রীঃ অঃ)। এই মহাত্মা যশোহর জেলার মাগুরা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ স্থানটির বর্তমান নাম—অমৃতবাজার। ইনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিপুল জ্ঞান অর্জন করেন। ইনি একজন একনিষ্ঠ এবং শ্রদ্ধাযুক্ত বৈষ্ণব এবং অতীব কোমলচিত্ত ও ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি বিখ্যাত "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রথম সম্পাদনা করেন। তখন ইহা বাংলা সাপ্তাহিক ছিল। ইনি বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক গ্রন্থ প্রচার করেন, তন্মধ্যে 'অমিয়নিমাই চরিত', 'Lord Gouranga', 'কালাচাঁদগীতা' প্রভৃতি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। শেষ জীবনে ইনি

'অমৃতবাজার' স্বদেশপ্রেমের নবানুরাগে রঞ্জিত। সেই সময় সাহিত্যাকাশে তরুণ রবির অরুণোদয়। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গান ধরিলেন—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।'

হেমচন্দ্রও এই সময়ে নীরব থাকিতে পারেন নাই। তিনি কংগ্রেসের জন্মের প্রায় ষোল বৎসর পূর্বে "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়" বলিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। আর এই কংগ্রেসের অধিবেশনে আনন্দবিহ্বল হইয়া "রাখি-বন্ধন" নামে এক কবিতা রচনা করিয়া তাহাতে "বন্দেমাতরম্" গানের কিয়দংশ অন্তর্নিবিষ্ট করেন। যথা—

"কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল।

* * *

জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত-মাঝার,
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির মনোরথ
পুরাবার তরে চলিল।"

কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারে তখনকার দিনে শুধু বাঙ্গালী কাগজ নয়,—বাঙ্গালার রঙ্গালয়ও একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

বৈষ্ণবধর্ম আলোচনায় ও সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইহার ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ভক্তি অতীব প্রবল ছিল। সংবাদপত্রে স্বদেশসেবা করিয়াও ইনি যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতায় হয়। সেই অধিবেশন উপলক্ষে মহাকবি গিরিশচন্দ্র "মহাপূজা" নামে একটি ক্ষুদ্র রূপক রচনা করেন। ১২৯৭ সালের ১০ই পৌষ স্টার থিয়েটারে উহার অভিনয় হয়। জনশ্রুতি আছে যে, অভিনয়-দর্শনে প্রীত হইয়া দানবীর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে পুরস্কার স্বরূপ পাঁচশো টাকা দান করেন। গিরিশচন্দ্র উহা দুঃস্থ শিল্পীদের মধ্যে বণ্টন করেন। রূপকটিতে একজন ভারতসন্তান বলিতেছেন—

"ভারত-সন্তান, কর কোলাকুলি, দুঃখ-নিশা অবসান।
কি হেতু নীরব, এ মহা উৎসবে, প্রাণ খুলে কর গান॥
একতা-রতন, বহুদিন হ'তে, ভারতে ছিল না, ভাই।
কর হে যতন, এ মহারতনে, পেয়ে যেন না হারাই॥
পঞ্জাব-প্রয়াগ, অযোধ্যা-কনোজ, মহারাষ্ট্র-মাড়োয়ার।
মাদ্রাজ-বোম্বাই, আসাম-নাগপুর, উৎকল-বঙ্গ-বিহার॥
হিন্দু বা খ্রীষ্টান, পার্শি-মুসলমান, একপ্রাণ আজি সবে।
একতা-বিহীন ভারত-সন্তান, কেহ আর নাহি রবে॥
সদয় ইংলণ্ড নাহি আর ভয়, পুরিবে মনেরি আশ।
হৃদয়ের সাধ রেখ না গোপন, প্রকাশিয়া কহ ভাষ॥"

এই "মহাপূজা"র প্রায় বারো বৎসর পরে কবি ও নাট্যকার অমৃতলাল বসু রচিত "নবজীবন" নামে মাতৃপূজা ও রাজভক্তির উচ্ছ্বাসপূর্ণ একখানি একাংক নাটিকা স্টারে পুনরায় অভিনীত হয়। এখানে দেখা যায় ভারত-মাতা গাহিতেছেন—

"জাগোরে জাগোরে ওরে প্রিয়তম পুত্রগণ।
কোথা তোদের বল-বীর্য—কোথা সে উন্নত মন॥
তোদের পুরাণ গাথা, সিংহপৃষ্ঠে দুর্গা মাতা,
দশভুজে দশদিক্ করেন শাসন।

তোমাদেরি ব্যাস কবি, এঁকেছিল বীর ছবি,
মুক্তবেণী যাজ্ঞসেনী শুধু ভারতে গঠন।
তোদেরি প্রতাপ রাণা, ভীম রণে দিয়ে হানা,
গিরিবনে ক্ষুণ্ণ মনে করেছিল দিন যাপন।
প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে নবজীবন।”

দেশভক্তির সঙ্গে ইংরেজভক্তি বা রাজভক্তির প্রচার—‘সদয় ইংলণ্ড, নাহি আর ভয়, পুরিবে মনেরি আশ’ এবং ‘প্রচণ্ড ইংলণ্ড তোরে দিতেছে নবজীবন’—ইহা কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে দেখা যায় নাই। কংগ্রেসের জন্মের মূলেও আছে এই ভয়ে ভক্তি এবং ভক্তিজনিত স্তুতি। লর্ড হিউম তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডাফরিনের[১৬৩] সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং কংগ্রেসের প্রশংসা করা শালীনতাবোধেও অনিবার্য হইয়া পড়িত। হেমচন্দ্রকে অক্ষয়চন্দ্র বৈরিজনিত দেশভক্তির ‘প্রধান ঘটক’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই হেমচন্দ্রও কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষে ‘রাখিবন্ধন’ নামে যে কবিতা রচনা করেন, তাহার একস্থানে আছে—

“ধন্য রে বৃটন ধন্য শিক্ষা তোর,
যুগ-যুগান্তের অমানিশি ঘোর—
তোরি গুণে আজ হ’ল উন্মোচন,
তোরি গুণে আজ ভারত-ভুবন
এ সখ্য বন্ধনে বাঁধিল।”

১৬৩. লর্ড ডাফরিন—(১৮২৬-১৯০২ খ্রীঃ অঃ)। ইনি ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। ইনি ব্রহ্মরাজ থিবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইঁহার সহধর্মিণী এদেশের নানাস্থানে স্ত্রী-চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। উহা ‘Lady Dufferin Hospital’ নামে পরিচিত।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও 'আনন্দমঠে' প্রকারান্তরে ইংরেজের আগমনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দেশপ্রেমের বিনিময়ে নয়। অবশ্য বৃটিশভক্তির প্রাবল্য ক্রমেই কমিতে থাকে এবং তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৩০৩ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের রচিত বিখ্যাত গানটির মধ্য দিয়া—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী।
অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরণি
জনক-জননী-জননি।
নীল সিন্ধুজল ধৌত চরণতল
অনিল বিকম্পিত শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বর চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র-তুষার কিরীটিনী।
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
জ্ঞান, ধর্ম, কত পুণ্য কাহিনী।
চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা-বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্য-বাহিনী।"

সাহিত্যের দরবারে এই গানটি অমরত্বের টিকা পরিয়াছে। শিক্ষিত সমাজে তখন 'বন্দেমাতরম্' গানের পরেই এই গানের স্থান। গিরিশচন্দ্রের 'বাসর' নামক গীতপ্রধান নাটকের প্রথম গানটির প্রথমাংশে ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়—

"জয় জয় ভারত-জননী।
বিহঙ্গ-কূজিত, ষড় ঋতু শোভিত,
ধ্বনিত-বেদগীত ধরিত্রী-মুকুটমণি।
রত্ন-আকর ফেনিল নীল সাগর বিধৌত চরণ,
মলয়াচঞ্চল তরুরাজি অঞ্চল, বিচিত্র ফুলদল-ভূষণ,
ক্ষীরধার তব পয়োধর নিঃসৃত,
পবিত্র স্রোত শত বক্ষে প্রবাহিত,
যুক্ত মুক্তধারে ত্রিবেণী, যজ্ঞসূত্রোপম গঙ্গা সুরধুনী
স্বর্ণশস্যপ্রসূ শ্যামলা, বিন্ধ্যাচল শ্রেণী মেখলা,
কীর্ত্তিমালিনী, ধর্মভালিনী, যজ্ঞ-ধূম-কুন্তলা,
শক্তিদাত্রী, বীরধাত্রী, শুভ্র হিমাদ্রি-কিরীটিনী।"

—রবীন্দ্রনাথের এবং গিরিশচন্দ্রের কবিতা দুইটির ভাব একই রূপ। তবে রবীন্দ্রনাথ দেশমাতাকে "ভুবন-মনোমোহিনী" বলিয়াছেন এবং গিরিশচন্দ্র "ধরিত্রীমুকুটমণি" বলিয়াছেন।

১৩০৮ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের সূচনায় সরলাদেবীর রচিত গানটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি। গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'
মহাসভা-উন্মাদিনী মম বাণি। গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'।
কর বিক্রম-বিভব-যশ-সৌরভ-পূরিত
সেই নাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল,
মান্দ্রাজ, মারাঠা, গুর্জর, নেপাল,
পাঞ্জাব, রাজপুতান।

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে—
'নমো হিন্দুস্থান'।

কংগ্রেসের জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী আন্দোলন যুগের পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যে স্বদেশ-প্রীতির ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিলেও জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার মত কিছু গান, কবিতা, নাটক ইত্যাদি স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ মহিলা-কবি কামিনী রায়ের "মা আমার" গীতিকবিতাটি উল্লেখযোগ্য—

"যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে,
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ কে হিসাব রাখে তার?
তুমি যবে চাহ কাজ,—মা আমার, মা আমার।

অতীতের কথা কহি বর্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়,
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনির্বার,
মরিব তোমারই তরে, মা আমার, মা আমার।

মরিব তোমার কাজে, বাঁচিব তোমার তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক ভার,
যাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার।"

"মা আমার" গানটি কবি কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে দুঃখিনী জন্মভূমির দুঃখ ও কলঙ্ক-মোচন করিবার সাধনায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও জীবনমরণ সংগ্রামের আকাঙ্ক্ষায় বাণীরূপ লাভ করিয়াছে। আদর্শ দেশসন্তান দেশমাতৃকার দুঃখ-দুর্দশার কথা এক মুহূর্তও ভুলিতে পারেন না, একটি দিনের জন্যও দুঃখিনী মায়ের মূর্তিটি তাঁহার দৃষ্টি হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই। এই দুঃখকে দূর করিবার জন্য তাঁহার নিকট মৃত্যুও যেন অতি তুচ্ছ! এই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রেম "মা আমার" নামটির মধ্যেও সার্থকভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া, সংগীতটির প্রতি স্তবকের শেষ চরণে ধুয়া হিসাবে 'মা আমার' কথাটি দুইবার ধ্বনিত হওয়ায় 'মা' ভাবটি সকল অনুরাগ ও ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া মুর্ত হইয়াছে।

মূলতঃ বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের সূচনা হয় "স্বদেশী যুগে"। আর এই স্বদেশী যুগ ১৩১২ সালের শেষকাল হইতে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগের সাহিত্যকে "স্বদেশী সাহিত্য" বলা যাইতে পারে। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি স্বাধীনতার মূল মন্ত্ররূপে তখন আকাশ-বাতাস মুখরিত, প্রকম্পিত ও প্রতিধ্বনিত। আর একদিকে যেমন বিপিনচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা, তেমনি আর একদিকে রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতির আবেগময়ী গান ও কবিতা—গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণের স্বদেশপ্রেমমূলক নাট্যগ্রন্থ সমূহের মর্মস্পর্শী অভিনয়—মুকুন্দদাসের যাত্রা—অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি, শ্যামসুন্দর প্রভৃতির দেশাত্মবোধপূর্ণ গদ্য-নিবন্ধ এবং 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর', 'নায়ক', 'হিতবাদী' প্রভৃতি দৈনিক ও সাপ্তাহিকের অগ্নিগর্ভ ভাষায় লিখিত বীরত্বব্যঞ্জক ভাবোচ্ছ্বাস সমগ্র বঙ্গদেশে, তথা ভারতে, স্বদেশপ্রেমের এক নবীন জোয়ার আনিয়াছিল। স্বদেশ ও স্বজাতি

সম্বন্ধে তখন সবাই সচেতন এবং আলোচনায় ও রচনায় সাহিত্যিক মাত্রেই সচেষ্ট। স্বল্পপরিসরে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নয়—গোষ্পদে আকাশের প্রতিফলন মাত্র। এই বিষয়ে সকলের সব লেখার কথা বলা এখানে অসম্ভব এবং বলিবার প্রয়োজনও নাই, শুধু দিগ্‌দর্শন করিলেই বোঝা যাইবে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের গভীরতা ও তীব্রতা কতখানি সুদূরপ্রসারী হইয়াছিল। কতখানি স্বদেশপ্রেমিক গোবিন্দদাসকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। স্বদেশপ্রেমের ও ভাবের একজন দীক্ষিত কবি ছিলেন গোবিন্দদাস। শুধু তাহাই নহে, বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে যাঁহারা উদ্‌গাতা ছিলেন, স্বভাবকবি গোবিন্দদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার প্রাণশক্তি প্রবল দেশাত্মবোধের শক্তিতে উজ্জীবিত ছিল। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতির মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। গভীর দেশাত্মবোধই তাঁহাকে দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দিয়াছে, আর দিয়াছে জাতীয় কবির সম্মান। তাঁহার দেশাত্মবোধমূলক কবিতাগুলি আলোচনা করিলেই এই সত্যের যথাযথ মূল্যায়ন হইবে এবং বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমিক হিসাবে তাঁহার স্থান ও মান নির্ণীত হইবে।

মূলতঃ গোবিন্দদাস স্বভাবসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। আর এই গুণের জন্যই তিনি হইয়াছিলেন—জাতীয় কবি। তাঁহার স্বদেশপ্রেম লাঞ্ছিত জীবনের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফলে তাঁহার স্বদেশপ্রেম শুধু ভাওয়াল-জয়দেবপুরের প্রকৃতির মধ্যে বা ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না—তাহা ছিল সর্বব্যাপী।

তাই প্রতিটি দেশপ্রেমিকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত গোবিন্দ-দাসের গান ও কবিতা, উচ্চারিত হইত 'মা ভৈঃ' ধ্বনি। জীবন-সিন্ধু মন্থন করিয়া তিনি যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহাই

তাঁহাকে জন্মভূমির প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে, নির্বাসিত জীবনে স্মৃতি-রোমন্থনে সান্ত্বনা দিয়াছে, প্রতিবাদ জানাইয়াছে অন্যায়ের, অসাম্যের ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে। স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হওয়ার অন্যতম কারণ—প্রবল দেশাত্মবোধ এবং দেশভক্তি। তাঁহার স্বদেশপ্রেম প্রচারমুখী বা বক্তৃতামুখী ছিল না—ছিল পীড়নমূলক ও কল্যাণমূলক ; তাঁহার স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতা শুধু অদ্বিতীয় নয়—অনুপম ; অনবদ্য নয়—নৈবেদ্য।

বাংলা সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস জন্মসূত্রেই একজন খাঁটি স্বদেশ-প্রেমিক। জননী ও জন্মভূমিকে তিনি স্বর্গের চেয়েও প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার জীবন-সঙ্গীতই স্বদেশ-সঙ্গীত। তাঁহার শিরায় শিরায় ও ধমনীতে ছিল স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক অনুরক্তি। স্বদেশের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই তিনি জীবনপণ সংগ্রাম করিয়াছেন। হাসিমুখে দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়াছেন এবং প্রবাসে বা নির্বাসনে ও স্বদেশের একনিষ্ঠ পূজারী হিসাবে নিজেকে 'এক ঘাটে পূর্ণ করিয়া অন্য ঘাটে শূন্য করিয়া দিয়াছেন'। কবি গোবিন্দদাসের চরিতকার শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়ঃ—'গোবিন্দদাসের শক্তি-কেন্দ্রে প্রবল দেশাত্মবোধের বীজ নিহিত ছিল। তাঁহার দেশভক্তি বা স্বদেশপ্রীতি শুধু কবিজনোচিত কল্পনার স্বদেশপ্রীতি নহে—যশোলিপ্সু বাগ্মীর দেশভক্তিও নহে, কিংবা আসরের প্রভাবে ভাষার বৈভবে জনসাধারণকে অভিভূত করিবার কোন প্রচেষ্টা নহে। তাঁহার স্বদেশপ্রীতিতে কৃত্রিমতা নাই। নিজের জন্মভূমিকে উপেক্ষা করিয়াও যে দেশভক্তি রাতারাতি ছত্রকের মত গজাইয়া উঠে—কবি গোবিন্দ-দাসের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব ছিল। গভীর দেশাত্মবোধ তাঁহার অন্তরে অগ্নিগর্ভ মেঘের মত লুকাইয়া থাকিত—সময় সময় তাহা হইতে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইত। তিনি সর্বোত্তম দেশাত্মবোধ দেখাইয়া গিয়াছেন।"

সত্যই নির্ঝরিণী যেমন হঠাৎ পর্বতগাত্র হইতে আপন ছন্দে, আপন মহিমায় স্বতঃ উৎসারিত হইয়া থাকে, কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধ একদিন তেমনিভাবে বিকশিত হইয়াছিল। তদানীন্তন ভাওয়াল-জয়দেবপুরের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং রাজগৃহের পরিপূর্ণ অবস্থা কবিজীবনের পক্ষে অনুকূল ছিল। জন্মভূমি ছিল কবির নিকট বাল্যের ক্রীড়াভূমি, শৈশবের লীলাভূমি, যৌবনের স্বপ্নভূমি এবং বার্ধক্যের বারাণসী। ভাওয়ালের স্বর্ণযুগেই কবি গোবিন্দ-দাসের আবির্ভাব। ভাওয়ালের শ্রী, ঐশ্বর্য ও কল্যাণে তিনি এতই আকৃষ্ট হন যে, তাঁহার নিকট ভাওয়াল 'যেন সকল দেশের সেরা ভূমি'। রাজা-প্রজার মধুর সম্পর্কে রাজ্যে সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করিত। লক্ষ্মীর ঝাঁপি লইয়া রাজপরিবারের গৃহলক্ষ্মীরা উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া থাকিত। এইরূপ এক 'সব পেয়েছির জগতে' কবি গোবিন্দদাসের দেশাত্মবোধের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং তাহাই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথে ধীরে মুকুলিত ও পল্লবিত হইয়া উঠে। ভাওয়ালের সুখ-সমৃদ্ধিতে আত্মহারা কবি রাজ-সভার বর্ণনা দিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য—

"রাজা আছে কালীনারায়ণ
কুমার আছে আপনি স্বয়ং,
প্রজা আছে, প্রজা কোচবংশীগণ,
ভাওয়ালে এখন কি না আছে ?
মন্ত্রী আছে, মন্ত্রী হরনাথ রায়,
আছে সুশাসন কৌমুদী-প্রভায়,
ভাওয়াল সন্তান মিলি একতায়,
ভাওয়ালের যশঃ একতালে গায়—
এক তালে আজি ভাওয়াল নাচে।"

যে স্বরাজলাভের জন্য পরাধীন ভারত উথাল-পাথাল হইয়াছিল,

কিঞ্চিদধিক অর্ধশতাব্দী পূর্বে সেই স্বরাজ্যের স্বপ্ন একজন দুঃস্থ বাঙ্গালী কবি কেমন করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ২২ বৎসরের কবি গোবিন্দদাস তখন লিখিলেন—

"আমরাই হ'ব সচীব প্রধান,
আমরাই হ'ব দ্বারে দ্বারবান,
আমরাই হ'ব বণিক কৃষাণ,
তাঁতি, কর্মকার, আমরা সেহ,
আমরা মারিব সহিব ভাইরে,
এতে অপমান কিছুই নাইরে,
আমরা বেচিব, আমরা কিনিব,
আমাদের টাকা আমরাই পাব,
লইতে নারিবে কাড়িয়া কেহ।"

কিন্তু কবির সুখ-স্বপ্ন সফল হয় নাই, জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা কালবৈশাখীর ঝড়ে তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া যায়।

১২৮৫ সালে বৃদ্ধ রাজা কালীনারায়ণের মৃত্যু হইলে কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন। প্রতিভাবান কবি ও সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখন ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী। কবি গোবিন্দদাস তখন রাজার পার্শ্বচর কর্মচারী। কিন্তু কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ শক্তহাতে রাজ্যের হাল ধরিতে না পারায়, রাজসভার প্রাধান্য দেখা দিল। তবু তাহাই নহে, রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হওয়ায় সারা রাজ্য জুড়িয়া অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নামিয়া আসিল। রাজা স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী ও বিলাসী। রাজমন্ত্রী ক্ষমতালোভী ও কূটচক্রী। প্রজামণ্ডলী ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং রাজকর্মচারীরা 'হঠাৎ রাজার হঠাৎ নবাব' রূপে শাসনের নামে শোষণ চালাইতে লাগিল, রক্ষক হইয়া উঠিল ভক্ষক। স্বদেশপ্রেমিক কবি গোবিন্দদাস এই দুঃসময়ে বঞ্চিত, লাঞ্ছিত নির্যাতিত ও অপমানিত স্বদেশবাসীর পক্ষ

অবলম্বন করিতে গিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত পাইলেন। বিশেষ বিশেষ করিয়া নারীঘটিত ব্যাপারে নিরীহ গ্রামবাসীর অভিযোগের কোন সুবিচার না হওয়ায় কবি আত্মসম্মানে আঘাত পাইলেন এবং তেজস্বী কবি ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ কথা না ভাবিয়া রাজগৃহের সঙ্গে সকল সংস্রব ত্যাগ করিলেন। স্বাধীনতার পূজারী কবি গোবিন্দদাস—'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে'—এই কথা ভাবিয়া নির্ভীকভাবে লিখিয়াছেন—

"পৃথিবী
অনন্ত গগনে শূন্য অবলম্বহীন,
আপনি আপনা পরি, নিজ আবর্তন করি
ভ্রমিয়া করিলে পূর্ণ সে পথ অসীম।
কেবলি কেবলি হায় অবিচল প্রতিজ্ঞায়
আপনি আপন বলে থাকিয়া স্বাধীন,
ভ্রমিলে গগন শূন্য অবলম্বহীন।
আমিও তোমার মত জীবন করিব গত
আপনি আপন বলে থাকিব স্বাধীন,
সাধিব কর্তব্য কর্ম বাঁচি যতদিন।"

সত্যই কবি গোবিন্দদাস যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন 'আপনি আপন বলে' স্বাধীন ছিলেন এবং কর্তব্যকর্ম পালন করিতে গিয়া গৃহকে উপবাসীও রাখিয়াছিলেন। আবার এই কর্তব্য কর্মের প্রেরণায় স্ত্রী-কন্যাকে নিরন্ন অবস্থায় একাকী ফেলিয়া উদরান্নের চেষ্টায় গৃহত্যাগ করিয়া কবি লিখিলেন—

"যাই প্রিয়, জন্মভূমি জননী আমার।
ভুলেছ কি গত কথা ?—আছে কি মা মনে ?

সহিয়াছি কত শত প্রেত অত্যাচার
জননি তোমার তরে অকাতর মনে।
ন্যায়ের পবিত্র বক্ষে করি পদাঘাত
অকালে সেদিন হায় করি চুর চুর,
পিশাচের প্রতিমূর্ত্তি মাগো অকস্মাৎ
ভেঙ্গেছে সৌভাগ্য মোর সোনার মুকুর।"

কিন্তু—

"এতেও সুখের নাহি ছিল পরিসীমা,
মুছিত যদি মা তোর কলঙ্ক কালিমা।"

অবশেষে কবি লিখিলেন—

"যাই তবে জননী গো বিদায় এখন,
যাই হে স্বদেশবাসী। মনে রেখ ভাই,
তোমাদের তরে সহি এত নির্যাতন,
বিড়ম্বিত হইলাম বর্বরের ঠাঁই।"

কবি তৎকালীন ভাওয়ালের শাসন-ব্যবস্থাকে "বর্বরে"র সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং অনাহারে-অনিদ্রায়-কায়ক্লেশে বিদেশে থাকার সময়েও এই "বর্বরে"র হাতে নিগৃহীত-নিপীড়িত দেশবাসীর কথা ভুলিতে পারেন নাই, যেন কবি মধুসূদনের মতই তাঁহার প্রার্থনা—'রেখো মা দাসেরে মনে, এই মিনতি করি পদে'। ফলে স্বদেশের কথা মনে পড়িতেই কবি আবার লিখিলেন—

"প্রিয়তম জন্মভূমি। এ ক্ষুদ্র হৃদয়—
জীবন্ত চিতায় কেন করি ভস্মময়।
হে প্রিয় স্বদেশবাসী, কেন বহ্নি রাশি রাশি
প্রত্যেক নিশ্বাসে করে জীবন সংশয়,
জানিবে কি? জান নাকি এ পোড়া হৃদয়,
তোদেরই সুখের লাগি, হয়েছি সংসারত্যাগী—

ভুলিয়াছি প্রেয়সীর সরল প্রণয়,
করিয়াছি অভাগীরে চির ম্লানময়।

*　　*　　*

তবু মূর্খ জ্ঞান নাই, যা কহ তা' কহ ভাই,
অতুল আনন্দে প্রাণ ডগমগ করে,
স্বর্গীয় সৌরভ যেন উছলিয়া পড়ে।"

কবির এই ভাবোচ্ছ্বাস কাল্পনিক নহে—বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবন-সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শুধু মুখের কথাই নহে, বঞ্চিত বুকের পুঞ্জীভূত বেদনাই বাণীমূর্তি লাভ করিয়াছে। গোবিন্দদাস স্বেচ্ছায় 'ভিক্ষুকের প্রতিনিধি' হইয়াছিলেন। তিনি যদি স্বেচ্ছায় স্বখাত সলিলে না ডুবিতেন এবং তোষামোদ করিয়া পরের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন, তবে বাংলা সাহিত্যে এইরূপ উপেক্ষিত কবি হইতেন না। একদিকে স্বাধীনতা, অপরদিকে দরিদ্রতা—তাঁহাকে মনুষ্যত্বের গরিমায় পরিপূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিয়াছিল। তাই 'ক্ষুধার রাজ্যে' তাঁহার কাব্য ছিল 'গদ্যময়' এবং হৃদয়-রাজ্যে ছিল 'পদ্যময়'।

কবি মনে-প্রাণে ছিলেন স্বদেশী। তাই ইংরাজীয়ানা এবং বিদেশীয়ানা তিনি বর্জন করিয়া চলিতেন। প্রবাসে থাকিয়াও তাঁহার মন স্বদেশের জন্য কাঁদিত। কবি মধুসূদন বড় কবি হওয়ার আশায় বিদেশে পাড়ি দিয়াছিলেন এবং পরিণামে মোহভঙ্গ হওয়ায় অনাহারে-অনিদ্রায় কায়ক্লেশে দিন যাপন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মধুসূদন দরিদ্রের সন্তান ছিলেন না, অমিতব্যয়িতাই তাঁহার আর্থিক সঙ্কটের মূল কারণ। কিন্তু এই অবস্থাতেও স্বদেশের কথা মনে পড়িতেই তিনি কাঁদিয়া ফেলিতেন এবং বলিতেন "হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন"। ভাগ্যবিপর্যয়ে এবং অর্থ-উপার্জনের জন্য কবি গোবিন্দদাসও প্রবাসে গিয়া স্বদেশের জন্য কাঁদিতেন এবং বলিতেন—"স্বর্গাদপি গরীয়সী প্রিয় জন্মভূমি"। দু'জনাই কবি, তবে মধুসূদন ছিলেন

মহাকবি এবং গোবিন্দদাস ছিলেন জাতীয় কবি। মধুসূদনের স্বদেশ-প্রেম কাব্যপ্রেমেরই একরূপ, গোবিন্দদাসের স্বদেশপ্রেম মানবপ্রেমরই এক পরিণত রূপ। তাই প্রবাস-জীবন, কবির স্বদেশপ্রেমের সফলতম রূপ। আর এই রূপের এক স্মরণীয় বৎসর ১২৮৪ সাল—ভাওয়াল-রাজগৃহের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার পুণ্য যোগ। কবি তখন দেশাত্মবোধে অভিভূত হইয়া লিখিলেন—

"পুণ্যযোগ গতবর্ষ আমার জীবনে,
আমি ভারতের পুত্র আর্য কুলাঙ্গার,
স্বদেশ স্বজাতি প্রেম মৃতসঞ্জীবনে
এতদিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার।
জন্মিয়াছে ব্যথা-বোধ জাতীয় পীড়নে
পক্ষাঘাত বক্ষ আজ হতেছে স্পন্দিত,
আমূল স্নায়ব যন্ত্র ঘোর বিকম্পনে
কি এক দৈবীয় বলে হ'তেছ কম্পিত।
জাতীয় শকতি প্রাণে হয়েছে সঞ্চার,
পুণ্যযোগ গতবর্ষ জীবনে আমার।
পুণ্যযোগ গতবর্ষ জীবনে আমার,
জীবনের এক অংশ তব সঙ্গে হায়,
যদ্যপি কালসিন্ধু অনন্ত অপার
গ্রাসিয়াছে, ক্ষতিবোধ করি না তাহার।
যে জাতীয় উদ্দীপনা জাতীয় সম্মান,
মহান জাতীয় সত্য শিক্ষা দিছ তুমি,
ভুলিবনা সেই আত্ম-অধিকার জ্ঞান।
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রিয় জন্মভূমি।
নহে যোগ্য পূর্ণ প্রাণ বিনিময় তার,
পুণ্যযোগ গতবর্ষ জীবনে আমার।"

কবিতাটি ১২৯১ সালে 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইহা শুধু কবি-কল্পনা নহে—প্রচণ্ড অন্তর্দাহ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে সৃষ্ট মর্মবাণী। একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের আত্মনিবেদন। স্বদেশের জন্য, স্বদেশবাসীর কল্যাণের জন্য, স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য এমন নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না। তিনি তথাকথিত 'কালচার্ড' নন, তাই ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিক নন। আবার 'বাহবা' পাওয়ার জন্য নহে বা আত্মপ্রচারের জন্য নহে—স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য এবং মনুষ্যত্বের উজ্জীবনের জন্য তাঁহার স্বেচ্ছায় নির্বাসন বা দণ্ডভোগ। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'নন্দলাল'[১৬৪] নহেন, তিনি বাংলার মায়ের দামাল সন্তান। তিনি যে প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা শুধু অতুলনীয় নহে, তাহা অনুপম। সেইটুকু সম্বল করিয়া তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিভাবান কবি এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, দুঃখ-কষ্টও হয়ত অনেক কবি পাইয়াছেন; কিন্তু এমন জনম-দুঃখী কবিও খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের আবির্ভাব শুধু বিস্ময়করই

---

১৬৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলাল—"নন্দলাল" কবিতাটি কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'হাসির গান' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই 'হাসির গান' বাংলা সাহিত্য-সংসারে দ্বিজেন্দ্রলালের অক্ষয় কীর্তি। 'নন্দলাল' নামে একজন লোকের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কবিতাটির নাম "নন্দলাল"। তবে 'নন্দলাল' নামটি ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে এখানে প্রয়োগ করা হয় নাই। ভণ্ড দেশসেবক, বাক্‌সর্বস্ব, স্বার্থপর ও অলসপ্রকৃতি বাঙ্গালীদের সম্বন্ধে এই নামটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। আবার 'নন্দলাল' নামটিরও মধ্যে হাস্যরসের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 'নন্দলাল' শব্দটি অনেক সময় আদুরে ও অকর্মণ্য লোকদিগকে বুঝাইয়া থাকে। বাংলাদেশে এই ধরনের নন্দলালের অভাব নাই। এইসব বাঙ্গালী নন্দলালদেরকে কটাক্ষ করিয়া কবিতাটি রচনা করা হইয়াছে।

নহে, অভাবনীয়। ইংলণ্ডের কবি 'চসারের'[১৬৫] মত কবি গোবিন্দদাস একজন প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয় কবি।

ভাওয়াল হইতে তিনি ১২৮৬ সালে ময়মনসিংহে আসিয়া চাকরি করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি ময়মনসিংহে "সারস্বত কবি" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। ময়মনসিংহের সারস্বত-উৎসবের জন্য তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেন, তাহার প্রত্যেকটিই প্রাণস্পর্শী এবং দেশপ্রীতির অশ্রুজলে প্লুত—

"অদূরে হিমাদ্রি ভারত প্রাচীর,
অনন্ত অয়িত মুরতি গম্ভীর
চেয়ে আছে যেন তুলি উর্দ্ধে শির,
সভয়ে ভূধর রাজ।"

গোবিন্দদাস স্বভাবজাত শক্তির বলে ভাষা-ছন্দ-অলঙ্কারে নিপুণ শিল্পী ছিলেন। সহজ-সরল-প্রাঞ্জল অথচ অপূর্ব ভাবরাশি কবিতায় সন্নিবেশিত করিতেও অদ্বিতীয় ছিলেন। গুরুগম্ভীর কবিতার পার্শ্বে একটি চটুল অথচ মধুর চিত্র দর্শনীয়—

"আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা।
রেখে দে তোর টোপাঠালি,
সারাদিনই খেলিস খালি,
মাটির বেলুন, মাটির ভাত, হাত ধুইয়ে ফেলা।
পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে
"বৌ বৌ বৌ" খেলি মোরা ফুল্ল-সন্ধ্যা বেলা।
আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা।"

---

১৬৫. চসার—ইংরাজ কবি। আনুমানিক ১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। ইঁহার রচিত বিভিন্ন পুস্তকে ইনি তৎকালীন সমাজ ও জীবনের চিত্র নিখুঁতরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

ময়মনসিংহের "সারস্বত উৎসবে" গঠিত গোবিন্দচন্দ্রের কবিতার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। এই কবিতাটি পরে সুবিখ্যাত "ভারত-মিহির" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১২৯৮ সালে কবি গোবিন্দদাস ভাওয়াল রাজসভার কোপানলে পড়িয়া জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হন। বাংলার কোন কবি-সাহিত্যিকের ভাগ্যে এমন বিধি-বিড়ম্বনা কখনও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ। দুষ্টচক্রের কবলে পড়িয়া রাজা কবিকে নির্বাসিত করিবার সময় "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া কটূক্তি করেন। কবি গোবিন্দদাসের ঐ কথার প্রত্যুত্তর স্মরণীয়—

"বিশ্বাসঘাতক !" আমি বিশ্বাসঘাতক ?
কাঁপিল বিদ্যুৎবেগে আপাদমস্তক।
মুহূর্তের তরে ফিরে, কেশাগ্র না নড়ে শিরে
মুহূর্তের তরে শান্ত প্রচণ্ড পাবক,
গর্জ্জে না তরঙ্গ সজ্য মূর্তি সংহারক।
আবার মুহূর্ত পরে, বুদ্ধি জনমের তরে
জ্বলিল কালাগ্নি ঘোর জীবন্ত নরক।
আগের সহস্র তেজে—হৃদি অঙ্গারক।

* * *

"বিশ্বাসঘাতক"—মূর্খ ! কি বলিব আর
হৃদয়-শোণিত কি রে বিনিময় তার ?
আত্মপর নাহি জ্ঞান দেবতার কুসন্তান
চিরিয়ে দিয়েছি বুক পূজায় তোমার
নিরেট নির্বোধ। মর্ম বুঝিলে না তার ?
নিষ্ঠুর ! ছিল না তব অন্য সম্বোধন ?
শত তিরস্কারে তব উঠিল না মন ?

সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ধরি, যদি বক্ষ ভেদ করি
হৃদয়-শোণিতে কর বিধৌত চরণ,
বড় সুখ। কৃতজ্ঞতা-ব্রত উদ্‌যাপন।
নির্বোধ! নাইরে তোর হৃদয়ের বল,
নির্বোধ। নাইরে তোর কিছুই সম্বল,
কার হাতে ভাত খাও, কার বা নয়নে চাও
জানি না অদৃষ্টে তোর আছে কিবা ফল।
ভবিষ্য ভাবিয়া তাই আসে অশ্রুজল।
এমন বিশ্বাস অন্ধ, জ্ঞান নাই ভাল মন্দ
বালকের ক্রীড়নক—মাটীর পুতুল,
সৃষ্টির অপূর্ব জীব—বিধির কৌশল।

* * *

আমার প্রভুর বংশে আমার প্রভুর অংশে
যদি না জন্মিতি তুই—তবে কি রে পরে।
এ নয়নে অশ্রুরাশি চিরকাল তরে।
হা মাতঃ মা জন্মভূমি, মৃগেন্দ্রমহিষী তুমি,
জীবিত মৃগেন্দ্র শিশু নয়ন উপরে
শৃগাল-কুকুরে তোরে উপভোগ করে।

—কবি-হৃদয়ের এই অবর্ণনীয় দুঃখের কথা অনেকেই জানেন না, জানেন তাঁহার জীবনদেবতা এবং গণদেবতা। এই রচনায় স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, গোবিন্দদাস কি নির্ভীক, তেজস্বী, স্পষ্টবাদী, স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। গোবিন্দদাস ছাড়া আর অন্য কোন কবির পক্ষে এইরূপ স্পষ্ট জবাব দেওয়া সম্ভবপর হইত না। জবাবটি ৫০ বৎসরেই পুরাতন জীর্ণ পত্রপুটে আজও বাঁচিয়া আছে।

কবির স্বদেশপ্রেমের সার্থক স্ফুরণ ঘটে জন্মভূমি—ভাওয়াল—জয়দেবপুর হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর। জননী ও জন্মভূমি

কবির নিকট কতখানি প্রিয় ছিল তাহা জানা যায়, তাঁহার অমর লেখনীতে—

"ভাওয়াল আমার অস্থি-মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।
আহা, তার নরনারী, ফেলে যে আঁখির বারি,
অবিচারে ব্যভিচারে হ'য়ে ম্রিয়মান,
বার মাস তের কাতি, দিনে বেড়ে সে ডাকাতি
বুকে বিঁধে সদা মোর শেলের সমান।
বুকের শোণিত দিলে, যদি তার শুভ মিলে,
যদি তার দুঃখ-নিশি হয় অবসান,
আপনি ধরিয়া ছুরি, আকণ্ঠ হৃদয়ে পুরি
কলিজা কাটিয়া দেই করি শতখান।
তাহার মঙ্গল-হিতে, যদি আসে বাধা দিতে
লইয়া ভীষণ অস্ত্র বাসব-ঈশান,
পদাঘাতে পদাঘাতে, দেই তারে অধঃপাতে,
চরণ ধূলির সম নাহি করি জ্ঞান।
পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখি না তায়
যদিও অনেক দূর—আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এই জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত—তাহারি কল্যাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।

স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর প্রতিনিধি হইয়া অত্যাচারী ও পক্ষপাতদুষ্ট রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অপরাধে কবির জন্মভূমি হইতে নির্বাসন। এই নির্বাসন কবির নিকট মৃত্যুতুল্য ছিল। বিনাদোষে ও বিনাবিচারে কবির এই নির্বাসন। ইহা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও দুরভিসন্ধিমূলক। কবি তাই জনতার রায় চাহিয়াছেন—

"তোমরা বিচার কর আমারে যাহারা,
করিয়াছে নির্বাসিত, করিয়াছে বিড়ম্বিত,
করিয়াছে জন্মশোধ প্রিয় দেশ-ছাড়া,
পথের ভিখারী করি, করিয়াছে দেশান্তরী,
প্রবঞ্চিত করিয়াছে পিতৃ-ধনে যারা।
যারা ভাই বস্ত্র হরে দিনে বেড়ে ঘরে ঘরে,
আকুলা জননী বোন কেঁদে হয় সারা,
তোমরা বিচার কর কে হয় তাহারা।
তারা নহে দস্যু চোর, দুর্দান্ত দানব ঘোর?
পিশাচ রাক্ষস ভাই, তাহারা কি নয়?
আমি সে দেশের অরি, চরণে বিচূর্ণ করি,
যদি পাই, দিবা-নিশি এই মনে লয়।
বাঙ্গলার নর-নারী, ওই শোন শোন তারি,
কি যে সে গগনভেদী গভীর চীৎকার।
যে জাতি যেখানে যাক, সতীর সতীত্ব রাখ,
আপনার মা-বোনেরে স্মর একবার।
পেয়েছ যে প্রাণ, হস্ত, পুণ্য কার্যে কর ন্যস্ত
কর সমুচিত তার সাধু ব্যবহার—
উৎপীড়িত প্রপীড়িত ভাওয়াল উদ্ধার।"

স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের স্বভাবের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল—অন্যায় না করা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। সামান্য একটু আপোষ করিয়া চলিলে তাঁহার অন্ন-সংস্থানের কষ্ট হইত না। প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মতন তাঁহার লোকবল ও অর্থবল ছিল না, তাঁহার যাহা ছিল, তাহা হইতেছে—মনোবল। সত্যপ্রচারে জীবন বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও তিনি নির্ভীক ছিলেন এবং সত্য অপ্রিয় হইলেও তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। দেশবাসীর প্রতি কবির বিশ্বাস কি অটুট—

"সংসারে আমার ভাই যদিও কেহই নাই
তবুও তোমরা আছ দেশবাসিগণ !"

কবির এই বিশ্বাসই কবি-জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য। তাঁহার প্রতি যে অত্যাচার-অনাচার হইয়াছিল, সে সম্পর্কে তৎকালীন "নব্যভারত"-এর সম্পাদক ব্যতীত কলিকাতার অন্য কোন সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন নাই। আবার স্বদেশবাসীও সোচ্চার হয় নাই। ক্ষোভে-দুঃখে-অভিমানে অসহায় কবি তখন স্বদেশবাসীকেও তীব্র ভাষায় ভৎ'সনা করিয়াছেন—

"সত্যই কি বঙ্গদেশ ভরা শুধু ছাগ মেষ
এখানে মানুষ নাহি জন্মে কদাচন ?
নহ ত একটি দু'টি, বঙ্গবাসী আট কোটি,
সকলি কি কাপুরুষ অধম এমন" ?

বাঙ্গালী কোনদিনই 'কাপুরুষ' ছিল না—শৌর্যে-বীর্যে-জ্ঞানে-গরিমায় তাহার অতীত ইতিহাস গৌরবান্বিত। অথচ লোভে-প্রলোভনে-ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এবং আত্মসুখ প্রচেষ্টায় 'কাপুরুষ'—অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবার মত ক্ষমতাটুকুও সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। লজ্জায়-অপমানে-ক্ষোভে-অভিমানে কবি অবশেষে বলিয়াছেন—

"বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?
এমন অধম জাতি, বুকে মার শত লাথি
মুখে মার শত ঝাঁটা অনায়াসে সয়।
নাহি বীর্য নাহি তেজ, উদরে গুণ্ঠিত লেজ,
বিলুণ্ঠিত পর পদে সকল সময়।
অধম পিশাচগুলি গর্দ্দভের পদধূলি,
মাথায় মাখিয়া ছি ছি, বড়লোক হয়
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?

এই যে ভাওয়ালবাসী　　নিত্য অশ্রুজলে ভাসি,
　　অবিচারে ব্যভিচারে ভস্মীভূত হয়,
কে করে তাহার খোঁজ　　অসুরেরা রোজ রোজ,
　　কত যে কুলের বধূ চুলে ধরি লয়।
কত যে জননী বোন,　　কাটিয়া ঘরের কোণ
　　চুরি করে পিশাচেরা নিশীথ সময়
এরা আহা চক্ষু খেয়ে　　একটু দেখে না চেয়ে
　　ইহাদেরি এক-দেশী প্রতিবেশী হয়।
জুতা, লাথি, ঝাঁটা বেতে,　　এরা না কিছুতে চেতে,
　　অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?
দেও তারে শত গালি,　　দেও গালে চুনকালি
　　বেহায়ার তাতে কিবা লোক-লাজ ভয়।
　　বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?"

ইহার পর কবি গোবিন্দদাস "মগের মুলুক" নামক একখানা তীব্র ব্যঙ্গকাব্যে ভাওয়ালের অত্যাচার-অনাচারের রোমাঞ্চকর সত্য উদ্‌ঘাটিত করায় পূর্ববঙ্গে তিনি 'মগের মুলুক'-এর কবি নামে খ্যাতি লাভ করেন।

কবি গোবিন্দদাস সারা জীবন আপোষহীন সংগ্রাম করিয়াছেন। দারিদ্র্য যেমন তাঁহার জন্মজাত, সংগ্রামী মনোভাব তেমনি তাঁহার সহজাত। দারিদ্র্য যতই তাঁহাকে পীড়া দেয়, দেহ যতই ক্লান্ত হয়, রোগে-শোকে-পীড়ায় যতই মন অবসন্ন হইয়া পড়ে, ততই তিনি যেন তাঁহার উন্নতশির 'সবার উপরে' স্থাপন করিতে চান। তিনি তৎকালীন রাজা-জমিদার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ-যোগ্য। সম্ভবত প্রজার প্রতি অত্যাচারী শাসনকর্তার চিত্রই চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার।
এই যে কান্তারে ক্ষেত্রে, খাটে চাষা দিনে রেতে,
নাহি বৃষ্টি, নাহি রৌদ্র, নাহি নিদ্রাহার,
ইন্দিরা অন্নদারূপে, যবে ওর শস্য-স্তূপে
ঢালিবেন সুখ-শান্তি করুণা-সম্ভার,
করিয়া কতই আশা, আনন্দে উল্লাসে চাষা,
দেখিবে যখন সেই শ্রমফল তার
খাজানার ছল করি, তখন লইবে হরি,
অভুক্ত প্রজার সেই সুখের আহার।
সারাটা বছর হায়, রোগে শোকে যন্ত্রণায়
অর্ধাহারে অনাহারে দীন পরিবার।
কেহ বা শ্মশানে শোবে, কারে বা কবরে শোয়াবে
শিয়াল শকুনী কারে করিবে সৎকার,
ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার।
নিজে করে বাবুগিরি, চাহিয়া দেখে না ফিরি,
এদিকে যে করে তারে কাবু ম্যানেজার।
শুধু করে দস্তখৎ, কলের পুতুলবৎ
দিনে দিনে হতভাগা ঋণে ছারখার।
সে নেয় টাকার তোড়া তারে দেয় গাড়ী ঘোড়া,
ইডেন্ গার্ডেন আর মদের ইয়ার।
সে নেয় লুঠিয়া দেশ, প্রজার কষ্টের শেষ
এ এদিকে মজা লুঠে—দেখে থিয়েটার।
দার্জ্জিলিঙ্গে সিমলায়, ওরা দেখ হাওয়া খায়
এ এদিকে খায় ব'সে পরকাল তার।
সে ফিরে অলক্ষ্মী নিয়া, রাজলক্ষ্মী তারে দিয়া
রাজশক্তি রাজমান আর রাজ্যভার,

হেমন্ত কুহেলী অন্ধ, নাহি বোঝে ভাল-মন্দ
শূয়রে সঁপিয়া দেয়—পাসবন তার
ভারত করিল ভস্ম রাজা জমিদার।

—রাজা যদি ঋষি না হন, শাসক যদি রক্ষক না হন, তাহা হইলে দেশের যে কি অবস্থা, তাহারই একটি জীবন্ত ছবি উপরে বর্ণিত কবিতাটিতে পাওয়া যায়। দেশের প্রতি কবির যে কতখানি দরদ ও প্রাণভরা ভালবাসা ছিল—তাহা তাঁহার লেখনীতেই স্পষ্ট। দেশের রাজা, জমিদার, মালিক ও শাসক শ্রেণীর ভাল-মন্দের উপর যে সারাদেশের ভাগ্য জড়িত, ভবিষ্যৎ নিহিত থাকে, তাহা কবি গোবিন্দদাস মন-প্রাণ দিয়া যেমন অনুভব করিয়াছিলেন, ভাষার মাধ্যমে তাহাকেই রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষার আড়ম্বর নাই, অলঙ্কারের বৈচিত্র্য নাই। অথচ একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকের মর্মকথা ভারতকথায় রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখে যাঁহার কবিতার যাত্রা শুরু, সমগ্র ভারতের দুঃখে তাহার পরিণতি। ভারতের জাতীয় অবস্থার চিত্র বর্ণনা করিতে স্থানে স্থানে তিনি যেরূপ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

"ভারত সৈরিন্ধ্রী[১৬৬] বেশে আছে বিরাটের[১৬৭] ঘরে,
দুর্ভাগ্য পাণ্ডব-পঞ্চ তাহারি দাসত্ব করে।

---

১৬৬. সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহবাসিনী স্বাধীন শিল্পকারিণী বা পরগৃহস্থিতা স্ববলা শিল্পকারিণী। এইরূপ 'সৈরিন্ধ্রী' হইতেছেন দ্রৌপদী। ইনি বিরাটরাজের ভবনে এক বৎসরকাল সৈরিন্ধ্রীর কার্য করিয়াছিলেন, সেই অবধি ইঁহার নাম "সৈরিন্ধ্রী" হইয়াছে।

১৬৭. বিরাটের ঘরে—মৎস্যদেশের রাজার নাম বিরাট। পত্নী সুদেষ্ণা, পুত্র উত্তর, কন্যা উত্তরা, শ্যালক কীচক। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে ইঁহার ভবনে অবস্থান করেন।

নাহি মান অপমান, নাহি যে কর্তব্যজ্ঞান,
নহে সে পাণ্ডব যেন, আছে দাস চিরতরে।
রাজদণ্ড পরিহরি, আছে ছদ্মবেশ ধরি,
কুলের কলঙ্ক-কঙ্ক ভালে না কি হবে পরে।
ত্যজিয়ে গাণ্ডীব ধনু, আবরিয়ে বীর তনু
নারী বেশে বৃহন্নলা—ভাবিতে প্রাণ শিহরে।
কেহ আছে অশ্বপাল কেহ বা আছে রাখাল
নাহি রে চৈতন্যবোধ—সূপকার বৃকোদরে।
পর-গৃহে পরাবিনী সৈরিন্ধ্রী-ভারত-বাণী
কীচকের [১৬৮] অত্যাচারে নিয়ত কাঁদিয়া মরে।”

—কবি গোবিন্দদাস স্বাধীনতার জাগ্রত প্রহরী ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য তিনি সাধনা করিতেন এবং অবসর পাইলেই বাঙ্গালীকে স্বাধীনতার বাণী শুনাইতেন। নিজের একটি কন্যার নাম পর্যন্ত ‘স্বাধীনতা’ (ডাকনাম) রাখিয়াছিলেন। ইহাতেই বোঝা যায়, তাঁহার অস্থি, মাংস, মজ্জায় ও সংস্কারের সঙ্গে স্বাধীনতাভাবটি কিভাবে মিশিয়াছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, গোবিন্দদাস প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যখন রাজকৃষ্ণ রায় সম্পাদিত “বীণা” নাম্নী কবিতা-প্রসবিনী পত্রিকায় জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা লিখিতেন, তৎকালে ‘কবি

১৬৮. কীচক—বিরাটরাজের শ্যালক, কেকয়রাজের পুত্র। বিরাটের শত্রু ত্রিগর্তরাজ সুশর্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি বিরাটরাজের অত্যন্ত প্রিয় হন। ইনি দ্রৌপদীকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া পড়েন। কৌশলে ইনি দ্রৌপদীকে স্বগৃহে লইয়া আসেন। দ্রৌপদী ভয়ে রাজসভায় পলায়ন করিলে ইনি রাজসভায় যান এবং তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়া পদাঘাত করেন। পরে ভীমের পরামর্শে দ্রৌপদী ইঁহাকে নাটগৃহে যাইতে বলেন। সেখানে স্ত্রী-বেশধারী ভীমসেনের সহিত মল্লযুদ্ধে ইনি নিহত হন।

কাহিনী', 'রুদ্রচণ্ড', 'ভগ্ন হৃদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন।

"বীণা" য় প্রকাশিত 'দুর্গোৎসব' উপলক্ষ্যে রচিত গোবিন্দদাসের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। স্বদেশকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, স্বাদেশিকতা বলিতে তিনি কি বুঝিতেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী—এই তিনদিন বাঙ্গালীর নিকট বড় প্রিয়। কারণ 'দুর্গোৎসব' বাঙ্গালীর নিকট সামাজিক উৎসব। সারা বৎসরের দুখঃ-কষ্ট ভুলিয়া বাঙ্গালী এই তিনদিন মাতিয়া উঠে আনন্দে এবং 'আনন্দময়ীর আগমনে'র মধ্য দিয়া বাঙ্গালী তাহার গার্হস্থ্য জীবনের অতি পরিচিত ছবিকে যেন দেখিতে পায়। কবি তাই বলেন—

"বৎসরের যত দুঃখ এই তিন দিন
অভাগ্য ভারতভূমি ভুলিবে নিশ্চয় ঃ
পর পদাঘাত সহ চির পরাধীন—
ভারতে স্বাধীন প্রাণ তিন দিন রয়।
ভীরু কাপুরুষ চির সাহসবিহীন—
বাঙ্গালীর হাতে খড়্গ এই তিন দিন।

* * *

এই দিন ভারতের কত পুণ্যময়
স্বাধীন শশাঙ্ক হাসে পূর্ণ নিরমল।
স্বাধীন মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি—দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময়
উজ্জলে অনন্ত দূর সাগরের তল।
স্বাধীন মলয়ে ধীর শীত সমীরণ,
যেখানে সেখানে সুখে নাচিয়া বেড়ায়,
স্বাধীন কুসুম হাসে—লতার যৌবন।
স্বাধীন তারকা ফোটে আকাশের গায়।

ক্ষুদ্রতম বালুকণা উচ্চ হিমালয়,
স্বাধীন ভারতে সবি স্বাধীনতাময়।
অনন্ত প্লাবন যদি—অনন্ত সময়
ভাসায় ভারতবক্ষ ক্ষতি কিবা তায়?
অষ্টাদশ কোটী এই ভারত তনয়
দুর্ভিক্ষ রাক্ষস যদি চিবাইয়া খায়,
দুঃখিনী ভারতভূমি। কি বলিব আর—
একটি তণ্ডুল কণা, একটি সন্তান
থাকে যদি অবশিষ্ট, জননী তোমার
অম্বিকার পদে দিও শেষ বলিদান।
সবিনয়ে জিজ্ঞাসিও সারদার কাছে
"দুঃখের তামসী-নিশি কতদিন আছে?"

"বীণা"য় প্রকাশিত কবি গোবিন্দদাসের 'নিরন্ন কবি' শীর্ষক কবিতাটি যেন তৎকালীন অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভারতের একখানি অভিনব চিত্রপট। কল্পনার তুলিতে কবি অতীত ভারতে লঙ্কাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চিত্র পাঠকের চক্ষুর সম্মুখে ধরিলেন এবং চিতোরের পতন দেখাইয়া বলিলেন—

"হিন্দু-সূর্য্য যথা ডুবো ডুবো হ'য়ে,
সোনার কিরণে পুরিল দেশ—
শেষ রশ্মিজাল, হায় রে ভারতে
জনমের মত সেইত শেষ"।

কবি বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতেন—'উদিবে রবি আমাদের খুনে রাঙ্গিয়া পুনর্বার'। তবে কবির হতাশাও অমূলক নয়, ভারত অখণ্ড স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে নাই। তখন ভারতে অমানিশা ঘনাইয়া আসিয়াছে—চারিদিকে ভূত ও পিশাচের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে। দিকে দিকে যেন শবের রাজত্ব, শিবাকুল উল্লাসে প্রমত্ত।

এই ভয়াল ভয়ঙ্কর দৃশ্যে কাহার না হৃদকম্প উপস্থিত হয়? কবি লিখিলেন—

"পোহাবে না এই তামসী রজনী
উঠিবে না রবি—হ'বে না প্রভাত—
বাঁচিবে না প্রাণে ভারত সন্তান।
জনমের তরে নিপাত।—নিপাত।"

'নিপাত।—নিপাত'—বলিয়া কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্তেই কল্পনার নেত্রে দেখিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যাপার :—

"সেই অস্তমিত রবি জনমের মত
শেষ রশ্মিজাল ত্যজিয়ে ধরা,
ভারত হৃদয়-আকাশে পড়িয়া
কালো মেঘখানি ছুঁইল ত্বরা।
সেই বিশ্বত্রাস বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ
সে কর স্পর্শনে নির্জীব হিমাঙ্গে
অচিরে হইল জীবন সঞ্চার।
মুহূর্তেক তরে ভাতিল অশনি
মুহূর্তেক তরে ভাতিল ভারত,
মুহূর্তেক তরে পাইল জীবন
ভারত সন্তান-কাল-নিদ্রাগত।"

তখন কবি-হৃদয়ে আশার উদ্দাম তরঙ্গ বহিতেছে—

"দেখালো কম্পনে। সেই বিদ্যুজ্জ্যোতি
ভাগীরথী বক্ষে কেমনে ভাসে,
পর্ব্বত কন্দর আদি তৃণদল
সে অট্টহাসিতে কেমনে হাসে।"

কবি যেন চক্ষুর সম্মুখে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখিতেছেন—

"দেখিব কেমনে মৃত কলেবরে
পুনঃ প্রাণ পায় ভারতসন্তান,
দেখিব কেমনে গলিত হৃদয়ে
দেব-রক্তস্রোত হয় বহমান।
স্বর্গীয় সৌরভে পুরিয়া দিক
হাসিবে ভারত আমরা হাসি,
নয়ন ভরিয়া আশা মিটাইয়া
দেখিবে ভূলোক দ্যুলোকবাসী।"

পরক্ষণেই কবির স্বপ্ন ও সাধনায় যেন নারী-জাগরণের চিত্র ফুটিয়া উঠিল। বাঙ্গলার কোন কবির কাব্যে এই ধরনের নারী-জাগরণের চিত্র আছে কিনা সন্দেহ। তাহা ছাড়া, কবি যখন এই কবিতা রচনা করেন, তখনও তুর্কিতে, চীনে, পারস্যে, মিশরে নারী-জাগরণের সৃষ্টি হয় নাই। তিনি লিখিলেন—

"দেখিব স্বাধীনা কামিনী সমাজে
কাঁচুলি খসায়ে সাঁজোয়া পরে,
দেখিব কেমনে ও কর-কমলে
কুসুম থুইয়ে কৃপাণ ধরে।
দেখিব স্বাধীন বদনের জ্যোতি
কুন্দ দন্তে চাপি অধরে ধরে,
নাচিবে স্বাধীনা উড়ায়ে অঞ্চল
স্বাধীন ভাবেতে ঢলিয়া পড়ে।"

উপসংহারে কবি অনাগত ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি দেখিতে পাইবেন না বুঝিয়াই যেন লিখিলেন—

"দেখালেন কল্পনে। সে মহা-ভারত
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ছবি,

দেখিবি কেমনে? পারি না দেখিতে,
তুই ভারতের নিরন্ন কবি।”

কবিতাটি ভাবে-ভাষায়, সুরে, ছন্দে ও অলঙ্কার-মাধুর্যে অপূর্ব। যে রূপ রসের আধার, সেই রূপটি ‘বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি’ যে বিকশিত হইয়া উঠে না, তার মূলেও যে বিশেষের মৃত্তিকার স্পর্শ আছে, তাহা কবি গোবিন্দদাসের কবিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোঝা যায়। তাঁহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও প্রশংসার দাবী রাখে।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার নবজাগরণের যুগ, স্বদেশী যুগ—দেশমাতৃকার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইবার যুগ। এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র বংলাসাহিত্যের মাধ্যমে স্বদেশবাসীর প্রাণে দেশাত্মবোধের উদ্দীপনার সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। ‘আমার বাড়ী’ কবিতায় কবি গোবিন্দদাসের বক্তব্য—

“কোথা বাড়ী, কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই,
হায় সে দুঃখের কথা, মলিন মরম ব্যথা,
প্রাণপণে আমি যে তা ভুলে যেতে চাই।
যে দেশে আছিল ঘর, আমি সে দেশের পর।
সে-দেশে যাইতে মোর অধিকার নাই।
কোথায় বসতি মোর শুনিয়া কি ফল?
তুমি কি পারিবে তার ঘুচাইতে হাহাকার,
মুছাইতে আঁখি ভরা শোক অশ্রুজল?”

তৎকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কবি গাইলেন—

“বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হ’তে হইয়াছে, কোথায় পতন।

কোথা ধর্মে অনুরক্তি, কোথা সে-বিশ্বাসভক্তি,
কোথা সে সত্যনিষ্ঠা, কোথা সংযমন,
কোথা সেই শমদম, সকল সহনক্ষম,
বিলাস-ব্যাকুল বঙ্গ যায় রসাতল।"

নির্বাসিত গোবিন্দদাসের অপর একটি কবিতায় আক্ষেপের সুরে বিরল চমৎকারিত্বের আস্বাদন পাওয়া যায়—

"পাখীও তো গাছের ডালে
আপন বাসায় শাবক পালে,
আমার নাই সে আশা
নাই সে বাসা
কেমন বিপদ, কি সঙ্কট।
আমি থাকি পরের বাড়ী
নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি
বাপ-দাদার সে ভাঙ্গা ঘাট।"

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কবি গোবিন্দদাস বাঙ্গালী জাতিকে সার্বজনীন ভ্রাতৃভাবের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

"এস ভাই ভিন্ন ভাব করি পরিহার,
এস ভাই এক প্রাণে, এক ধ্যানে, এক জ্ঞানে,
অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার॥
রাখি এ অনন্ত হস্ত, সে কার্য সাধনে ন্যস্ত,
পবিত্র মহান সত্য করিতে উদ্ধার।
(এস) অনন্ত জীবনে করি এক অঙ্গীকার।"

তখন ঢাকা এবং তৎপার্শ্ববর্তী জেলায় প্রয়ই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হইত। আত্মঘাতী ও সাম্প্রদায়িক এই বিদ্বেষ কবিকে অত্যন্ত

বিচলিত করিয়াছিল। ফলে 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক কবিতায় কবি লিখিলেন—

"হিন্দু-মুসলমান।
দু'জনাতে হও হে মাল্লা, মাঝি কর খোদাতাল্লা,
ভাসিয়ে দিয়ে জীবন-তরী দাঁড়ে মারো টান'।
হাজার বজ্র হানুক মেঘে, চলুক তুফান ভীষণ বেগে,
আসুক ধেয়ে আকাশ ছেয়ে প্রলয়-ডাকে বাণ।
ভক্তিভাবে কর্ম কর, কিংবা বাঁচ কিংবা মর,
ঘোর তরঙ্গে ভায়ে ভায়ে কবুল কর জান্।
বেহেস্তে ফেরেস্তা গুন, ডাকছে সবে পুনঃপুনঃ,
নায়ের উপর পাল তুলে দাও মায়ের আঁচল খান,
ও ভাই, হিন্দু-মুসলমান।"

শুধু হিন্দু-মুসলমানের একতা নয়, কবির স্বপ্ন—অখণ্ড ভারতবর্ষের সার্বিক ঐক্যবোধ। "আমরা "হরিহর" কবিতায় কবির বক্তব্য—

"আমরা হরিহর।
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম,
হোক না মোদের সহস্র নাম,
একই দেহের রক্তমাংস আমরা পরস্পর।
আমরা নাগা, আমরা গারো,
কেহই তো পর নহি কারো,
খর্গী-বর্গী-গুর্খা-জাঠ, আর পার্শী সওদাগর।
পণ্ডিচেরী, ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত-ভাঙ্গা,
কেউ বা কালো, কেউ বা রাঙ্গা, একই কলেবর।

কেউ বা চরণ, কেউ বা হস্ত,
বক্ষ, চক্ষু, ললাট, মস্ত,
মৃত্যুঞ্জয়ী হবি যদি মায়ের পূজা কর্।
আয়রে পূজি মায়ের চরণ, মায়ে দিবেন বর॥"

কবি গোবিন্দদাসের এইরূপ বহু কবিতায় সর্বকালের, সর্বজাতির সার্বজনীন আবেদন অভিব্যক্ত হইয়াছে। পরবর্তী জীবনে, এই নিশ্চেষ্ট অথচ মুখ-সর্বস্ব জাতির, প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের পরিবর্তে নিষ্ফল আন্দোলনের আতিশয্য দেখিয়া, ১৩১৪ সালে কবি ঘৃণার সুরে লিখিয়াছিলেন—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে ?
এদেশ তোদের নয়।
কার স্বদেশে কাদের মেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর সাড়ী কেড়ে লয় ?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ-কানা-খোঁড়া,
ভিস্তিওয়ালা পাঙ্খাকুলী পিলা ফাটার ভয়
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়।"

কবি গোবিন্দদাস ত্যাগের আদর্শে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বিলাসিতার প্রতি তাঁহার কোনদিনই নজর ছিল না। যে বিলাসিতা-বর্জনের জন্য আজকাল চারিদিকে আলোড়ন-আন্দোলন দেখা যাইতেছে, সেই কথাটা ১৩০১ সালে তিনি বাঙ্গালীকে সুকৌশলে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন—

"কার্ত্তিক ! তুমি কি সেই দেব সেনাপতি ?
তোমারে পূজিলে মেলে, তব সম বীর ছেলে,
সে নাশে তোমারি মত দেশের দুর্গতি ?
সে ফেলে সজোরে ছিঁড়ি, জননীর দাসীগিরি,
তাহারো কি পদভরে কাঁপে বসুমতী ?

তারো কি হিমাদ্রি লঙ্কা, বাজে সে বিজয় ডঙ্কা,
তাহারো চরণে বিন্ধ্য করে কি প্রণতি ?
হায় সে ছেলের লাগি, সারা রাত জাগি জাগি
করে কি তোমার পূজা যত কুলবতী ?
ছাড়িয়া বীরের সাজ, আসিতে হ'ল না লাজ,
তোমারো এখানে এসে ফিরে গেল মতি ?

* * * *

এ বেশে তোমারে পূজি কি ফল আমি না বুঝি
জন্মে শুধু কতগুলি পাপ জড়মতি।
পরিচ্ছন্ন ফুল-কোঁচা ব্যবসা পেনের খোঁচা
পদাঘাতে পীলাফাটা—এই শেষ গতি।
যাহা কিছু উচ্চ শিক্ষা, উদ্দেশ্য দাসত্ব ভিক্ষা
ছোট বড় সকলের একই পদ্ধতি।"

আবার ১৩২৪ সালে—মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে কবি লিখিলেন—

"বিলাসে বাঙলা ভাসে অধঃপাতে যায়।
ঘরে নাহি মুষ্টি অন্ন, অনশনে অবসন্ন
বিকাইয়া ভিটামাটী গেছে ঋণ দায়।
তথাপি অটো ডি রোজ, মাখা চাই রোজ রোজ
পিয়ারের প্রিয় সোপ মাখা চাই গায়।

* * * *

বিলাসে বাঙ্গলা ভাসে—রসাতলে যায়।
পথের মজুর কুলি, অভুক্ত সন্তান ভুলি
চায়ের পেয়ালা পিয়ে প্রভাতে সন্ধ্যায়।
রোজ সিগারেট ছাড়া ধূম নাহি পিয়ে তারা,
কে জানে ইহার বাড়া পতন কোথায় ?

সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল,
ভিখারীর ভাঙ্গা ঘরে, লেস্ পেড়ে শাড়ী পরে,
সেমিজে, কামিজে, গাউনে উড়ে পরিমল
সুগন্ধি আল্‌তা পায়, ফোটে যেন আঙ্গিনায়
শরত প্রভাতে হায় রক্ত শতদল।
এ পরী পোষিতে গিয়া, কতঘর দেউলিয়া,
নীরবে নিশীথে ঝরে কত অশ্রুজল,
সৌরভে ব্যাকুল বঙ্গ—বিলাসে বিহ্বল।

*　　*　　*

বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ—মোহে অচেতন
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হতে হইয়াছে কোথায় পতন।
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবলি কামের রঙ্গ
তাহারি ঔষধ খোঁজে—তারি বিজ্ঞাপন।
এ নহে কুৎসিত কথা, এ ত নহে অশ্লীলতা,
এ যে গো জাতির এক বীভৎস রমণ।"

কবি গোবিন্দদাসের প্রতিটি কবিতাই পরম রমণীয় চিত্রের মত, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তব মূল্যায়ন। যথা—

"রাখ মা ভারতবর্ষ যায় রসাতলে
বাণিজ্যে নাহি মা মতি, দিন দিন অধোগতি
একটি শ্রীমন্ত[১৬৯] আর যায় না সিংহলে
শুধু যায় কর্মদোষে, 'অষ্ট্রেলিয়া মরিশসে'
আপনা বেচিতে যায় কুলি দলে দলে,
বেচিয়া চুরুট পান, অষ্টাদশ কোটী প্রাণ
বাঁচিতে পারে কি বল—কতদিন চলে?"

---

১৬৯. শ্রীমন্ত—মুকুন্দদাসের "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে দেবখণ্ড ছাড়াও মর্ত্যখণ্ডের

যে কবি গোবিন্দদাস একদিন পূর্ণ যৌবনে, সারদাসুন্দরীর প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া স্থুল প্রকৃতির মধ্যে মগ্ন হইতেন এবং আত্মহারা হইয়া প্রণয়-প্রসঙ্গে গগনের চন্দ্রকে বলিতেন—

"তুমি কি হে সেই চন্দ্র সে দিন কি ছিলে?
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে?

*   *   *

চাহে সে আমারে যেন করিবারে পান
উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা তার করিতে নির্বাণ।
মর্দ্দিয়া মথিয়া মোরে লুঠিয়া সে নিলে,
আমতলে চুমো খেতে তুমি দেখেছিলে?"

সেই কবি গোবিন্দদাস, একদিন দেশপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া সেই চন্দ্রকেই বিভিন্ন মূর্তিতে দেখিয়াছিলেন—

"কি ক'রে কঠিন এত হ'লে শশধর?
আহা হা ভারতভূমি,   কি ক'রে দেখিয়া তুমি
ধৈরয ধরিয়া আছ কাঁদে না অন্তর?
যে দেশের বসুন্ধরা,   গোলকুণ্ডা হীরা ভরা,
বহিছে কনকরেণু পর্বত নির্ঝর।
যে দেশে তোমার মত,   ওঠে শশী শত শত,
ইন্দিরা অমৃত সহ মথিলে সাগর।

কাহিনীতে দুইটি ভাগ আছে। প্রথমটি কালকেতু-ফুল্লরা কাহিনী, দ্বিতীয়টি ধনপতি-খুল্লনা কাহিনী। ধনপতি-খুল্লনার পুত্রের নাম শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার পিতা সিংহলে ব্যবসা করিতে গিয়া নিরুদ্দেশ। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে গিয়াছে এবং সমুদ্রপারে, সিংহলরাজের কারাগারে পিতার সাক্ষাৎ পাইয়াছে। সেকালে সিংহল ও বহির্দেশে ভারতবর্ষের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত। এখন আর চলে না বলিয়াই কবির দুঃখ।

সেই দেশে হায় হায়, সন্তান চিবায়ে খায়,
ক্ষুধার্ত জননী নিত্য পূরিতে উদর।
বল শুনি কোন্ প্রাণে, চেয়ে সে মায়ের পানে
কি করিয়া তত হাসি হাস শশধর,
নর-দুঃখে অমর কি হয় না কাতর?

তারপর দেশের দুঃখের চিত্রপট খুলিয়া কবি দেখাইতেছেন—

"দুঃখ-দরিদ্রতা ভরা, দেখ নাকি বসুন্ধরা
নানা রোগে শোকে হেথা ক্লিষ্ট কলেবর।
কাঁদে কত পুত্রহীনা, ভগিনী সোদর বিনা,
দিবা নিশি বিধবার নয়নে নির্ঝর,
বিড়ম্বিত মোর মত, আছে হতভাগ্য কত,
প্রাণভরা ধু ধু করে মরু ভয়ঙ্কর।
ইহা দেখি নিত্য নিত্য, না হয় ব্যথিত চিত্ত
বসন্তের হাওয়া খেয়ে বেড়াও নাগর?"

অন্যদিকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা—মানবের অধঃপতনের কাহিনী সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিলেন—

ঘৃণা লজ্জা ঈর্ষা দ্বেষ, পাতকের একশেষ,
চৌর্য্য হত্যা দস্যুবৃত্তি নিয়ত যেখানে
ভগিনী ভ্রাতার সনে, কথা কয় পাপমনে,
প্রবঞ্চিত করে জায়া প্রেম প্রতিদানে
নরের সে অধোগতি, নিরখিয়া নিশাপতি
সত্যই করুণা কি হে হইল না প্রাণে?"

স্বদেশ ও স্বজাতির লজ্জা—কবি নিজের লজ্জা বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহা নির্ভীকভাবে বলিবার ক্ষমতাই আত্যন্তিক স্বদেশপ্রীতির লক্ষণ। কবি গোবিন্দদাস 'জাতীয় কবি' ছিলেন বলিয়াই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক্-এর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন এবং

জাতীয় গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। জীবন-সায়াহ্নে কবি ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতিকে পৃথিবীর অধম জাতি বলিয়া মনে করিতেন। উপদেশ, তাড়নায়, লাঞ্ছনায় ও অপমানেও যে জাতির চৈতন্য হয় না, কবি তাহাদিগকে পিপীলিকার অধম মনে করিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালে তিনি "পিপড়া" নামে যে কবিতা লেখেন, তাহার এক স্থানে আছে—

"ওগো পিপ্‌ড়ার সারি—
তোমরা উদ্যমে বড়, অবিশ্রান্ত কর্ম কর,
বিরত বিলাস ভোগে ঋষি ব্রহ্মচারী,
তোমরা সঞ্চয়ে বড়, পৃথিবী ভ্রমণ কর,
জগতের ধন ধান্য আহরণকারী,
তোমরা যে এত বড়, নীরবেতে কর্ম কর
কর না বক্তৃতা—সভা হাটে ঢোল মারি,
তোমরা নহ গো হীন, নরাধম পরাধীন,
গোলাম লস্কর নহ সেবক ভাণ্ডারী,
নিজে কর নিজ কাজ, নিজে নিজ মহারাজ
নিজেই নিজের প্রজা, আইন আপনারি।"

মৃত্যুর অতি অল্প সময় পূর্বে, নিতান্ত নিরাশায় মগ্ন হইয়া কবি গোবিন্দদাস 'শমী গাছ' নামক কবিতায় স্বীয় অন্তর্গূঢ় বেদনার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন—

"ও কবিতা লিখ্‌ব না আর
আমার, কলম থুয়েছি শমী গাছে,
আমার এখন ছদ্মবেশ, নয় সুখ দুঃখ ক্লেশ,
ছদ্ম আমার যোগ তপস্যা, ছাম সাধন রহিয়াছে।

জগতের জঘন্য জীব,　　　　হয়েছি নপুংশক ক্লীব,
মানুষের আর অধঃপতন ইহার চেয়ে আর কি আছে ?
মেথর মুচি সেলাই-বুরুষ　　আর কি আছে অধম পুরুষ ?
বীরের জায়া, আজ সে আয়া দাস্য কষ্টে জীবন বাঁচে।
আমার, কলম খুয়েছি শমী গাছে।”

গোবিন্দদাস শুধু বাংলার কবি, ভাওয়াল কবি, প্রকৃতির কবি, জাতীয় কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবদরদী, মহামানবের কবি। তাই যখন মহাচীনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি আত্মহারা হইয়া লিখিয়াছিলেন—

“এই যে আছি মৃত্যু শয্যায়, নাইক শক্তি অস্থি মজ্জায়,
কর্ণে শুনি শুধু চীনের জয়ধ্বনি বজ্র ভৈরব,
নবোদ্যমে নবোৎসাহে নব জীবন হয় অনুভব।

*　　*　　*　　*

রাম-লক্ষ্মণের লঙ্কা জয়ে, যুধিষ্ঠিরের অভ্যুদয়,
অশোকের সে দিগ্বিজয়ে, এভাব মনে হয়নি উদ্ভব,
জাগে নাই আর এমন হর্ষ, আজকে যেমন ভারতবর্ষ,
বর্ণে নাই আর কোন কবি এমন ছবি দেবদুর্লভ।
তিন দিনে চীন হ'ল স্বাধীন, জগৎ ভরা জয় জয় রব।

‘জীবনে জীবন যোগ করাই ছিল কবি গোবিন্দদাসের কাব্যের মূল কথা। তাই তাঁর কবিতা কোন স্বপ্নবিলাসীর ভাববিলাস নহে, স্বদেশের প্রতি আত্যন্তিক অনুরক্তিই মূল কথা। অকৃত্রিম দেশভক্তির কবিতা-রচনায় কবি গোবিন্দদাস ছিলেন অদ্বিতীয় ও অনবদ্য। প্রাণের কথা—সরল ভাবে ও সরল ভাষায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—

"কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী
জনমে পুরেনি আশা, পাই নাই ভালবাসা
নাহি মোর পুত্র-কন্যা, ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী।
যথাপি জনমভূমি আছিলে আমার,
ভার্য্যা সমা অতি প্রিয়, মাতৃসমা অদ্বিতীয়
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃ দেবতার,
স্নেহের পবিত্র মূর্ত্তি কন্যা করুণার।

* * *

প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম স্নেহ
সামন্ত পল্লীতে বাস করিয়াছি বার মাস
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ,
শত মুখে বাগ্মী বেশে বলি নাই দেশে দেশে
তোমারে করেছি যত ভক্তি প্রেম স্নেহ
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।"

এই যে স্বদেশের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা—ইহাই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম বা দেশাত্মবোধ। কবির হৃদয়ে কি অপরিমেয় দেশপ্রেম জাগ্রত ছিল, তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই কবিতাটি। নিজের ক্ষুদ্র পল্লীকে, স্বীয় জন্মভূমিকে যিনি প্রাণের মত ভালবাসিতেন, তিনি সমগ্র ভারতভূমিকে শ্রদ্ধা করিতে, ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে যে কতখানি অধিকারী ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

কবি গোবিন্দদাসের মুদ্রিত শেষ কবিতা "অসুর পূজা" নামে ১৩২৫ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হয়। ইহাতেও সেই পুরুষসিংহের মত প্রাণমাতানো বক্তৃতা, শৌর্য-বীর্যের স্তুতিগান ও মুক্তকণ্ঠে স্বদেশপ্রীতির প্রশংসা বিদ্যমান। "অসুর"

শব্দের নিন্দার্থক প্রচলিত থাকিলেও তিনি অসুরকে বন্দনাই করিয়া গিয়াছেন। ইহার গূঢ় রহস্য রসজ্ঞের নিকট সহজেই অনুমেয়—

"ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্বিজয়
শৌর্য্য তোমার, বীর্য্য তোমার অনন্ত অক্ষয়।
ধন্য তোমার স্বদেশপ্রীতি, ধন্য তোমার অসুরনীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য স্মৃতি বিনাশ করে ভয়।
তোমার ভীষণ রুদ্র মূর্ত্তি স্বাধীনতার অগ্নিস্ফূর্ত্তি
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা বিশ্বজয়ের বিপুল আশা,
এক নিমেষে করে সে যে জগৎ জ্যোতির্ম্ময়।
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি ঠেলে উঠছে সকল শক্তি
ধবল গিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।
রক্ষিতে স্বজাতির সত্ত্ব, দেখে নাই আর এমন মত্ত
বীরত্বের মহত্ত্বের আর এমন অভ্যুদয়।
গুলির মত পণ প্রতিজ্ঞা ধুলির মত নয়।

কবির জীবন-মন্ত্রই ছিল স্বদেশ-মন্ত্র এবং সঙ্কল্প ছিল—সাম্য-মৈত্রী ও স্বাধীনতার জয়গানে মরণপণ সংগ্রাম। তাই তো কবি বলেন,—'মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয়?' 'তাড়কার বন', 'জন্মাষ্টমী' ও 'স্বাধীনতা' প্রভৃতি কবিতায় কবি এই সুরেই গান গাহিয়াছেন। বাংলাদেশে বহু প্রতিভাবান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এমন স্বদেশপ্রেমিক কবি বড় একটা দেখা যায় না। কবি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন।" স্বদেশপ্রেমিক কবি গোবিন্দদাস সম্পর্কে এই উক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

নবম অধ্যায়

॥ গোবিন্দদাসের সাংসারিক জীবন ॥

কাব্য-জীবনে গোবিন্দদাস উপেক্ষিত হইলেও সাংসারিক জীবনে তাঁহার ভূমিকা ছিল অনন্য। অর্থের দিক্ দিয়া গরীব হইলেও প্রেম-প্রীতি-ভালবাসায় তিনি ছিলেন ধনী। তাঁহার নিকট দাম্পত্য জীবনের মূল কথাই হইতেছে প্রেম এবং তাহা দেহজ। ইংরাজীতে যাহাকে "Divine Love" বলে, তাহা তাঁহার নিকট কষ্টকল্পিত। তাঁহার নিকট প্রেম ছিল অস্থি-মাংস-মজ্জা সহ একটি পরিপূর্ণ মানুষের ভালবাসা। কবি বলেন—

"আমি তারে ভালবাসি অস্থি মাংস সহ।
আমি ও নারীর রূপে
আমি ও মাংসের স্তূপে
কামনার কমনীয় কেলী কালীদহ—
ও কর্দমে—ওই পঙ্কে,
তাই ক্লেদে—ও কলঙ্কে,
কালীয় নাগের মত সুখী অহরহ।
আমি তারে ভালবাসি রক্তমাংস সহ।"

কবির জীবন-বৃত্তে ছিল এই একটি মাত্র সুর—"আমি তারে ভালবাসি রক্ত মাংস সহ"। এই সুরেই বাঁধা ছিল তাঁহার সংসারিক জীবন। এই জীবনের পাশাপাশি বিরাজ করিয়াছে কবির জীবন-সাহিত্য।

কবির সাংসারিক জীবন-কোটির একদিকে ছিল সারদা এবং অপর দিকে ছিল প্রেমদা। পনেরো বৎসর বয়সে সারদাসুন্দরীর সঙ্গে গোবিন্দদাসের বিবাহ হয়। সারদাসুন্দরীর পিত্রালয় জয়দেব-

পুরেই। তথাপি কবি সাময়িক পত্নীবিরহও সহ্য করিতে পারিতেন না। গোবিন্দদাসের বাড়ী ও শ্বশুরালয়ের মধ্যে ব্যবধান একটি মাত্র দীর্ঘিকার। সারদাসুন্দরী অল্প কয়েক দিনের জন্য যখন পিত্রালয়ে যাইতেন, তখন এই পত্নীপ্রেমিক কবি পত্নীকে দেখিবার ইচ্ছায় ব্যাকুলভাবে দীঘির এপার হইতে ওপারে চাহিয়া থাকিতেন। সারদাসুন্দরীরও মনের অবস্থা এইরকম হইত। ইহাতেই বোঝা যায়, উভয়ের মধ্যে মনের খুব মিল ছিল এবং উভয় উভয়কে খুব ভালবাসিতেন। কবির পত্নীপ্রেমের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ—"প্রেম ও ফুল" এবং "কুঙ্কুম"। এই কাব্য দুইটিতে গোবিন্দদাস প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কবি সারদাসুন্দরীকে ছাড়িয়া প্রবাসে শান্তি পাইতেন না। এমন কি, স্ত্রী-বিরহে কাতর হইয়া ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া চাকরি বা নিরাপদ আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। সুসঙ্গে থাকিয়া কবি সারদাসুন্দরীর প্রেম-স্মৃতি স্মরণ করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

"এ দূর পর্বত দেশে এ বিজন বনবাসে,
এই যে একাকী বসি গভীর নিশায়,
নিমগ্ন তোমার ধ্যানে, জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা প্রাণে
আকুল হৃদয়ে দেখি—শশী অস্ত যায়।"

প্রেম-বেদনায় প্রপীড়িত কবি আবার লিখিলেন—

"আজ—এই যে পর্বততলে এই গারো দেশে,
নির্ব্বাসিত বিড়ম্বিত বিধির আদেশে।
আসিয়াছি দেশ ছাড়ি, তথাপি তিষ্ঠিতে নারি,
সেই মোহ—সেই মূর্চ্ছা স্বপন আবেশে।"

—দিন যায় রাত আসে, রাত যায় দিন আসে। আর কবির বিরহ-ব্যথা ক্রমেই বাড়ে। অবশেষে নির্বাসিত যক্ষের মত মেঘের নিকটে

প্রেম নিবেদন না করিয়া মনের দুঃখে নিজের উপর অভিমান করিয়া চন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"সুবিশাল গারো গিরি এই যে উত্তরে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভর দিয়া, উঠিয়াছে দাঁড়াইয়া,
উন্নত-ললাট গিয়া ঠেকেছে অম্বরে,
উহার পাষাণ বুকে, চাহি যবে উর্দ্ধ মুখে,
কতই সান্ত্বনা পাই, প্রাণ যেন ভরে।"

* * *

পর্বত পার্থিব প্রাণ দিয়া বিসর্জন,
অনন্ত প্রেমের যেন করিছে সাধন।
এসেছে ছাড়িয়া নারী, প্রেম তারি—দেশ তারি,
রেখেছে পাষাণে প্রাণ করি আচ্ছাদন।
নয়ন করিয়া অন্ধ, নিশ্বাস করিয়া বন্ধ,
রমণীর রূপ গন্ধ করে না গ্রহণ।
এই পর্বতের মত, প্রেম তৃষ্ণা অবিরত
শশাঙ্ক। আমারো প্রাণে জাগিছে এখন"।

—পত্নীপ্রেমিক কবি এইভাবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সোমেশ্বরী নদীর নির্জন তীরে একাকী বসিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এই অশ্রু সোমেশ্বরী নদীর জলের সঙ্গে মিশিয়া উতাল-পাথাল করিতে করিতে প্রেমিকার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইত। বিরহিনী প্রিয়ার মত কবিপ্রিয়াও অনুরূপভাবে ভাবিত থাকিতেন। এই দাম্পত্য জীবনের বিরহের দৃশ্য আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় কবির সাংসারিক জীবনের মধুর স্মৃতির কথা। আর্থিক দৈন্য মনের দীনতা সৃষ্টি করিতে পারে নাই, পারে নাই অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট করিতে। প্রেমের এমনি মহিমা! এই মহিমার জয়টিকা কপালে পরিয়া কবি জীবন-সংগ্রামে

সংগ্রামী হইয়াছেন। প্রবাসে থাকাকালীন কবি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর নিকট বিদায়-মুহূর্তে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় :—

"চলিলাম প্রিয়তমে প্রেয়সি আমার
অনলে কুসুম ভস্ম দেখিব না আর।

* * *

কত কষ্ট দিয়াছি জীবনে তোমার
যাই প্রিয়ে, সে সকল করিও না মনে,
জানি আমি এ জীবনে ক্ষমা নাই তার
চাও একবার শেষ প্রীতির নয়নে।
যাইরে অবোধ শিশু।—হে করুণাময়,
দীনবন্ধো। বাঁচাইয়ো এ দীন সন্তান,
স্বর্গের করুণা তব চির সুধাময়,
রাখে যেন অভাগিনী দুঃখিনীর প্রাণ।
এমন আত্মীয় নাই একজন আর
রক্ষিবে যে অভাগার দীন পরিবার"।

গোবিন্দদাসের জীবনের বৈশিষ্ট্যই হইল—"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির" এবং "বিত্ত হতে চিত্ত বড়" ও "অর্থের চেয়ে মান বড়"। আর সেই মানসিকতার জন্যই তিনি প্রিয়তমা পত্নী ও শিশু-কন্যাকে ভগবানের নামে রাখিয়া ভাওয়াল রাজসভা পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও ন্যায়কে অবলম্বন করিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও মনুষ্যত্বতা এইভাবে প্রকাশিত হওয়ায় সাংসারিক জীবনে তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক সৈনিক।

ভাওয়াল রাজবাড়ীর কার্য পরিত্যাগ করিবার পর কবির আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়া পড়ে—দিন আনেন দিন খান,

এইরূপ এক শোচনীয় অবস্থা। এই সময়কার শোচনীয় অবস্থার কথা তিনি তাঁহার কাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

"প্রিয়ে দুখিনি আমার।
প্রাণপণে অবিরত, যতন করিনু কত
মুছিতে পারিনু কই শোকাশ্রু তোমার।
শতগ্রন্থি ছিন্নবাস, একাহার উপবাস,
এ জনমে অভাগিনি ঘুচিল না আর।"

মানুষের জীবনে সুখ ও দুঃখ দুই-ই আসে, উত্থান ও পতন হয়, কিন্তু কবি গোবিন্দদাসের জীবনটা যেন একটানা দুঃখের পাঁচালী, বারো মাসের তের পার্বণের পরিবর্তে বারোমাসের "বারমাস্যা"।

গোবিন্দদাসের সন্তানাদি জন্মিবার পূর্বেই তাঁহার মাতা এবং অন্যতম অভিভাবিকা পিতামহী পরলোকগমন করেন। কবির মাতুলালয় ধীরাশ্রম গ্রামে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। পিতামহীর মৃত্যুর পর অন্য কোন অভিভাবক না থাকায়, কবি স্ত্রীকন্যাসহ শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেন। কিন্তু শ্বশুরের অবস্থাও ভাল না থাকায় "অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়"।

সারদাসুন্দরীর গর্ভে কবি গোবিন্দদাসের প্রমদা ও মণিকুন্তলা নামে দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ১২৮৪ সালের ১৫ই ফাল্গুন প্রথম সন্তান প্রমদা ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পরে ১২৮৬ সালের ২৫শে বৈশাখ প্রমদা মারা যায়। দ্বিতীয়া কন্যা মণিকুন্তলা এই সালেই জন্মগ্রহণ করে। তখনও কবি প্রবাসে যান নাই। এই নয়নের মণি 'মণিকুন্তলা'কে কবি খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু উপার্জনের তাগিদে কবি স্ত্রী ও কন্যা মণিকুন্তলাকে রাখিয়া যখন জমিদার কেশবচন্দ্রের চাকরি করিতেন, তখন ১২৮৮ সালে কবি "মণিকুন্তলা" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি এক গরীব পিতার মমতাময়ী এক কন্যার প্রতি ভালবাসার উৎকৃষ্ট

নিদর্শন। দুই বৎসরের শিশুকন্যা মণিকুন্তলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"সাধে কি রে ফুলশিশু আছি তোরে ভুলিয়া?
কোলে কোলে, বুকে বুকে,
রাখিতাম কত সুখে,
গলা ধরা হাত তোর কি করিয়া খুলিয়া—
কি পোড়া অদৃষ্ট ফলে,
ঠেলে ফেলে ভূমিতলে
হৃদয়ের মণি তোরে, আসিয়াছি চলিয়া,
কি করিয়া ফুলশিশু আছি তোরে ভুলিয়া"।

—'আছি তোরে ভুলিয়া' শুধু এই কথাটির মধ্য দিয়াই বোঝা যায় কবির পিতৃহৃদয়ের কি মর্মভেদী বেদনা, কাতরোক্তি, আন্তরিকতা ও কোমলতা। হৃদয়ের মণিকোঠায় যে মণি জ্বলিতেছে, সেই মণিই তো মণিকুন্তলা। রাজ্য যাহা দিতে পারে না, ঐশ্বর্য যেখানে শুধুই প্রাচুর্য, সেখানে একটি ছোট্ট শিশুর কাকলি, আধ-আধ বুলি আর চাঁদের মত হাসি মানুষকে "সম্রাট" করিয়া তোলে। এই 'সম্রাট' কোন রাজ্যের নহে, হৃদয়ের, শিশুরাজ্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এইরূপ বিজয়-বৈজয়ন্তী বড় একটা দেখা যায় না—

"ভুলিনু যদিও—তবু ওরে মণিকুন্তলা,
অধিক যতনে তোরে
রাখিবেক বুকে করে,
আদরে জননী তোর অভাগিনী অবলা।

* * *

তুই বিনে কেহ নহি,—অনাথিনী সরলা।
পাথম পাষণ্ড অতি
ছাড়িয়া গিয়াছে পতি,

দিবানিশি বিষাদিনী অশ্রুমুখী অবলা,
মা বলে ডাকিস্ আহা বাঁচাইতে সরলা"।

কবির পত্নীপ্রেম ও সন্তান-বাৎসল্য কি অপরিসীম! সুযোগ পাইলেই কবি তাহাদের দেখিবার জন্য প্রায়ই ভাওয়ালে আসিতেন। এই আকর্ষণ কবির নিকট ছিল মরুভূমিতে মরূদ্যানের মত।

১২৯২ বঙ্গাব্দ কবির নিকট এক দুর্যোগের বৎসর। কবি তখন সেরপুরের জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক পত্র 'চারুবার্তা'র কার্যাধ্যক্ষরূপে কাজ করিতেছিলেন। এই সময় হঠাৎ একদিন একখানি টেলিগ্রামে তিনি প্রাণপ্রিয়া সারদাসুন্দরীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। পত্নীগতপ্রাণ কবি এই সংবাদে বিচলিত হইয়া কালবিলম্ব না করিয়া জয়দেবপুরে রওনা হইলেন। তখন ময়মনসিংহ-জয়দেবপুরে রেলপথে উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু 'প্যাসেঞ্জার ট্রেন' চলে নাই। তৎসত্ত্বেও স্টেশন-মাস্টারের কৃপায় তার পরদিন 'গার্ডের' গাড়িতে বসিয়া কবি অপরাহ্নে প্রায় তিন চারি ঘটিকার সময় জয়দেবপুরে উপস্থিত হইলেন। সারদাসুন্দরী পিত্রালয়ে থাকায় বাড়ী আসিবার পথে 'চিলাই' নদীর তীরে এক জ্বলন্ত শ্মশান দেখিয়া কবির প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দ্রুতপদে পথ চলিয়া গোবিন্দদাস যখন বাড়ী পৌঁছাইলেন, তখন সারদাসুন্দরী মৃত্যু-পথযাত্রী। কবি পত্নীকে শেষবারের মত দেখিলেন বটে, কিন্তু পরস্পরের বাক্যবিনিময় আর হইল না। ১২৯২ বঙ্গাব্দে ১২ই অগ্রহায়ণ, রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময় সারদাসুন্দরী এই জগৎ-সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সারদাসুন্দরীর মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি আছে।[১৭০] কাহারও মতে, "তাঁহার মৃত্যু একটা শোকাবহ বাস্তব

১৭০. ১৩২৫ সালের পৌষ সংখ্যা "নারায়ণ" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় লিখিত "সুরদাস" নামক প্রসিদ্ধ রচনাটি দ্রষ্টব্য।

ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত"। আবার কাহারও মতে কবি-বিরচিত "প্রেম ও ফুলে"র 'আত্মহত্যা' কবিতাটির সৃষ্টি। এই উভয় প্রকার জনশ্রুতি পূর্ববঙ্গে তখন লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইলেও কবি গোবিন্দ-দাসের মুখে কেহ কোন জনশ্রুতির কথা শোনে নাই। তবে কবির মৃত্যুর পর সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "নারায়ণ"-এ সারদাসুন্দরীর মৃত্যু-কাহিনী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হইলে অনেকে সেই সম্বন্ধে অবহিত হন। বহু বৎসর পরে ১৩১২ সালে "কি কঠিন" নামক একটি কবিতা লেখেন। "বৈজয়ন্তী" কাব্যে তাহা মুদ্রিত হয়। তাহার একস্থানে আছে—

"মুহূর্ত্ত করেছি ভুল অতি সূক্ষ্ম একচুল।
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার।
যদিও বুঝিয়া আজ, শুধু ঘৃণা শুধু লাজ,
দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ সার।"

ইহার মূলেও সেই জনশ্রুতি আছে কিনা, তাহাও বিবেচ্য বিষয়। বলা বাহুল্য, পত্নী-বিয়োগের অল্পদিন পরেই কবি একমাত্র সহোদর জগশ্চন্দ্রকেও হারাইলেন (১৮৮৬ খ্রীঃ, ১৪ই আগস্ট)। 'একে একে নিভিল দেউটি', বাকী রহিল শুধু সপ্তম বর্ষীয় মণিকুন্তলা। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কবি কন্যাসহ শ্বশুরবাড়ীতেই অবস্থান করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাসের ভিটা এবং তাঁহার শ্বশুরবাড়ীর ব্যবধানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল। উক্ত দীর্ঘিকার দিকে কতকগুলি সারি সারি এরণ্ড বৃক্ষ ছিল। সারদাসুন্দরী পিত্রালয়ে যাইলে ওপারে কবিকে দেখিবার উদ্দেশ্যে এরণ্ড বৃক্ষগুলির শীর্ষদেশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন। এইভাবে পারস্পরিক নয়নে নয়নে প্রেমালাপ চলিত। সারদাসুন্দরীকে হারাইয়া কবি তাঁহার "কুঙ্কুমে" এই কথা স্মরণ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন—

"যদি গো আগের মত, দেখিতে বাসনা তত,
সত্যই সরলা প্রিয়ে থাকিত তোমার,
তবে কি 'ভেরণ' গাছে, অত পাতা উঠিয়াছে ?
দেখিতাম পথে আগে পাতা ভাঙ্গা তার"।

এই দীর্ঘিকার কথা কবির আরও অনেক কবিতায় পাওয়া যায়। যথা :—

"শারদ মধ্যাহ্ন মাঝে শ্যামল পুকুর,
এপারে ওপারে কথা নহে বহু দূর।
দক্ষিণের মৃদু বায়ু ধীরে দিল আনি
শ্রবণে প্রতপ্ত সুরা—'জানি তবে জানি"।

এক সময় এই দীঘির জল খারাপ হইয়া স্নানের ও পানের অযোগ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কবি-দম্পতির দাম্পত্য প্রেমলীলার স্মৃতি-চিহ্নরূপে বাঁচিয়া থাকে।

সারদাসুন্দরীর বিদায়ে কবির মর্মব্যথা কাব্য-ব্যথারূপে দেখা দেয়। যাঁহাকে ইহজগতে আর দেখা যাইবে না, তাঁহাকেই তিনি কাব্য-জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রেমের পূর্ণতা ঘটাইলেন। তাঁহার "সারদা-সুন্দরী" শীর্ষক কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্ন। কবি অক্ষয়কুমার বড়াল[১৭১] মহাশয়ও "সারদাসুন্দরী" কবিতাটির প্রশংসা করিয়া

---

১৭১. অক্ষয় কুমার বড়াল :—জন্ম-১৮৬০—মৃত্যু-১৯১৯, ১৯শে জুন। নিবাস—চোরবাগান, কলিকাতা। হেয়ার স্কুলে শিক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, কিন্তু আজীবন লেখাপড়ায় অনুরাগ ছিল। পাঠ্যাবস্থায় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর "শিষ্যত্ব" গ্রহণ করেন এবং অল্পবয়সেই কবিতা-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ১২৮৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতী'তে প্রকাশিত "পুনর্মিলনে" নামক কবিতাটি তাঁহার প্রথম মুদ্রিত রচনা। পরে সেকালের বিখ্যাত প্রায় সকল সাময়িক পত্রেই তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহার অনেকগুলি

বলিয়াছেন—"কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যের একটি উৎকৃষ্ট সম্পদ"। কবিতাটির প্রতিটি ছত্রেই আছে প্রাণের বেদনার কাব্যিক প্রকাশ। কবিতাটির সূচনাও হইয়াছে জীবন-নাট্যের নাট্যরূপের মত—

"আজ
কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর,
তোমার অধিক শোভা, ততোধিক মনোলোভা,
শোয়ায়ে দিয়াছি চাঁদ চিতার উপর"।

তারপর যখন চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন কবি বলিতেছেন—

"বল হরি হরি।
কি ঘোর গম্ভীর রব, ভাঙ্গিয়া দিগন্ত সব,
উঠিয়াছে নৈশাকাশ তোলপাড় করি,
জ্বলিছে প্রচণ্ড চিতা—বল হরি, হরি।
রোগ শোক দুঃখ ভরা, ত্যজিয়া এ বসুন্ধরা,
যায় আজ দিব্যধামে সারদাসুন্দরী,
বল চন্দ্র বল তারা—বল হরি হরি'।
পশুপক্ষী তরুলতা, যে তোমরা আছ যথা,
অচল অশনি সিন্ধু বিঘোরা শবধরী,
প্রকৃতি অনন্ত কণ্ঠে 'বল হরি হরি'।
অপ্সর কিন্নর নর, যক্ষ রক্ষ বিদ্যাধর,
ভূলোক দ্যুলোকবাসী অমর অমরী,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব 'বল হরি হরি'।"

"সারদাসুন্দরী" কবিতা পড়িলে বিহারীলালের "সারদামঙ্গলে"র কথা মনে পড়ে। উভয় কবিতায় আছে স্ত্রী-বিয়োগ, আত্মীয়-স্বজন-

---

সংগৃহীত হইয়া 'ভুল', 'কনকাঞ্জলি', 'প্রদীপ,' 'শঙ্খ', 'এবা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হইয়াছে।

পরিজনের বিরহ ব্যথার কথা। তবে কবি গোবিন্দদাসের "সারদা-সুন্দরী" কবিতায় রক্তমাংসের জীবন-সঙ্গিনীকে পাওয়া যায়। কিন্তু বিহারীলালের "সারদামঙ্গলে" পাওয়া যায় লৌকিক নারীর মধ্যে অলৌকিকভাবে ভাবিত দেবী সারদার কথা, মানবীর মধ্যে মহা-মানবীর কথা, যোগীন্দ্র যাঁহাকে ধ্যানে লাভ করেন। পত্নীপ্রেমিক গোবিন্দদাস সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর কয়েকখানি কাগজে চারি ছত্র কবিতা মুদ্রিত করিয়া পত্নীর প্রিয় পাঠ্যপুস্তকগুলির বহিরাবরণে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহা কবির তাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিত। নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল—

(স্মৃতিচিহ্ন)

জন্ম	মৃত্যু
সন বঙ্গাব্দ	সন ১২৯২ বঙ্গাব্দ।
তারিখ	তারিখ ১২ই অগ্রহায়ণ।
বয়স ২৫ বৎসর	মাস।

—*—

স্বর্গগতা

সারদাসুন্দরী দাসীর

গ্রন্থাবলী

—*—

প্রাণময়ী প্রিয়পত্নী সারদাসুন্দরী,
গিয়াছে ত্রিদিব ধামে ধরা পরিহরি :
এই তার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ সমুদয়,
প্রীতির—স্মৃতির চিহ্ন—হীরা মণিময়।

জয়দেবপুর
ঢাকা
১২৯২ সন

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিদ্রাহীন,
দুইদিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে।"

("কস্তুরী")

কবি যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তখন কবির পারিপার্শ্বিক অবস্থা মোটেই অনুকূল ছিল না। সন্দেহ, সংশয়, প্রতারণা, বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়াও কবি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহার জীবনের মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল—

"ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব।"

এই 'অচল' ও অটল থাকার মূলে আছে কবির ভগবৎবিশ্বাস। তিনি দুঃখ-কষ্টকে ভগবানের পরীক্ষা বলিয়া মনে করিতেন। নির্ভীকতা ও তেজস্বিতা ছিল তাঁহার চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি বলিয়াছেন —"সহস্র বিপদ আসিলেও আমি ভয় করি না, নিজের কর্তব্য করিয়া যাই। আমি বিপদকে কোনদিনই ভয় করি নাই।" ইহাই কবির জীবন-বাণী। তাই দেখা যায়, ১৮৯৩ খ্রীঃ ১৩ই জানুয়ারী কবি যখন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন, তখন ঐ বৎসরেই ৩১শে অক্টোবর প্রথমা স্ত্রী সারদাসুন্দরীর শেষ স্মৃতিকণা মণিকুন্তলা হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিলেও কবি ভক্তিবিশ্বাসের দৃঢ়তা লইয়া অচল ও অটল রহেন। একের পর এক আঘাত তাঁহাকে বিচলিত ও ব্যথিত করিয়াছে, কিন্তু বিমূঢ় করিতে পারে নাই। এমন কি, জগৎসংসার সম্বন্ধে নিরাশাবাদী ও ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসী করিয়া তুলিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন আশাবাদী এবং অস্তিক্য-বাদী। জগৎ-সংসার হইতে পলায়ন নহে, তাহাকে স্বীকার করিয়া

তাহারই মধ্যে থাকিয়া তাহারই মাধুর্য আহরণ করাই ছিল কবির জীবনে ধর্ম ও সাধনা। তাই দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমার সব ও শেষ স্মৃতিচিহ্নের বিলুপ্তি বাংলা সাহিত্যে আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কিনা জানি না। অশ্রুসজল চোখে মণিকুন্তলার উদ্দেশ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

"তপস্বীর তপোরথে, জ্ঞানময় মহাপথে,
যায় ব্রহ্মাময়ী মেয়ে সারদা তোমার।
লও সে স্নেহের বুকে, থাক্ মেয়ে চিরসুখে,
এ জীবনে তার তরে ভাবিব না আর,
ছিন্নমুণ্ড ছিন্নবাহু, আমি চিরদগ্ধ রাহু,
একাকী ভ্রমিতে থাকি জগৎ-সংসার।
নেও কোলে নেও মেয়ে সারদা তোমার।"

("কস্তুরী")

মণিকুন্তলা যথোচিত বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে কবিজনোচিত শক্তিরও বিকাশ ঘটিয়াছিল। মণিকুন্তলা কবিতা রচনা করিতেও পারিত। মণির ৬।৭ বৎসর বয়সের সময় মণির মা'র মৃত্যু হয়। মণি তাহার মাতার উদ্দেশ্যে "জননী আমার" শীর্ষক যে কবিতাটি লিখিয়াছিল, তাহা মণির মৃত্যুর পর লোকে জানিতে পারে। আমরা এখানে মণির স্মৃতিচিহ্নরূপে সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—[১৭২]

---

১৭২. কবিতাটি কোন্ সময়ের লেখা তাহা জানা যায় না, তবে ঘটনা-পরম্পরায় বলা যায় যে, ইহা ১২৯৯ সালে লিখিত হইয়াছিল। মণির মা সারদাসুন্দরী ঐ বৎসরেই মারা যান। আর মণিকুন্তলা মারা যায় ১৩০০ সালে। কবিতাটি "কস্তুরী" কাব্যের অন্তর্গত।

কোথা রহিলে গো জননী আমার
আমার দুঃখেতে দুঃখী কে হবে গো আর
স্নেহমাখা বোলে, কে করিবে কোলে।
এমন এ পৃথিবীতে কে আছে আমার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

২

কোথা রহিলে গো জননী আমার
বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে মাগো কে আছে আমার?
আমি যদি মরি প্রাণে
কে কাঁদিবে আমার জন্যে
স্নেহময় জননী ভিন্ন দেখি অন্ধকার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার॥

৩

কোথা রহিলে গো জননী আমার'
বড়ই পাষাণ মাগো হৃদয় তোমার।
আমাকে একাকি ফেলে।
মা তুমি কোথায় গেলে
একটু হল না দয়া হৃদয়ে তোমার।
কোথায় রহিলে গো জননী আমার।

৪

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
তুমি ভিন্ন এ সংসারে কে আছে আমার;
যে দিকে ফিরাই আঁখি
কেবলি নিষ্ঠুর দেখি।
আমার দুঃখেতে দয়া হয় না গো কার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৫

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
আমার দুর্দশা মাগো দেখো একবার।
দেখ একবার চেয়ে,
দেখ গো পাষাণী মেয়ে,
জ্বলিয়া পুড়িয়া হৃদয় হতেছে অঙ্গার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৬

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
এ দুঃখিনী বলে মনে হয় নাকি আর?
কেমনে রহিলে গিয়ে
পাষাণের মত হয়ে
তোমার স্নেহের মণি ভাসিছে অকূল পাথার,
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৭

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
গেলে কি জন্মের মত আসিবে না আর।
গেলে ফেলে দুঃখিনীরে
আর না আসিবে ফিরে
আর ত সহে না মাগো এ দুঃখ-ভার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

৮

কোথা রহিলে গো জননী আমার।
মাগো যদি না আসিবে আর।
এস তবে এস হেথা
কহি গো দুঃখের কথা

জনমের মত মাগো ডাকি একবার।
কোথা রহিলে গো জননী আমার।

সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব যে কত সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়, তাহা এই কবিতাটি পড়িলে বুঝা যায়। মণিকুন্তলা কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তাই কবি তাঁহার কন্যাকে কবিতায় অমর করিয়া রাখিলেন। মণিকুন্তলার মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবি লিখিয়াছিলেন—

"তৃতীয় প্রহর গত হেমন্তের নিশি,
অচেতন অন্ধকারে স্তব্ধ কলিকাতা,
জীবন যেতেছে যেন মরণেতে মিশি,
উলটিয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র এক পাতা।
শায়িতা দ্বিতল গৃহে 'আনন্দ আশ্রমে'[১৭৩]
বিদেশে বিভূয়ে নাই আত্মীয়-স্বজন,
একাকী বালিকা মেয়ে মহা পরাক্রমে
ভীষণ মৃত্যুর সঙ্গে করিতেছে রণ।"

মণিকুন্তলার হৃদ্‌রোগ ১২৯৯ সালে খুব বৃদ্ধি পায়। বাতের জন্য তাহার হৃদ্‌পিণ্ড আক্রান্ত হইয়াছিল। কবি গোবিন্দদাস তখন নির্বাসিত জীবনযাপনে নানাভাবে বিপন্ন। অবশেষে মণিকুন্তলার

---

১৭৩. ১৩০০ সালে বৈশাখ মাসে কবি গোবিন্দদাস যখন বন্ধুবর দেবেন্দ্র-কিশোর আচার্যচৌধুরীর "দেবনিবাসে" অতিথি, তখন তাঁহার জামাতা নিশিকান্ত কবিকে একখানি পত্র লিখিয়া "নব্যভারত" সম্পাদকের আশ্রয়ে থাকিয়া কলিকাতায় অধ্যয়ন করিবার জন্য সবকিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে নিশিকান্ত "নব্যভারত" সম্পাদকের আলয়—"আনন্দ-আশ্রমে" থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে থাকেন। এই "আনন্দ আশ্রমে"র দ্বিতল গৃহে মণিকুন্তলা "ভীষণ মৃত্যুর সঙ্গে করিতেছে রণ"। কবি তখন সেরপুরে।

চিকিৎসার জন্য তাহাকে "আনন্দ আশ্রমে" আনয়ন করেন। কবি-জামাতা নিশিকান্তও তখন "আনন্দ আশ্রমে" ছিলেন। কিন্তু সকলের সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ১৩০০ সনের ১৪ই কার্তিক রাত্রি প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় পত্নী সারদাসুন্দরীর শেষ স্মৃতি কন্যা মণিকুন্তলা কবি গোবিন্দদাসকে নিঃস্ব করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিঃস্ব হইলেও কবি দেউলিয়া হন নাই, কন্যার উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাটি তাহারই প্রমাণ। কবিতাটি দুঃখের হইলেও ইহা দুঃখজয়ী কবিতা। ইহাতে চাঞ্চল্য নাই, আছে আত্মসমাহিতি; উচ্ছ্বাস নাই, আছে গভীরতা; উদ্দামতার পরিবর্তে আছে প্রশান্তি।

কবির দ্বিতীয়া পত্নীর নাম—প্রেমদাসুন্দরী। তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রাম নিবাসী মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা। কবি গোবিন্দদাসের বিবাহের সময় মহেন্দ্র ঘোষের বৃদ্ধা মাতা বর্তমান ছিলেন।[১৭৪] এই বৃদ্ধা মাতাও গোবিন্দদাসকে ভাল চোখে দেখেন নাই। তিনি গোবিন্দদাসের পরমাত্মীয়া হইয়াও উপকারের পরিবর্তে অপকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাসও "বিক্রমপুরে বসন্ত" শীর্ষক কবিতায় ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন—

---

১৭৪. মহেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বৃদ্ধা মাতা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালিনী রমণী ছিলেন। পুরুষমহলে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদূর ছিল যে, গ্রামের সমাজপতিগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমাধানের জন্যও পুরুষদের বৈঠকেও তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তির ন্যূনতাবশতঃ তিনি উপনেত্র ব্যবহার করিতেন। পল্লী বালকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিত। তিনি এতখানি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রীলোক ছিলেন যে, প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে সাহস পাইত না। সকলের নিকট তিনি "ব্যারিস্টার" হিসাবে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রখরা, বুদ্ধিমতী এবং অত্যন্ত বাক্‌পটু স্ত্রীলোক ছিলেন। কবি গোবিন্দদাসের ভাষায় বলা যায়—"বিনা পয়সার বিজ্ঞাপন সে আমার ঠেরেন দিদি"।

"পরদাহীনা মরদা মেয়ে পদ্মা নদীর প্রায়,
ঠেরেন দিদি বেড়ান আশে বাবুর বাড়ী যায়।
বাড়ী বাড়ী বৈঠক তাহার, পাড়ায় পাড়ায় হাট,
এমনি তিনি 'রায় বাঘিনী' দেখলে সবাই কাঠ।
কথার চোটে আগুন ওঠে ডিনামাইটের মত,
মানুষ ত সে দূরের কথা, পাহাড় উড়ায় কত।
কিবা পুরুষ কিবা নারী সবাই করে ভয়,
ফেলে দাড়ি নারদ নারী এমনি মনে লয়।

*   *   *   *

বউয়ের কথা ঝিকে বলে, ভাইয়ের কথা বোনে,
বাপের কথা মাকে বলে পুতে যাতে শোনে।
ঘরের কথা পরে বলে, বরের কথা হাটে,
হাটের কথা ঘাটে বলে, ঘাটের কথা মাঠে।" ইত্যাদি

—একে দিদি শাশুড়ী,—রহস্যের পাত্রী, তাহার উপর নাত্‌জামাই-এর বিপক্ষাচরণ। তাই কবির এই ব্যঙ্গ-কবিতাটি বিশেষ উপভোগ্য।

কবি গোবিন্দদাসের শ্বশুরালয় ব্রাহ্মণগ্রামে হইলেও কবি এই খানেই বাসস্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন। কবি গোবিন্দদাস যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পরলোকে। তাঁহার একমাত্র শ্যালক অল্পদিন পরেই দেহত্যাগ করেন। সুতরাং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রেমদা পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়ায় গোবিন্দদাসের ব্রাহ্মণগ্রামে বাস করিবার সুযোগ প্রশস্ত হইল। বলা বাহুল্য, নির্বাসিত হওয়ার পর কবি অবশিষ্ট জীবন এই গ্রামেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া কীর্তিনাশা পদ্মা খল্‌-খল্‌ ভাবে বহিয়া চলিয়াছে। ১৩০২ সালে কবির রচিত "কস্তুরী" কাব্যের উৎসর্গপত্রে কবি এই পদ্মার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্মশান ধুইয়া তীরে, চিলাই বহিছে ধীরে,
কলতানে মৃদুগানে, বনে বনে ঘুরি,
অকস্মাৎ পাশে তার মন্দাকিনী ধার—
ভীষণ গর্জ্জনে পদ্মা ব্যোম ভাঙ্গি চুরি।"

ব্রাহ্মণগ্রামে কবির বাড়ী সাধারণ গৃহস্থের মত। দুই খানি গৃহ,—একখানি শয়নের ও অপরখানি রন্ধনের। বাড়ীর চতুর্দিকে আম্রবন, এক পার্শ্বে পুষ্করিণী। বহির্ভাগে যে দেবদারু বৃক্ষ ছিল, এখন তাহা আর নাই। বাড়খানিও বিশেষত্বহীন।

সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর যে কবি গোবিন্দদাস চোখের জলে কালির অক্ষরে লিখিয়াছিলেন—

"আজ

কি দেখিতে আসিয়াছ ওহে শশধর ?
তোমার অধিক শোভা ততোধিক মনোলোভা
শোয়ায়ে দিয়াছি চাঁদ চিতার উপর।"

দীর্ঘ সাত বৎসর পরে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া সেই কবি গোবিন্দদাস আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"হায়। হায়। লোকে কেন দুই বিয়া করে?"—ইহাতেই বোঝা যায়, কবি প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে কতখানি ভালবাসিতেন। ১২৯৯ সালে ১লা মাঘ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার সময় কবি এই আক্ষেপ করিয়া বলেন—

"পাষাণ হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দু'জনার বানে।"

শুধু কি তাই—

"কিবা ঘুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁফরে।"

—সরল প্রাণের সরল কথা। ইংরাজীতে যাহাকে বলে—"First wife is the best wife"—কবি গোবিন্দদাস তাহা যেন অকপটে

স্বীকার করিয়াছেন। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম', "হিমালয়" প্রভৃতির গ্রন্থকারগণ পরবর্তী কালে বিগত জীবনের কোন কথাই এমনভাবে বলেন নাই।

কবি গোবিন্দদাস ১২৯৯ সালের ১লা মাঘ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তখন কবির পারিপার্শ্বিক অবস্থা বড়ই উদ্বেগপূর্ণ। "মগের মুলুকে"র কতকাংশ তখন 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করিয়া ভাওয়ালে, কবিপ্রসঙ্গ বিশেষভাবে আন্দোলিত হইতেছে। তাহার পর সাংসারিক জীবনে একের পর পর এক দুর্যোগ পরিস্থিতিকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। মণি-কুন্তলার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীর একমাত্র সহোদর অতুলচন্দ্র পাঠ্যাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। এই প্রসঙ্গে কবির রচিত কবিতা বিশেষ স্মরণীয় :—

"শরতের শুক্লাষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির।
এসেছে পাড়ার মেয়ে তারা সমুদয়,
দেখিতে বিধুর মুখ সুধার নিলয়।"

কবিতাটিতে যে সুন্দর নৈসগিক বর্ণনা আছে, তাহা যেন "মরণ রে তুঁহু মন শ্যাম সমান"-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি আবার অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।

নিরাশায় নিষ্পেষিত মহা মরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থি চূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।
দিক্‌বদ্ধ শ্যাম মাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।
অনন্ত অশান্তির সুধা ভূগিছে সবাই,
একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই।
চিরদাহ জাগরণ তার বুকে দিয়া,
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া।"

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এই শ্মশানের ভূমিকা সব চেয়ে বেশী গোবিন্দ-দাসের কাব্যে। 'শ্মশান', 'চিতা', 'মৃত্যু', 'চুল্লী,' 'পাষাণ', 'সৈকত', 'নদ-নদী', 'মরুভূমি', 'ঘুমায়', 'শোক', 'কোল', 'আকাশ' প্রভৃতি শব্দ গোবিন্দদাস তাঁহার কাব্যে একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে গোবিন্দদাস যেন শৈব—শ্মশানে মশানে ঘুরিয়া বেড়ান, অথচ সংসারী। শিবের মতই তিনি যেন মহাভোগী, অথচ মহাযোগী। সকলের সুখ-দুঃখের সঙ্গেই তিনি জড়িত আছেন, অথচ সংসার-জীবনে তিনি একাকী, একক পথের যাত্রী। জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া তিনি শুধু হলাহল বিষ পান করিয়াছেন, অমৃতের সন্ধান পান নাই। তাই কবির অন্তরে শুধু 'চিরদাহ জাগরণ'। কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকাব্য "প্রেম ও ফুল"। ১২৯৪ সালে ইহা মুদ্রিত হয়। কাব্যখানি প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই বৎসরেই "নবজীবনে" ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছিল।

কবির দ্বিতীয় গীতিকাব্য "কুঙ্কুম"। রচনাকাল ১২৯৮ সাল। ইহাও প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে উপহৃত।

কবির তৃতীয় গীতিকাব্য "কস্তুরী" ১৩০২ সালে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি দ্বিতীয়া পত্নী বালিকা বধূ প্রেমদাসুন্দরীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"কুঙ্কুম দিয়েছি আগে সরলারে, সেই রাগে
অভিমানে মুখ ভার ক'রে থাকে ছুঁড়ী,
কখনো বা মোটা মোটা, আঁখি হ'তে পড়ে ফোটা,
কেলি কদমের মত দুই-দশ-কুড়ি।
তাই গো করিনু দান, ভাঙ্গিতে সে অভিমান,
প্রেমদার পাদপদ্মে প্রেমের কস্তুরী।"

"কস্তুরী" কাব্যেও তিনি জন্মভূমি ভাওয়ালের জন্য বিলাস করিয়াছেন, —"কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই?" ইহা বলিয়া দরিদ্র কবি মর্মান্তিক আক্ষেপ করিয়াছেন। ইহাতে ভাওয়ালের অধঃপতনের কতক বর্ণনাও আছে। "কস্তুরী"র এক স্থানে তিনি তাঁহার নির্বাসন-দণ্ডের কথা ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাওয়ালের তদানীন্তন ও অতীত কাহিনীরও কতক আভাস পাওয়া যায় এই "কস্তুরী"-কাব্যে।

১৩০৩ সালে কবি গোবিন্দদাস যখন "নব্যভারতে"র কার্যাধ্যক্ষরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। একখানি "চন্দন" নামক গীতিকাব্য, অপরখানি "ফুলরেণু" নামক সনেটের সমষ্টি। কবি গোবিন্দদাস তাঁহার "চন্দন" এবং "ফুলরেণু" যথাক্রমে দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী এবং দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী বন্ধুদ্বয়কে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

"চন্দন" কাব্যেও কবি গোবিন্দদাসের সেই বিয়োগব্যথা ও সাংসারিক জীবনের দুঃখ-কষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "নির্বাসিতের আবেদন", "ভাওয়াল", "বাঙ্গালী", "কালীয় দমন" প্রভৃতি কবিতা-

গুলি অতুলনীয়। এই সকল কবিতার ছত্রে ছত্রে তাঁহার জ্বালাময় জীবনের মর্মবেদনা বাণীরূপ লাভ করিয়াছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, কবির প্রথম পুত্র অর্থাৎ দ্বিতীয়া পত্নীর প্রথম সন্তান 'অরবিন্দ'। এই পুত্র জীবিত নাই। বর্তমানে অরবিন্দের এক পুত্র এবং কবি গোবিন্দদাসের দ্বিতীয় পক্ষের দুই কন্যা শক্তি ও ভক্তি জীবিত আছেন। এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদের মধ্যে একমাত্র হেমরঞ্জন দাস জীবিত আছেন। বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলায় গড়িয়ার নিকটস্থ শ্রীরামপুরে "প্রেমদাকুটিরে" বাস করিতেছেন। তিনি অতিথিবৎসল এবং পরোপকারী। এই গ্রন্থ-রচনায় তিনি একদিকে যেমন আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, অপরদিকে তেমনি তিনি সাধ্যমত নানা উপকরণ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ধর্মপত্নী বুদ্ধিমতী, স্নেহশীলা এবং বৈষয়িক জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্না। আমি এই পরিবারের নিকট ঋণী। হেমরঞ্জন দাস কবি গোবিন্দ-দাসের তৃতীয় পুত্র। প্রথম পুত্র অরবিন্দ (ভোলা) এবং দ্বিতীয় পুত্র শরদিন্দু (বরুণ)।

কবি গোবিন্দাসের জীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, তেমনি কবির কবিতাও বিচিত্রময়ী ও বর্ণনাময়ী। গোবিন্দদাস কখনও কল্পলোকের জাদুকর ছিলেন না, তিনি ছিলেন মাটির কাছাকাছি কবি। জীবনের সাদা ও কালো রং-এর সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁহার প্রায় সব কবিতাই তাই বাস্তব ঘটনার ফলশ্রুতি। কবির জীবনেতিহাস দারিদ্র্যের ইতিহাস, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ইতিহাস, নির্বাসনের ইতিহাস, অনাদর ও উপেক্ষার ইতিহাস। তাই কবির সাংসারিক জীবনের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে তাঁহার মানসিকতার ইতিহাস। কারণ, এই ইতিহাসই প্রমাণ করিয়া দিবে যে, তিনি যথার্থ স্বভাব-কবি ও স্বদেশপ্রেমিক কবি ছিলেন।

দশম অধ্যায়

॥ গোবিন্দদাসের কবিতা ও কাব্যরূপ ॥

বাংলা সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁহার কবিতা ও কাব্যরূপ প্রমাণ করিয়া দিবে যে, তিনি একজন অসাধারণ কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সেই প্রতিভা যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি পাইলে তিনি বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদৃত কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করিতেন না। তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই চোখের জলে অভিষিক্ত, দুঃখের পঞ্চপ্রদীপে আলোকিত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে উদ্ভাসিত এবং বলিষ্ঠ জীবনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কবি নিজে Pessimist হইলেও জগৎ-জীবন ও জাতির প্রতি Optimist ; তাঁহার জীবনের উপর দিয়া যে ভীষণ অশান্তির ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহা এই দেশের আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে ঘটে নাই। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ, রাজশক্তির দাপট, অনিচ্ছায় পরবশতা, অকালে পত্নী বিয়োগ এবং জন্মভূমি হইতে নির্বাসন কবিকে জীবন ও জগতের মূল্যবোধ সম্বন্ধে একেবারে দেউলিয়া করিয়া দিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মাইকেল ও রজনীকান্তের অশান্তির সঙ্গে গোবিন্দদাসের অশান্তির তুলনা হয় না। জাতীয় পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া ন্যায়পরায়ণ নির্ভীক কবি যেন টলস্টয়[১৭৫]-এর

---

১৭৫. টলস্টয়, কাউন্টলিও (Tolstoi, Countleo)—বর্তমান কাল—১৮১৮-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ। রাশিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। কিছুদিন ইনি সৈন্যবিভাগে কাজ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের বীভৎস দৃশ্য ও লোকের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া ইনি অতিশয় বিচলিত হন এবং তৎবিষয়ে লেখনী ধারণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে ইহার সাহিত্য-প্রতিভার কথা চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়। ইনি রাশিয়ার প্রগতি ও স্বাধীনতার জন্য তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন। ইহার

(Tolstoi) মতই আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনায় উল্লিখিত পারিপার্শ্বিক-অবস্থার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরিণত বয়সের রচনায় স্থানে স্থানে এই ভাব ফুটিয়া উঠিলেও সর্বজনীনতার অভাব নাই। সর্বোপরি তিনি ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীর বিশেষত্ব তাঁহার কবিতায় দেদীপ্যমান। এই জন্যই স্বভাবকবি গোবিন্দদাস খাঁটি বাঙ্গালী কবি ছিলেন।

কবি গোবিন্দদাস একজন উচ্চশ্রেণীর কবি হইলেও কেবল সুললিত ছন্দোবদ্ধ বাক্যবিন্যাসের জন্যই তিনি বড় নহেন। অবশ্য তাঁহার কবিতায় কোন অস্পষ্টতা, কুহেলিকা বা জটিলতা নাই। বড় বড় নীতিকথা, তত্ত্বকথা বা আধ্যাত্মিক কথা তাঁহার কবিতায় নাই। অথচ তিনি উচ্চাঙ্গের কবি, প্রথম শ্রেণীর কবি। তাঁহার কাব্যে চারিটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়ঃ—প্রথমটি, সত্যভাষণ; দ্বিতীয়টি, ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ নিজস্ব মৌলিক ধ্যান-ধারণা, চিন্তা ও কল্পনা; তৃতীয়টি, রচনা-রীতি বা Style; এবং চতুর্থটি, খাঁটি বাঙ্গালীয়ানা। তাঁহার ভাব, ভাষা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার—প্রভৃতি সব কিছু লইয়াই তাঁহার কবিত্ব। মানুষটি যেমনি সহজ সরল, কাব্যও তেমনি সরল পথেই বিচরণ করিয়াছে। তবে তাঁহার মত অপ্রিয় সত্য কথা আর কেহই বলেন নাই। সত্যভাষণে তাঁহার ক্ষমতা ও তীক্ষ্ণতা ছিল সর্বজনবিদিত। হেমচন্দ্রের তাব্র ভাষা, গোবিন্দদাসের নিকট মার্জিত ভাষা। গোবিন্দ-দাসের তেজস্বিতা ও স্পষ্টবাদিতাই তাঁহাকে উপেক্ষিত ও অবহেলিত করিয়াছে বলা যাইতে পারে। শুধুমাত্র দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই যে দেশবাসী তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা ঠিক নয়। তাঁহার কবিতা যেন সারস্বত সাধনা এবং কাব্যরূপ জীবন-রূপেরই নব রূপায়ন।

রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'War and Peace', 'Anna Karenina', 'The Cossacks', 'Resurrection' প্রভৃতি অতি জনপ্রিয়।

কিশোর বয়সেই কবি গোবিন্দদাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে কবিতা লিখিয়া তিনি বৃত্তি পান। পনের বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রসূন' (ইং ১৮৭০ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁহার বিবাহ হয়। বঙ্গবাণীর শ্রীচরণে ইহাই কবির প্রথম পুষ্পাঞ্জলি। কাব্যখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দদাস 'কবি' নামে জনসমাজে পরিচিতি লাভ করেন। কবি সারা জীবনে দশখানি কাব্য লেখেন।

তাহার মধ্যে 'প্রসূন' কাব্যখানি তাঁহার যাত্রালগ্নের বিদ্যুৎব্যাপী আকাশবাণী। বর্তমানে কাব্যখানি বিলুপ্ত। অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি হইতেছে—'প্রেম ও ফুল' (১৮৮৮), 'কুস্কুম' (১৮৯২), 'মগের মুলুক' (১৮৯৩), 'কস্তুরী' (১৮৯৫), 'চন্দন' (১৮৯৬), 'ফুলরেণু' (১৮৯৬), 'বৈজয়ন্তী' (১৯০৫), 'শোক ও সান্ত্বনা' (১৯০৯), 'শোকোচ্ছ্বাস' (১৯১০)। সারা জীবন ধরিয়া কবি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছেন। তাই তাঁহার কবিতার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা আর সম্ভব নয়। তাঁহার প্রায় হাজারখানেক কবিতার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। তখনকার দিনের 'বীণা', 'নব্যভারত', 'নবজীবন', 'সৌরভ', 'প্রতিভা', 'বঙ্গদর্শন', 'মানসী', 'নারায়ণ', 'সাহিত্য', 'আলোচনা', 'প্রকৃতি', 'চারুবার্তা' প্রভৃতি বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কবি-সাহিত্যিকদের রচনার পাশে গোবিন্দদাসের কবিতা প্রকাশিত হইত। ইহাতেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গোবিন্দ দাস এক অনন্যসাধারণ কবি-প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রতিভা তাঁহার সহজাত।

১২৯৪ সালে ফাল্গুন মাসে কবি গোবিন্দদাসের প্রথম গীতিকবিতা "প্রেম ও ফুল" মুদ্রিত (১২ই মার্চ ১৮৮৮) হয়। শ্মশান-শয্যায় শায়িতা প্রাণসমা প্রেয়সী ও কন্যার বিলাপসঙ্গীতে "প্রেম ও ফুলে"র সৃষ্টি।

কাব্যখ্যানি তাই প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত। ইহার অন্তর্ভুক্ত "পরশুরামের শোণিত-তর্পণ" কবিতাটি ১২৮৭ সালে ৮ম সংখ্যা "বান্ধবে" মুদ্রিত হয়। রচনাটি যে গোবিন্দদাসের, সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাহা পরে জানিতে পারেন; ইতিপূর্বে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। "প্রেম ও ফুলে"-র ২য় সংস্করণে "শ্মশান-সম্ভাষণ" নামে একটি কবিতা (দ্রঃ 'নব্য ভারত,' পৌষ, ১২৯৫) 'শ্মশান-সঙ্গীত' কবিতাটির পূর্বে সংযোজিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গসাহিত্যের In Memoriam—এইখানে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার, রোমিও ও জুলিয়েট এবং এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রেমের হিল্লোল নাই, আছে ইহজগতের সঙ্গে পরজগতের সম্বন্ধ। বাংলাদেশের এক উপেক্ষিত কবির শোকোচ্ছ্বাসে "প্রেম ও ফুল" পরিপূর্ণ। কাব্যখানি প্রথমা পত্নী সারদার উদ্দেশ্যে প্রেম উপহার—

"সারদা!

হৃদয়রাণি, প্রীতির প্রতিমাখানি,
এস গো পুজিব আজি প্রেম ও ফুলে।
তব যোগ্য উপহার, জগতে নাহি যে আর,
পৃথিবীর দাবি মাখা মাটি ও ধুলে।
এই ফুল—এই প্রীতি, দিয়াছি—দিতেছি নীতি,
যদিও—যদিও দেবি, চরণমূলে,
তবু না ফুরায় আর, নতুন সৌন্দর্য আর,
অনন্ত অসীম ভাবে, উঠে উথুলে।

কে বলে সারদা তুমি, ত্যজিয়া মরতভূমি,
জনমের মত গেছ আমারে ভুলে।
আমি দেখি বসুন্ধরা, কেবলি তোমাতে ভরা,
আছি তব বিশ্বরূপে ডুবে অকূলে।

অতুল আনন্দ তাই, শোক নাই, দুঃখ নাই,
ভক্তি ভরে যাহা পাই দিতেছি তুলে,
মানুষ পাবে কি তার, তব যোগ্য উপহার?
আদরে অঞ্জলি দেই প্রেম ও ফুলে।"[১৭৬]

সারদার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অঞ্জলির নাম—"প্রেম ও ফুল"। কাব্যখানি প্রকাশিত হইলে বাংলা-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস একজন উচ্চশ্রেণীর কবি বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করেন। তৎকালীন "সহচর" লিখিয়াছিলেন—"প্রেমের রস ও ফুলের মধু পান করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি, গোবিন্দদাসকে সরস্বতীর দাস বলিয়াও স্বীকার করিতেছি। সকল কবিতাই সুন্দর হইতেছে। নবীন গোবিন্দদাস প্রাচীন গোবিন্দদাসের পদবী অনুসরণ করিয়াছেন, ভাবের উচ্ছ্বাসে, প্রেমের তরঙ্গে, ভাসিয়াই যাইতেছেন।"

ময়মনসিংহের "চারুবার্তা" 'প্রেম ও ফুলে'র সমালোচনা করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়ঃ—"ময়মনসিংহে 'প্রেম ও ফুলে'র কবি অপরিচিত নহেন। বর্ষে বর্ষে তাঁহার বীণার ঝঙ্কার, বসন্ত-পঞ্চমীর বাসন্তী হিল্লোলের সঙ্গে ময়মনসিংহবাসীর প্রাণে এক নব ভাবের সঞ্চার করিয়া থাকে। * * * গোবিন্দবাবু কেবল ময়মনসিংহে সুপরিচিত তাহা নহে, তাঁহার খণ্ড কবিতা পশ্চিমবঙ্গের কাব্যরস প্রিয়জনের আদরের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। * * * কবি দরিদ্র, কবি গৃহলক্ষ্মীশূন্য, ভ্রাতৃবিহীন, কবি দারিদ্র্যে পরান্নপুষ্ট। * * * পরান্নপুষ্ট বলিয়াই কণ্ঠ এত মধুর; কালের ঘোরকাল আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন বলিয়াই তাঁহার ধ্বনি পঞ্চমে বাঁধা—সে পঞ্চমে দুঃখ-সঙ্গীত চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। * * * দুঃখেও আহা কি মাধুরি!

---

১৭৬. ১২৯৪ সালে ১লা ফাল্গুন কলিকাতায় থাকাকালীন কবি "প্রেম ও ফুলের" এই 'উপহার' কাব্যখানি লেখেন।

'প্রেম ও ফুলে'র সর্বত্র মাধুরী। আমরা ইহা পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। 'প্রেম ও ফুল' কাব্য-কাননে আদৃত হইবার সর্বথা যোগ্য।"

কবি গোবিন্দদাসের দ্বিতীয় গীতিকাব্য—"কুঙ্কুম"। ইহা ১২৯৮ সালে পৌষ মাসে (ইং ১৮৯২ খ্রীঃ ১০ই জুন) প্রকাশিত হয়। এই কাব্যখানিও সারদাসুন্দরীকে উৎসর্গীকৃত। কাব্যখানি মুদ্রিত করিতে কবি সেরপুর হইতে কলিকাতায় গিয়া দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের ভবন "আনন্দ আশ্রমে" অবস্থান করেন এবং সেইখান হইতে "নব্যভারত" যন্ত্র হইতে "কুম্‌কুম্" মুদ্রিত করেন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণকে কবি একখণ্ড "কুম্‌কুম্" উপহার দেন। এই "কুম্‌কুম্" কাব্যখানি পাঠ করিয়া রাজা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। শুধু রাজা নহেন, কাব্যখানি একবাক্যে গুণীজনের নিকট উচ্চ প্রশংসায় প্রশংসিত হইয়াছিল। কাব্যখানির মধ্যে 'রমণীর মন', 'মালাগাঁথা', 'চন্দ্র', 'কি হ'লো আমার?' 'কলঙ্কী শশাঙ্ক', 'চেন কি', 'সোনার মেয়ে' প্রভৃতি গীতিকবিতাগুলি অপূর্ব। 'তোমার আমার' কবিতাটি যেন অশ্রুজলে লেখা—

"দেবি, তোমার আমার।
আশা ভালবাসা যত, সকলি জন্মের মত,
অপূর্ণ রহিল, পূর্ণ হইল না আর,
শুধু হাহাকার করি, জ্বলিয়া পুড়িয়া মরি,
আর ত হবে না আহা দেখা দু'জনার,
প্রিয়ে, তোমার আমার।"

আবার, "পত্র লিখিও" কবিতায় কবি অনন্ত কালের অনন্ত প্রেমের কথা শুধু 'দুইটি কথায়' বলিতে চাহিয়াছেন—

"প্রিয়ে দেবি। কি লিখিব ? দুইটি কথায়,
প্রাণের এ দুঃখরাশি লিখা নাকি যায় ?
তুমি ত অসূর্য্যম্পশ্যা, গ্রহকোণে অমাবস্যা।
দেখিলে দেখেছ রবি আপনার পায়।
দর্পণে চাহিয়া যদি, দেখে থাক সুধানিধি,
আপনার সুধাময় আনন আভায়।
চাহিয়া গগন বক্ষে, দেখ নাই লক্ষে লক্ষে,
জ্বলে কত উল্কাপিণ্ড, হায় হায় হায়,
কি লিখিব প্রিয়তমে, দুইটি কথায় ?"

—ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রেমের এমন মর্মস্পর্শী গীতি-কাব্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গীতিকাব্যের সমকক্ষ। বৈষ্ণব কবিদের মত ইহা একখানি মরমী গীতিকাব্য।

কবির পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থের নাম "মগের মলুক"। ইহা এক-খানি ব্যঙ্গকাব্য। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ইহা প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি রচনার মূলে যে ইতিহাস আছে, তাহা হইতেছে বঞ্চনা-লাঞ্ছনা-অবিচারের ইতিহাস এবং কবির প্রিয় জন্মভূমি হইতে নির্বাসনের ইতিহাস। কাব্যখানি লিখিবার পর কবির অন্তর্জ্বালা কিছুটা প্রশমিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ইহা "নিষিদ্ধ কাব্য" রূপেও পরিচিতি লাভ করে।

পূর্বেই 'নবম অধ্যায়ে' এই কাব্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এই কাব্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ তুলিয়া দিতেছি। ইহাতেই 'মগের মুলুক' কাব্যের মূল বিষয়বস্তু বোঝা যাইবে। যথা—

"নষ্ট দুষ্ট ধূর্ত ক্রূর রাজার ম্যানেজার,
সোনার লঙ্কা স্বর্গপুরী কল্লে ছারখার।

নাইক তাহার পাপ পুণ্য দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান,
পুরাণপাপী ব্রহ্মদৈত্যি বেজাত কেরেস্তান।
মদ মুর্গী নিত্য চলে পঞ্চ ম-কার সব,
দেখলে পরে পাঠা ছাড়া হয় না অনুভব।
নিরেট বোকা গর্দভেন্দ্র বুঝতে নাহি পারে,
আচ্ছা করে মদ খাইয়ে বশ করিলে তারে।
ইয়ার ছিল বেছে বেছে আপনা মানুষ জন,
এনে দিল মদের পিপা লাগুক যত মণ!
বেশ্যা দিল ঘুষকি দিল আসর গেল যুটে,
আপনি এখন স্বর্গপুরী খাচ্ছে লুটে পুটে।"

—এখানে 'রাজার ম্যানেজার' কালীপ্রসন্ন ঘোষের শাসনাধীনে ভাওয়ালের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা যায়। এখানে দেখানো হইয়াছে সামন্ত-উৎপীড়নের মূলে আছে নৃপতি ভূস্বামী শ্রেণী। অনাচার-অত্যাচার ও ব্যভিচারের কেন্দ্র হইল রাজার প্রাসাদ, মন্ত্রী ও ইয়ার-পরিষদ। 'মগের মুলুকে' এই সমাজ-জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়াছে। ভাওয়ালের রাজপ্রাসাদের বর্ণনা দিতে গিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

"বর্বরতার বিরাট ভবন ব্যভিচারের ঠাঁই,
ধর্মনাশের কর্মভূমি উহার মত নাই!
কোঠায় কোঠায় ভরা ইহার গভীর হাহাকার,
পালঙ্কে পালঙ্কে কত কলঙ্ক তাহার!"

—'মগের মুলুক'—এই কলঙ্কের ইতিহাস, ব্যভিচারের ইতিহাস, বর্বরতার ও অত্যাচারের চরমতম ইতিহাস। আর গোবিন্দদাস এই পৈশাচিক অত্যাচারের সাক্ষী ও অত্যাচারিত কবি। তাই তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—

"অত্যাচার অবিচার ব্যভিচারগুলি,
একে একে যত কথা লিখব সবি খুলি!"

কবি এই প্রতিশ্রুতি নির্ভীকভাবে রক্ষা করিয়াছেন তাঁহার 'মগের মুলুক' কাব্যে। 'নব্যভারত' সম্পাদক যথার্থই লিখিয়াছেন—"মগের মুলুকের লেখক ভারতচন্দ্রের যোগ্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নচেৎ এত অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইত না। তাহার বর্ণনা কত সুন্দর।"[১৭৭] কবি যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য তাঁহার 'রোজনামচা'য় লিখিয়াছেন—"তীব্র ব্যঙ্গ-কবিতার পুস্তকে এত কবিত্ব আর কোথাও এ যাবৎ দেখি নাই। কী মনোরম কবিত্বে ভরা ব্যঙ্গ কাব্যখানি!"[১৭৮]

কবির তৃতীয় গীতিকাব্য—"কস্তুরী"। গ্রন্থখানি ১৩০২ সালে আষাঢ় মাসে (১৮৯৫ খ্রীঃ, ২২শে জুলাই) প্রকাশিত হয়। কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে এই কাব্যখানি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এখানে 'সারদা ও প্রেমদা', 'দেবতা', 'বিদায়', 'আমার ভালবাসা', 'চাহিদা', 'মেঘ' প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখযোগ্য। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মণিকুন্তলার শেষ স্মৃতিকণা 'জননী আমার' কবিতাটি। "কস্তুরী"-কাব্যেও কবি জন্মভূমি ভাওয়ালের জন্য বিলাপ করিয়া বলিয়াছেন—"কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই"। কাব্যটিতে ভাওয়ালের অধঃপতনের কিছু বর্ণনাও আছে। 'বিদায়'-কবিতাটিতে কবি তাঁহার নির্বাসন-দণ্ডের কথা ইঙ্গিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ভাওয়ালের তৎকালীন অবস্থার কথাও আভাসে জানাইয়াছেন। কবি লিখিয়াছেন—

---

১৭৭. 'নব্যভারত'—অগ্রহায়ণ, ১৩২৫, পৃঃ ৩৫৩।

১৭৮. অপ্রকাশিত রোজনামচা, ৫ই ফাল্গুন, ১৩২৪। ইং ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮।

"চলিলাম প্রাণময়ি। চলিলাম আজি,
পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়,
এই ভাসাইনু তরী, জানি না বাঁচি কি মরি,
জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায়।"

যদিও কবি যাইতেছিলেন জন্মভূমির দিকে, অথচ লিখিলেন "বিদায়"। কি উদ্দেশ্যে, কি অবস্থায়, "বিদায়" রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা না যাইলেও 'জানি না দৈবের বশে যাইব কোথায়'—বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত।

কবি গোবিন্দদাসের চতুর্থ গীতিকাব্য—"চন্দন"। ইহা 'নব্যভারতে'র কার্যাধ্যক্ষরূপে অবস্থানকালীন ১৩০৩ সালে (১৮৯৬ খ্রীঃ, ২৫শে সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি কবি গোবিন্দদাস তাঁহার বন্ধু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন—

"সাপের গরলশ্বাসে, পাষাণের সহবাসে,
একে ত বিষাক্ত তিক্ত কঠিন চন্দন,
তাহে আরো আম্র কাঠ, নাহি রুচি নাহি ঠাট,
জমাট কুরুচি যেন বিকট দর্শন।
নাহিক আধার পাত্র, উলঙ্গ উন্মুক্ত গাত্র,
শিখেছে পশুর কাছে পশুর আচরণ,
এ সুসভ্য দেশে ভাই, কারে ইহা দিতে যাই,
শুনিলে সুরুচি দূরে করে পলায়ন।
তুমি হে শিবের মত, কালকূট কণ্ঠগত,
নির্ভীক নির্ম্মুক্তিচিত্ত মহা মৃত্যুঞ্জয়,
নিঃসহায়, নির্বাসিত, উৎপীড়িত, উপেক্ষিত,
সকলে উদার বক্ষে দিতেছ আশ্রয়।
তাই হে তোমায় ভাই, এ চন্দন দিতে চাই,
তুমি না করিবে ঘৃণা নিশ্চয়—নিশ্চয়।

স্নেহের নয়নজলে, ঘষিও হৃদয়তলে,
কুরুচি—কামনা-রোগ এতে দূর হয়।"[১৭৯]

এই "চন্দন" কাব্যেও দরিদ্র কবির সেই বিলাপগাথা বিবৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'নির্বাসিতের আবেদন', 'ভাওয়াল', 'বাঙ্গালী', 'কালীয়দমন' প্রভৃতি কবিতাগুলি অতুলনীয়। যেমন 'ভাওয়াল' কবিতায় কবি জন্মভূমি ভাওয়ালের কথা স্মরণ করিয়া লিখিয়াছেন—

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা,
ভাওয়াল আমার প্রাণ,
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।"

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এইরূপ 'নির্বাসিত অধম সন্তান'-এর দৃষ্টান্ত মেলে না। আবার 'নির্বাসিতের আবেদন' কবিতায় কবির জ্বালাময় জীবনের মর্মবেদনা স্পষ্টভাবে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—

"তোমরা বিচার কর ভাই।
কেন আমি দেশ ছাড়া, আত্মীয়স্বজন-হারা,
কেন সে জনমভূমি দেখিতে না পাই?"

যেখানে স্বার্থ বড় ক্রুর, লোভ বড় নিদারুণ, অজ্ঞান একান্ত অন্ধ—'গর্ব চলে যায় অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে'; সেখানে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা ও ন্যায়-এর প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি? কবি এই বিড়ম্বিত জীবনের উপেক্ষিত ও অবহেলিত কবি।

কবির রচিত সনেট সমষ্টিমূলক কাব্যের নাম—"ফুলরেণু"। ইহাও ১৩০৩ সালে আশ্বিন মাসে (২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৬ খ্রীঃ) "নব্য-ভারতের"-র কার্যাধ্যক্ষরূপে অবস্থানকালীন প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি কবি তাঁহার বন্ধু দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন—

---

১৭৯. ২১শে শ্রাবণ, ১৩০৩ সন, কলিকাতা।

"দেবেন্দ্র। দেবেন্দ্র তুমি আমি মনে জানি,
ত্রিদিব হইতে উচ্চ হৃদয় তোমার,
চিরবসন্তের উহা পুষ্প রাজধানী,
চিরফুল্ল ও নন্দনে মমতা-মন্দার।
বহিছে অমৃত-গঙ্গা স্নেহ করুণার,
সিক্ত করি সদা প্রেম—কল্পতরুমূল,
দরিদ্র দুঃখীরা তব দেব পরিবার,
অবিরত ভুঞ্জে তাহা আনন্দে আকুল।
আমার হৃদয় এক দগ্ধ চিতাভূমি,
তাহাতে ফুটিয়াছিল রক্ত চিতাফুল,
তব যোগ্য নহে, তবু জান তাহা তুমি
ছিঁড়িয়া প্রেতেনী প্রেত করেছে নির্মূল।
পিশিছে ফুকারি অস্থি বাজাইছে বেণু,
উড়ে তাই ছাই ভস্মে যদি ফুলরেণু।"[১৮০]

দেবেন্দ্রকিশোরের মত মহৎ, উদার, অতিথিবৎসল, নিরহঙ্কারী ও পরোপকারী মানুষ সে যুগে বড় একটা দেখা যায় নাই। তিনি দীন-দুঃখী আতুর ও বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। কবির সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয়ের প্রণয় পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে "ফুলরেণু" কাব্যখানি উৎসর্গ করিয়া কবি বন্ধুত্বের যথাযোগ্য স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

১২৯৫ সালে পৌষ মাসে কবি একবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন রাজা ছিলেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের

---

১৮০. ২১শে ভাদ্র—১৩০৩ সন, কলিকাতা।

বাসায় কবি তখন অবস্থান করিতেন। এই সময় আগরতলার পাহাড়ে ও মণিপুরী পল্লীতে বেড়াইতে যাওয়ার সৌভাগ্য কবির হইয়াছিল। "চম্পামুড়া" কবিতা 'চম্পামুড়া' দেখিয়াই কবি লিখিয়াছিলেন—

"সুন্দর শ্যামল বনভরা চম্পামুড়া,
বহে নীচে নির্ঝরিণী গিরি প্রস্রবণ,
পুণ্যময় দেবদেশ স্বাধীন ত্রিপুরা,
প্রকৃতির পুণ্যময় নিকুঞ্জ কানন।"

মুক্তাগাছার বিখ্যাত রাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর তাঁহার স্বর্গীয়া রাণীর নামে ময়মনসিংহ শহরে যে জলের কল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে 'রাজরাজেশ্বরী' উল্লেখপূর্বক কবি লিখিয়াছিলেন—

"তব এ স্নেহের শ্রাদ্ধ প্রেমের তর্পণ
সর্বভূতময় মহা মহান মঙ্গল,
জগতের তুষ্টে তুষ্ট নিজে নারায়ণ,
রাখিবেন পূর্ণ কীর্তি চির সমুজ্জ্বল।"

"ফুলরেণু" কাব্যগ্রন্থেও আছে 'চিলাই' নদীর কথা—

"চিলাই, তোমার জলে গিয়াছে ভাসিয়া,
সেদিন যে তরীখানি হায় হায় হায়,
অলঙ্কার যত ধন যত রত্ন নিয়া
শরতের স্বর্ণ-উষা হয়েছে বিদায়।"

'চিলাই-নদীর তীরে শ্মশান-শয্যায় শায়িতা সারদার কথা কবি কোনদিন ভুলিতে পারেন নাই। তাই "ফুলরেণু" কাব্যগ্রন্থেও 'সারদার প্রেম'-এর কথা স্মরণ করিয়াছেন—

"না না না সে দেবরাণী দেবদেশে গিয়া,
আজিও সারদা বুঝি ভোলেনি আমায়,
শত চক্ষে শত স্নেহে দেখিছে চাহিয়া,
স্বর্গমর্ত্য-ব্যাপী তার দীর্ঘ পিপাসায়।"

একদিকে সারদা এবং অপরদিকে প্রেমদা, মাঝখানে চিলাই। আর আছে "ভাওয়াল"—'ভাওয়ালে পূজা', 'ভাওয়ালে বিজয়া', 'ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা', এবং 'রাজা কালীনারায়ণ রায়'। তাহা ছাড়া, 'তুমি আর আমি', 'চুল ও কান', 'অবলা ও অনল', 'নারী ও শকুনী', উল্লেখযোগ্য। 'নারী ও শকুনা' কবিতার শেষে কবি বলিয়াছেন—

"শুকুনা খাইলে মড়া তখনি ফুরায়,
রমণী জীবিত রেখে দিনে দিনে খায়।"

ইহার কারণও কবি 'নারীর হৃদয়' কবিতায় উল্লেখ করিয়াছেন—

"শূন্য বক্ষে নারী যেন পারে না তিষ্ঠিতে,
রমণী রাক্ষসী যে ক্ষিপ্ত আলিঙ্গন,
পরে নর-মুণ্ডমালা নিত্য হরষিতে,
কপোল বহিয়া পড়ে সরক্ত চুম্বন।"

কাব্যখানি শেষ হইয়াছে 'অনুরোধ' দিয়া—

"জয় জয় জন্মভূমি 'জয়দেবপুর'
জয় জয় পূর্ণ নদী—ধবল 'চিলাই',
প্রকৃতির রত্নভাণ্ডে সুধা সুমধুর,
বিধাতা রেখেছে, বুঝি আর কোথা নাই।
এই দেবপুরবাসী দেবতা আমার,
জননী 'আনন্দময়ী' পিতা 'রামনাথ',
'সারদা' প্রেয়সী-পত্নী প্রেম-পারাবার,
দুহিতা 'প্রমদা', 'মণি', তাহাদের সাথ

হারাইয়া তার যত আত্মীয় স্বজন,
হারায়ে সে দেবভূমি প্রিয় দেবপুর,
স্বর্গের দেবতা করি নরকে ভ্রমণ,
দেখাইয়া দিছে মোরে দানব অসুর।
যে দেশে যেখানে ভাই যে ভাবেই মরি,
'জয়দেবপুর' বলি বলো হরি হরি।"[১৮১]

কবি গোবিন্দদাসের "বৈজয়ন্তী" কাব্যখানি পঞ্চম গীতিকাব্য। ইহা ১৩১২-সালে কার্ত্তিক মাসে (২০শে নভেম্বর, ১৯০৫) প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি কবি তাঁহার অন্নদাতা রাজা জগৎকিশোরকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—

"মুক্তাগাছার মুক্তা তুমি, বঙ্গভূমির হীরা,
রাজা রাণীর মাথার মণি যশে জগৎঘিরা!
শশী রবি মলিন সবি মধুর পুণ্যলোকে,
সর্বজয়া তোমার দয়া দুখে রোগে শোকে।
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের মাতা,
কাঙ্গাল গরীব আতুর অন্ধের অন্নবস্ত্রদাতা।
হৃদয়ভরা স্নেহ-দয়া, নয়নভরা জল,
জগৎভরা দানে কেবল শূন্য করতল।
ধন্য তুমি জন্মভূমির পুত্র পুণ্যবান,
বঙ্গভাষার ভরসা আশা সহায় সুমহান।
হে সন্ন্যাসী, রাজঋষি! তোমার মত কেবা,
জগৎরাজার মত কর জগৎবাসীর সেবা।
শ্রদ্ধা ভরে ভক্তি ভরে তোমায় নমস্কার
কৃপা ক'রে গ্রহণ কর প্রীতির উপহার।"[১৮২]

---

১৮১. ১০ই বৈশাখ—১৩০৩ সন, লতপ্‌দি, ঢাকা।

১৮২. ১১ই ভাদ্র, ১৩১২ সন, ব্রাহ্মণগ্রাম, বিক্রমপুর, ঢাকা।

রাজা জগৎকিশোর কবি গোবিন্দদাসকে স্বীয় নামে পঞ্চদশ মুদ্রা এবং কুমার জিতেন্দ্রকিশোরের নামে পঞ্চমুদ্রা, মোট বিংশতি মুদ্রা তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে এই অপার করুণার কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই উপলক্ষে কবি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে লিখিয়াছিলেন—

জগৎকিশোর।

নির্বংশ সগরবংশ করিতে উদ্ধার,
মর্ত্যধামে মন্দাকিনী আনে ভগীরথ,
মৃতসঞ্জীবনী শক্তি নাই আর তার,
সে এখন কীর্তিনাশা কর্মনাশাবৎ।
মৃত এ পতিত জাতি, মৃত জন্মভূমি,
ভাষা মাত্র আশা তার উদ্ধার উপায়,
সে পুণ্য অমৃতগঙ্গা বহাইয়া তুমি,
জাতীয় জীবন রাখ স্নেহ করুণায়!
অনন্ত অভাব ঘটা বেষ্টিত জটায়,
মহা দৈন্য গিরি অন্য, সবে রোধে পথ,
কঠোর জঠর জ্বালা জহ্নুসম হায়,
দুর্ভাবনা দুর্মনস্ মহা ঐরাবত।
নাশি এ পথের বিঘ্ন ভাসায়ে ভারত,
বহাও অমৃতগঙ্গা নব ভগীরথ।"

এই 'নব ভগীরথে'র দৃষ্টান্ত অনুসারে ভাওয়ালের তিন কুমার মাসিক আটটি মুদ্রা হিসাবে কবিকে চতুর্বিংশতি মুদ্রা বৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই বৃত্তিলব্ধ ধন ও পুস্তকের যৎকিঞ্চিৎ সামান্য আয়ে তিনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া ১৩১৮ সাল পর্যন্ত সংসারযাত্রা নির্বাহ করিয়াছিলেন।

"বৈজয়ন্তী" কাব্যে তাঁহার সন্তান-বাৎসল্যের কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—

"ভুলি নাই।
আজিও দেখিলে চাঁদ, মনে পড়ে মুখ ছাঁদ,
আকুলি বেকুলি তাই সে নীল অকূলে চাই।
ভুলি নাই, ভুলি নাই।"

"আমি ও সে" কবিতায়—

"আমি। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়।
জীবনভরা যত্ন গেল রত্ন পিপাসায়।"

* * *

"সে। আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়।
আমার স্নেহে হাসে ধরা,
চাঁদের চেয়ে সুধা ভরা,
দগ্ধ জগৎ মুগ্ধ আমার স্নিগ্ধ মমতায়।
আয়রে ভোলা আমার কোলে
আমার কোলে আয়।"

১৩০৩ সালে ২০শে অগ্রহায়ণ পুত্র অরবিন্দের জন্মোপলক্ষে লিখিত বাৎসল্যের কবিতাখানি স্নেহরসে সিক্ত। এই ধরনের কবিতা ছাড়াও প্রথমা পত্নীর বিয়োগব্যথামূলক কবিতাও আছে। "তুমি না থাকিলে" কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

"আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
প্রভাতে সোনার সূর্য হবে না উদয়,
আমি ভাবিতাম আগে তুমি না থাকিলে,
বুঝি বা আঁধার রাত চিরকাল রয়।

এখন দেখিতে পাই তুমি না থাকিলে,
তেমনি অরুণ উঠে, নিশি হয় ভোর,
তেমনি পূর্ণিমা রেতে নব ঘন নীলে,
উল্লাসে উড়িয়া খেলে গগনে চকোর।"

"বৈজয়ন্তী" কাব্যে 'কাপুরুষ' শীর্ষক কবিতাটি অতি জঘন্য প্রকৃতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কবিতার উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, কবির দুঃখময় জীবনের যাহারা নিয়ামক, তাহাদের অন্যতম। আড়ালে থাকিয়া কলকাঠি নাড়িয়া গভীর ষড়যন্ত্রের জালে কবির জীবনকে যে বাঁধিয়াছিল, সেই কাপুরুষকে উদ্দেশ করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"হা রে ভীরু কাপুরুষ, হা রে নরাধম,
দৈবে আমি মরি যদি,
তার লাগি নিরবধি,
করেছিস্ কত নাকি মারণের ক্রম ?"

হাজারবিধ 'মারণের ক্রম'-এর মধ্যে পড়িয়াও কবির ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নাই। মৃত্যুমুখে পড়িয়াও কবি ধীর স্থির ভাবে নিজের "কর্তব্য" কর্ম করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

"ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক,
শত দিকে শত দুঃখ আসুক—আসুক
এ সংসার কর্মশালা,
জ্বলন্ত কালান্ত জ্বালা,
পুড়িতে হইবে খাদ থাকে যতটুক।"

এই সংসার-কর্মশালায় কবি—

"বাধা বিঘ্ন ঠেলি পদে
সিংহ ফিরে ধীর মদে
আত্মগুপ্ত সভয়ে শম্বুক !
ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক।"

ইহা কবি গোবিন্দদাসের আত্মজীবনের কথা। এখানে তিনি জীবনের আদর্শ সকলের আদর্শ করিয়া তুলিয়াছেন।

"বৈজয়ন্তী" কাব্যে 'আমরা হরিহর' নামক একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে। ইহা বঙ্গভঙ্গ-প্রাক্কালে রচিত হইয়াছিল। ভ্রাতৃত্ব, দেশাত্ম এবং সর্বধর্মসমন্বয়ের এক অপূর্ব সর্বজনীন মিলনের ছবি কবিতাটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

"আমরা হরিহর।
আমরা বঙ্গ, আমরা আসাম,
হৌক না মোদের সহস্র নাম,
আমরাই মদিয়া সিন্ধু সেতু—রামেশ্বর,
আমরা নাগা, আমরা গারো,
কেহই ত পর নহি কারো,
খড়গী বর্গী গুর্খা জাঠ আর পার্শী সওদাগর,
পণ্ডিচেরী ফরাসডাঙ্গা,
নামে কি যায় ভারত ভাঙ্গা?
কেউবা কালো কেউবা রাঙ্গা একই কলেবর,
কেউ বা চরণ কেউ বা হস্ত,
বক্ষ চক্ষু ললাট মস্ত,
একই দেহের রক্ত মাংস আমরা পরস্পর।"

কবি মানবপ্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। কাব্যকে তিনি জীবনের সঙ্গে এক করিয়া দেখিয়াছেন। এই যে কাব্য ও জীবনের একাঙ্গীকরণ, তাহার মূলে আছে পত্নীপ্রেম, প্রীতি ও সন্তান-বাৎসল্য। স্বদেশের সঙ্গে তিনি যেমন নাড়ীর যোগ অনুভব করিয়াছেন, তেমনি তিনি প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে লীলাসঙ্গিনী ও কাব্য-সঙ্গিনী করিয়া তুলিয়াছেন। কবির সমগ্র কাব্য-গ্রন্থে কোথাও না কোথাও আছে সারদার উদ্দেশ্যে প্রেম-উপহার। সারদার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা জল্পনা-

কল্পনা প্রচলিত থাকিলেও কবি গোবিন্দদাস তাঁহার "বৈজয়ন্তী" কাব্যে 'কি কঠিন' নামক একটি কবিতায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা ইঙ্গিতবহ ও ব্যঞ্জনাময়।—

"মুহূর্ত করেছি ভুল অতি সূক্ষ্ম এক চুল!
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার।
যদিও বুঝিয়া আজ, শুধু ঘৃণা শুধু লাজ,
দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ পার।"

মৃত্যু যেন অমৃতের সেতু, তাই মৃত্যুকে, দুঃখ-কষ্টকে জয় করাই যেন "বৈজয়ন্তী" কাব্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী!

"বৈজয়ন্তী"-কাব্যের পর কবি গোবিন্দদাস 'শোক ও সান্ত্বনা' এবং 'শোকোচ্ছ্বাস'—এই দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত আর কোন কাব্যগ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী রক্তামাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া ১৩১৬ সালে ৬ই বৈশাখ স্বাস্থ্য-উদ্ধারের মানসে দার্জিলিং গমন করেন। সেখানে তিনি হঠাৎ ২৫শে বৈশাখ রাত্রিতে পরলোকগমন করেন। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবি গোবিন্দদাসের রচিত শোকগাথা ১৩১৬ সালে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় "নব্যভারতে" প্রকাশিত হয়। পরে তাহা ঐ সালেই "শোক ও সান্ত্বনা" নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ইহা শোকসঙ্গীত হইলেও ভাওয়ালের উদ্দেশ্যে বিলাপ-গাথা!

আবার এক বৎসর অতিক্রম হইতে না হইতেই অর্থাৎ ১৩১৭ সালে ভাওয়ালের বড়কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে ভাওয়ালে যেন ইন্দ্রপতন ঘটে। এই উপলক্ষ্যে কবি গোবিন্দদাস "শোকোচ্ছ্বাস" লিখিয়াছিলেন, যাহা ১৩১৭ সালে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

"শোকোচ্ছ্বাস"—একটি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক হইলেও ভাবে-সুরে

ভাষায়-ছন্দে ইহা একটি মনোরম কবিতা। এখানে উচ্ছ্বাস থাকিলেও তীব্রতা আছে, দাহ থাকিলেও স্নিগ্ধতা আছে, আর আছে ভাওয়ালের প্রশাসনিক দুর্বলতার কথা, অত্যাচার ও অসাম্যের কথা যা "মগের মুলুকে" বলা হইলেও যেন সব বলা হয় নাই। তাই "শোকোচ্ছ্বাস" যেন "মগের মুলুকে"রই অভিনব সংযোজন যাহা উপমাবৈচিত্র্যে ও বর্ণনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব। যথা—

"আজিকার—

এ ঘোর গভীর শোক বাষ্প সম নহে লঘু,
উড়িয়া যাইবে দীর্ঘশ্বাসে,
বিলাপে কি হাহাকারে প্রাণ হবে লঘুভার
পরিমুক্ত কণ্ঠের বাতাসে।"

এই 'পরিমুক্ত কণ্ঠের বাতাসে'র জন্য কবির মন হাহাকার করে, উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলে ব্যথিত মথিত করে, তাই তো গণদেবতার নিকট কবির আবেদন—

"বরষা দুর্দ্দিন অন্তে প্রফুল্ল শরৎ আসে,
জগতের এই ত নিয়ম,
অশ্রুময় শোক ঋতু ভাওয়ালে অপরিবর্ত
ভাওয়ালের বিধি ব্যতিক্রম!
এ ভাওয়াল অযোধ্যায়, কি কালপুরুষ হায়,
কি কুক্ষণে করিল প্রবেশ,
রাজ্য হল ছারখার, রাজ না রহিল আর,
সবংশে করিল প্রায় শেষ!
প্রাণের অধিক ভাই, স্নেহের তুলনা নাই,
বর্জিয়া সে রমেন্দ্র-লক্ষ্মণ,—
বিধাতা হইল বাম, অকালে রণেন্দ্র রাম,
করিলা আপনা বিসর্জন!"

—'ভাওয়াল' যেন প্রকৃতির লীলাভূমি, দেবতার স্বর্গভূমি। কবির ভাষায় 'এ ভাওয়াল অযোধ্যা'। কিন্তু 'কি কালপুরুষ' 'কি কুক্ষণে করিল প্রবেশ।' ফলে—

"অভাগী—'সরযূ'বালা, পরিয়া চিতার মালা,
অশ্রুজলে বহিছে সদাই,
দীর্ঘশ্বাসে অনিবার, জীবন-তরঙ্গে তার,
ভাসিতেছে চিতা-ভস্ম ছাই।
রমেন্দ্র-রমণী সতী, শোকাকুলা বিভাবতী,
নয়নে গলিছে অশ্রুধার,
বরষার জলে ভরা, উনমত্তা 'খরখরা',
কাঁদিছে ধরিয়া গলা তার!
কিম্বা যথা পতিহীনা, দু'টি কুরঙ্গিনী দীনা,
কাঁদে আহা গলাগলি করি,
অথবা হারায়ে পতি, বিবশা ব্যাকুলা অতি,
কাঁদে দু'টি অভাগা কুররী!
কিম্বা জলহীন বিলে, কুমুদ কমল মিলে,
কর্দমে লুটিছে হায়, হায়,
প্রতিপদে শশী রবি, আহা কি করুণ ছবি,
এক সাথে ডুবিছে সন্ধ্যায়!"

কবি গোবিন্দদাস কত উঁচুদরের কবি ছিলেন, তাহা শেষোক্ত ছত্র দুইটি লক্ষ্য করিলেই বোঝা যায়। উপমাচ্ছলে—'প্রতিপদে শশীরবি', 'এক সাথে ডুবিছে সন্ধ্যায়'—সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা। অথচ সাধারণ একটি ঘটনা লইয়া অসাধারণ কাব্যসৃষ্টি। উপসংহারে কবি গোবিন্দদাস কনিষ্ঠ রাজকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"রবীন্দ্র! ভরত সম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রিয়তম,
রামের চরণ পূজা করি,
পালন করহ রাজ্য, কর ধর্মে রাজকার্য
আলস্য জড়তা পরিহরি!
রাজার বিলাস ভোগে, রাজার অমনোযোগে,
রাজা হয় সবংশে বিনাশ,
ইহাই রাজার পাপ, বিধাতার অভিশাপ,
ইহাই রাজ্যের ইতিহাস!
সনাতন রাজনীতি, সাধিবে প্রজার প্রীতি
ন্যায় ধর্মে করিবে পালন,
প্রজার সে অসন্তোষে, অর্থ শোষে বল শোষে
রাজলক্ষ্মী করে পলায়ন।"

সবকিছু থাকা সত্ত্বেও 'রাজলক্ষ্মী করে পলায়ন'—কথাটি তাৎপর্য-পূর্ণ। কবি ভাওয়ালের সুখে-দুঃখে অংশীদার; তাই ভাওয়ালের কল্যাণ, তাঁহার কল্যাণ। কারণ, "গোবিন্দচন্দ্রের কাব্যের সহিত ভাওয়াল রাজবংশের কীর্তি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তিনি ভাওয়াল রাজ্যের প্রজা। শৈশব হইতে ভাওয়াল রাজবাটীতে, রাজ-অন্নে, রাজ-অনুগ্রহে লালিত-পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যের যে গৌরব-আসনে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত, ভাওয়ালরাজই তাহার প্রধান কারণ। তজ্জন্য কবি এবং কবির গুণমুগ্ধ দেশবাসিগণ ভাওয়াল রাজ সংসারের নিকট কৃতজ্ঞ।"

"শোক ও সান্ত্বনা" ও "শোকোচ্ছ্বাস"-এর পর কবি গোবিন্দদাস 'গীতার কাব্যানুবাদ'-এর মত দুরূহ কার্যে ব্রতী হন। এই মহৎ কার্যের পিছনে যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, তাহা নিম্নরূপ—

"রঙ্গপুর জেলার তুষভাণ্ডারের জনৈকা রাণী মহোদয়া কাশীধামে শিব-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়া গীতা বিতরণ করিবার প্রস্তাব করেন।

কবি গোবিন্দদাসের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দিয়া গীতার বঙ্গানুবাদ করাইতে রাণী মহোদয়ার আগ্রহ জন্মে। তদনুসারে তিনি তাঁহার কর্মচারী শ্রীযুক্ত নিকুঞ্জমোহন লাহিড়ী মহাশয় দ্বারা কবিকে ১৩২২ সনের ৩০শে পৌষ একখানা পত্র লিখাইয়া স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্যের জন্য রাণী মহোদয়া কবির পারিশ্রমিক স্বরূপ প্রায় দুইশত মুদ্রা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে দাস-কবির সঙ্গে লাহিড়ী মহাশয়ের বহু পত্রালাপ হইয়াছিল।"[১৮৩]

এই লাহিড়ী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় ও রাণী মহোদয়ার অনুরোধে কবি গোবিন্দদাস ১৩২২ সালের মাঘ মাস হইতে গীতার বঙ্গানুবাদ আরম্ভ করেন এবং শেষ করেন মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে (অর্থাৎ আড়াই বৎসর ব্যাপী সময়ের মধ্যে)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কবির জীবদ্দশায় গীতার অনুবাদ রাণী মহোদয়ার হস্তগত হয় নাই। এই সম্পর্কে তিনি একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—"অনুবাদ করিবার পূর্বে ভাবি নাই যে, কাজটা এত কঠিন। অনুবাদ আরম্ভ করিয়া বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছি। এক-একটি শ্লোকের জন্য আমাকে এত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে যে, তাহা আর কি বলিব? এই জন্য অনেক সময় লাগিতেছে। তার পর আমি সংসারের নানা রকম যন্ত্রণায় বিব্রত। এই অবস্থায় কতদিনে যে অনুবাদ শেষ করিব বলিতে পারি না। অন্নচিন্তা না থাকিলে অন্য কথা ছিল।" কারণ কবির নিকট 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়'। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অনুবাদ-কার্যটি তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত "মহাযুদ্ধ" ও "পদ্মানদী" প্রসঙ্গে দুইখানি কাব্য রচনা করিবার যে বাসনা করিয়াছিলেন, তাহা আর পূরণ হয় নাই।

---

১৮৩. শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তী—'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ ১৭৫

'গীতার অনুবাদ' কবি বেশ ভালভাবেই করিয়াছিলেন। সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ-কার্যটি সম্পূর্ণ হওয়ায় রাণীমহোদয়া বেশ খুশী হইয়াছিলেন। রাণীমহোদয়া গীতার আক্ষরিক অনুবাদ চাহিয়াছিলেন এবং কবি গোবিন্দদাসও তাঁহার অভিপ্রায়-মত সাধ্যানুসারে কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

যথা—

"গীতা" প্রথম অধ্যায়।

"ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মদীয় পাণ্ডবে
কি করিল সঞ্জয় যুদ্ধার্থী মিলি সবে ?
সঞ্জয় করে কি মিলে রণাকাঙ্ক্ষী সবে ? (১)

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে মম পুত্রগণ
আর পাণ্ডুর তনয়,
মিলিত হইয়া সবে করিবারে রণ
কিবা করিল সঞ্জয় ?" (২) ইত্যাদি

অনুবাদখানি অদ্যাপি অমুদ্রিত রহিয়াছে এবং কাহার নিকটে আছে তাহা কবির বংশধরেরা বলিতে পারেন না। কেহ এই অনুবাদ-খানির সঠিক সন্ধান দিলে এবং লিখিয়া লইবার অনুমতিদানে বাধিত করিলে আমি তাঁহার নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ থাকিব।

কবি গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত কবিতাবলীর কিছু কিছু 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সব অপ্রকাশিত রচনা-বলীর মধ্যে আছে দেশাত্মবোধক কবিতা, ব্যঙ্গ-রঙ্গরস, প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ধর্মমূলক বহু উজ্জীবন কবিতা। সমগ্র রচনাবলী একত্র করিলে প্রায় তিন-চারিখানি গীতিকাব্য হয়।

ইহা ছাড়া ঢাকানিবাসী ৺নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সংকলিত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী"তেও গোবিন্দদাসের দেশভক্তিমূলক ও

সুরাপান-নিবারণী বিষয়ক কয়েকটি গান স্থান পাইয়াছে। "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী"-সম্পাদনকালে নবকান্তবাবু বাংলাদেশের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহে উপস্থিত হইলে কবি গোবিন্দ-দাসের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। এই সূত্রে কবির রচিত যে পাঁচটি জাতীয় সঙ্গীত "ভারতীয় সঙ্গীত মুক্তাবলী"তে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার প্রথম চরণগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) অসুরে সুর সাম্রাজ্য ভুগিতেছে নিরাতঙ্কে,
(২) এস ভাই মিলে মিশে এই ত শুভ সময়,
(৩) নয়ন সলিলে মাতঃ কেন গো ভাসিছ আজ ?
(৪) বহুদিন হতে রে ভাই শ্রীহীনা অমরাপুরী—,
(৫) ভারত সৈরিন্ধ্রীবেশে আছে বিরাটের ঘরে।

কবি গোবিন্দদাস নিজে গান করিতে জানিতেন না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়তন্ত্রীতে যে বীণা বাজে, যে রাগরাগিনীর আলাপ হয় ; তাহাতেই তাঁহার দুঃখের দেবতার অভিষেক হয়। মনে-প্রাণে সঙ্গীত-প্রীতি না থাকিলে সঙ্গীত রচনা করা সম্ভবপর নয়। গোবিন্দদাসের এই গানগুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি মনে-প্রাণে স্বদেশ-প্রেমের চারণ কবি ছিলেন।

"ভারতসঙ্গীত মুক্তাবলী"-তে কবি গোবিন্দদাস সুরাপান নিবারণী-বিষয়ক কয়েকটি গান ১২৮৮ বঙ্গাব্দে রচনা করেন। গানগুলি তীব্র শ্লেষাত্মক অথচ প্রাণস্পর্শী। যথা—

"কেমনে ভারতে পাপ সুরাস্রোত প্রবেশিল,
অনল প্লাবনে দেশ একেবারে ভাসাইল !
শুধু এ অনল নয়, এ বহ্নি গরলময়
অনন্ত প্রবাহ বলে ভারতেরে বিনাশিল !

হায় রে সোনার বঙ্গে, এ পাপ সুরা তরঙ্গে
অঙ্গার করিল সব যা কিছু সম্পদ ছিল !
দেশের ভরসা যারা, হায় এ অনলে তারা
ঐশ্বর্য বিভবসহ জীবন আহুতি দিল !
পুত্রশোকে অবিরত, কাঁদে জন্মভূমি কত
অবিরল অশ্রুজলে এ অনল না নিভিল ।”

মদ্যপানের কুফল এবং সমাজে তার প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী কবিতাটিতে তাহাই বলা হইয়াছে। আজ বর্তমান ভারত সরকার মদ্যপান-নিরোধ-এর জন্য নানাপ্রকার প্রচার ও চেষ্টা করিতেছেন, প্রয়োজনে আইনের সাহায্য লইতেছেন ; তথাপি মদ্যপান বন্ধ হইতেছে না— সোজা পথে বন্ধ হইলে সুড়ঙ্গপথে চলিতেছে। অথচ প্রায় তিন যুগ পূর্বে বাংলা দেশের এক অবহেলিত কবি দেশবাসীর নিকট বলিষ্ঠ অথচ দৃঢ় মনোভাবে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন—

“ছি ছি ! ওঠ ওঠ ওহে ভাই
আঁখি মেলে দেখ একবার,
কি ছিলে কি হইয়াছ, জানি কি হইবে আর !
বলি না সত্যের কথা বলি না দ্বাপর ত্রেতা,
স্মৃতির সমাধি খুঁজে পাবে না কঙ্কাল তার !
দেখ পূর্ব বর্ষগত, দেখ সে পুণ্য ভারত
মিলাইয়া ভবিষ্যৎ, দেখ আজি আপনার !
তুমি মোহে মূর্চ্ছাপন্ন, সুরাপানে অবসন্ন,
দেখ দেখি কি বিপন্ন জনমভূমি তোমার ।”

—কি বুকফাটা আর্তনাদ—‘দেখ দেখি কি বিপন্ন জনমভূমি তোমার ।’ হাজার বক্তৃতায় যাহা সম্ভবপর হইত না, স্বভাবকবির স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় লেখা এই গান তাহার চেয়েও বেশী কার্যকর। বর্তমানে

হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে, সভা-সমিতিতে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই গানের প্রচার যত হয় ততই মঙ্গল।

১২৮৮ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহে বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় "সুরাপান নিবারণী" সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভার বাৎসরিক উৎসবের জন্য কবি গোবিন্দদাস অনুরুদ্ধ হইয়া "সুরাসুর বধ" নামে কবিতায় একটি ক্ষুদ্র নাটিকা রচনা করেন। পরে উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টায় তাহা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। একটুখানি পরিচয় দিলে এই সাফল্যের কারণ বোঝা যাইবে—

"সুরার উক্তি।

নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়,
'অগস্ত্য গণ্ডূষ' কর পিপে সমুদয়।
গ্রামে গ্রামে খোলা ভাঁটি, আছে বেশ পরিপাটি,
জীবন মুক্তির পথ বহুদূর নয়।
খাও ব্রাণ্ডী এক গ্লাস, কাটিবে ভবের ফাঁস,
আপনি সচ্চিদানন্দ হইবে চিন্ময়।
ভুলে যাও আত্মপর, দ্বেষ হিংসা পরস্পর,
করহে যোগীর মত উদার হৃদয়।
কুকুরের গলা ধরি, থাক ভূশয্যায় পড়ি,
কর দোঁহে ভ্রাতৃভাবে নব পরিচয়;
নিলে যদি বঙ্গবাসী আমার আশ্রয়।"

আত্মবিস্মৃত ও অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতি পরাধীনতার গ্লানি সহ্য করিয়াও মদ্যপানে কিভাবে ডুবিতেছে ও মরিতেছে, কবিতাটি তাহারই এক বিচিত্র এ্যালবাম্। স্বাধীন ভারতেও ভারতবাসী, তথা বাঙ্গালী, এই মদ্যপানের অভিশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। পারে নাই নিজেকে নির্ভীকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। জাতির পক্ষে ইহা কি কম

লজ্জাকর? অবহেলিত কবির কবিতা কিন্তু অবহেলিত ছিল না; আজকের দিনে ত নয়ই। রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জন"[১৮৪] নাটকে বলি-বন্ধের কথা থাকিলেও বলি বন্ধ হয় নাই; আজও দেবতার নামে বলি চলিতেছে। তেমনি কবি গোবিন্দদাসের মদ্যপানের বিরুদ্ধে উদাত্ত আহ্বান থাকা সত্ত্বেও মদ্যপান চলিতেছে, কিন্তু কালের রাখালের বাঁশী সমানেই বাজিতেছে; যদি একজনেরও 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে, এই প্রত্যাশায়! এই প্রত্যাশার কবি গোবিন্দদাস বাংলা কাব্য-সাহিত্যে আজও স্বভাবকবি, জাতীয় কবি ও স্বদেশ-প্রেমের স্বদেশী কবি।

কবি গোবিন্দদাসের বহু কবিতা তৎকালীন "বীণা", "নবজীবন", "কৌমুদী", "ভারতমিহির", "বান্ধব", "প্রকৃতি", "জন্মভূমি" প্রভৃতি মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় শোভা পাইত। ইহা ছাড়াও, আধুনিক

---

১৮৪. বিসর্জন—"বিসর্জন" রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্য। ইহার রচনা-স্থান সাজাদপুরে। ইহা প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইংরেজী ১৮৯১ খ্রীঃ)। এই নাটকের রচনায় রবীন্দ্রনাথ তিনটি উপাদান ব্যবহার করিয়াছেন—ইতিহাস, স্বপ্ন ও কল্পনা। কবি নিজেরই পূর্ব-প্রকাশিত উপন্যাস "রাজর্ষি"-র অংশ অবলম্বন করিয়া এই নাটকটি রচনা করেন। "এই নাটকে বরাবর এই দুটি ভাবের মধ্যে বিরোধ বেধেছে—প্রেম আর প্রতাপ। রঘুপতির প্রভুত্বের ইচ্ছার সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের প্রেমের শক্তির দ্বন্দ্ব বেধেছিল। রাজা প্রেমকে জয়ী করতে চান, রাজপুরোহিত নিজের প্রভুত্বকে। নাটকের শেষে রঘুপতিকে হার মানতে হয়েছিল। তার চৈতন্য হল, বোঝবার বাধা দূর হল, প্রেম জয়যুক্ত হল।"

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"বিসর্জন—এই নাটকের নামকরণ কোন্ ভাবকে অবলম্বন ক'রে হয়েছে; আমরা দেখতে পাই যে, নাটকের শেষে রঘুপতি প্রতিমা বিসর্জন দিলেন, এই বাইরের ঘটনা ঘটল। কিন্তু এই নাটকে এর চেয়েও মহত্তর আর এক বিসর্জন হয়েছে। জয়সিংহ তার প্রাণ বিসর্জন দিয়ে রঘুপতির মনে চেতনার সঞ্চার ক'রে দিয়েছিল।"

বহু সাময়িক পত্রিকা, যথা—"আর্য কায়স্থ প্রতিভা", "সৌরভ", "প্রতিভা", "নারায়ণ", নব পর্যায়ে "বঙ্গদর্শন", "মানসী", "ঢাকা রিভিও সম্মিলন" প্রভৃতিতেও তাঁহার লেখা শোভা পাইত। কিন্তু গোবিন্দদাস নিয়মিত লেখক ছিলেন "নব্যভারতে"। ১২৯০ সাল হইতে ১৩২৫ সাল পর্যন্ত (মৃত্যু বৎসর পর্যন্ত) তিনি অবিশ্রান্তভাবে "নব্যভারতে" লিখিয়া গিয়াছেন।

১৩২৫ সালে আশ্বিন সংখ্যায় কবি গোবিন্দদাসের শেষ কবিতা "অসুর পূজা" প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় একদিকে যেমন আছে স্বদেশপ্রেমের কথা, জাতির শৌর্য-বীর্যের কথা, তেমনি আছে অত্যাচারীর কথা, অসাম্য, ভণ্ডামি ও ব্যভিচারীর কথা। যথা—

"ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্বিজয়!
শৌর্য তোমার, বীর্য তোমার, অনন্ত অক্ষয়!
ধন্য তোমার স্বদেশ-প্রীতি
ধন্য তোমার অসুর-নীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য-স্মৃতি বিনাশ করে ভয়।
তোমার ভীষণ রুদ্রমূর্তি
স্বাধীনতার অগ্নি স্ফূর্তি,
মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয়?
তোমার আঁখির সতেজ ভাষা,
বিশ্বজয়ের বিপুল আশা
এক নিমেষে করে যে সে জগৎ জ্যোতির্ময়।
তোমার প্রবল স্বদেশ-ভক্তি
ঠেলে উঠ্‌ছে সকল শক্তি
ধবলগিরির চেয়ে সে যে প্রবল অতিশয়।

রক্ষিতে স্বজাতির স্বত্ব,
দেখি নাই আর এমন মত্ত,
বীরত্বের মহত্ত্বের আর ত এমন অভ্যুদয় !
গুলির মত পণ-প্রতিজ্ঞা ধূলির মত নয় !"

—কবির নিকট 'পণ' ছিল জীবন, আর 'প্রতিজ্ঞা' ছিল অন্যায়ের প্রতিবাদ করা। কারণ 'মরণ-কাঁপা দিগ্বিজয় কি চরণ-চাপা রয় ?' তাই 'বীরত্বের মহত্ত্বের' এমন অভ্যুদয় বড় একটা দেখা যায় না।

ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত "সৌরভ"-এ কবি গোবিন্দদাস প্রায়ই কবিতা লিখিতেন। পত্রিকা সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই ঘনিষ্ঠতা পরে কৃতজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়। ফলে, "সৌরভে"র জন্য কবির শেষ কবিতা— "ঋণ"। যথা—

"সাগরের বারিকণা রবি করে ধার,
সে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভার !
দিনে দিনে পলে পলে ধীরে জমিয়া সে,
ভীষণ মেঘের রূপে তাহারেই গ্রাসে !
উগারে সে অবশেষে অশনি অনল,
কাঁপে সে ঋণের ডাকে সারা ধরাতল !
দয়া করি দেবরাজ ধারা বরষণে,
উদ্ধার করেন ঋণে বিপন্ন তপনে।
রবির নিকটে শশি আলো করি ঋণ,
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু কলঙ্কে মলিন !
তবে যে মরিয়া বাঁচে, ঘটে উপচয়,
সুধার আকর বলি, সুধায় সে নয় !

শরণ দিয়েছে মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি
তাই আছে মৃত্যু সাথে ক'রে টানাটানি !
দেবতা এমনি যদি ঋণে ম্রিয়মান,
মানুষ কেমনে তবে ঋণে পায় ত্রাণ ?"

দারিদ্রের জ্বালায় ও ঋণের দায়ে কবি সব সময় বিব্রত, জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বলিতে তিনি কোনদিন কিছু পান নাই। বোধ হয় ১৩২৫ সালে কবি গোবিন্দদাস ঋণে খুব জর্জরিত হওয়ায় তখনকার মনের অবস্থার প্রতিফলন এই কবিতাটিতে পড়িয়াছে।

কবি গোবিন্দদাস-বিরচিত প্রত্যেক কাব্যগ্রন্থের শিরোনামের নিম্নে হিতোপদেশের একটি প্রবচন উদ্ধৃত আছে—

"কিম্যপস্তি স্বভাবেন স্বভাবং ব্যপ্যসুন্দরং
যদেব রোচতে যস্মৈ ভবৈত্তস্য সুন্দরং ।।"

এই প্রসঙ্গে কবি বলেন "তাঁহার কাব্যে সুন্দর কিছুই নাই, যদি পাঠ করিয়া কাহারও আনন্দ হয় তবেই তাহা সুন্দর, এই জন্যই শ্লোকটি যোজনা করিয়াছেন।" কবি এই শ্লোকের একটি সুন্দর অনুবাদও করিয়াছেন—

"স্বভাবতঃ কিবা আছে কুৎসিত সুন্দর
যাতে যার রুচি তার সেই মনোহর।"

স্বভাবতঃই কবির কবিতা সুন্দর ও মনোহর। ভাষার সৌষ্ঠবে, ভাব-গভীরতায়, ছন্দ-মাধুর্যে ও অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে তাঁহার কবিতা মনোহর। তাঁহার কবিতায় 'art' নাই—ইহা ঠিক নয়। তিনি ভঙ্গী দিয়া চোখ ভোলান নাই, নকল ও শৌখিন মজদুরি লইয়া 'বেসাতি' করেন নাই, তাই কি 'art' নাই ? তাঁহার কবিতায় 'art' জীবনধর্মী, প্রেম গতিধর্মী ; তাই বাংলা গীতিকাব্যের আসরে

গোবিন্দদাস মনোহর। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সাহিত্যক্ষেত্রে অতুল কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা করে—

"The poet in a golden clime was born,
With golden stars above ;
Dower'd with the hate of hate,
the scorn of scorn,
The love of love."

।। জীবন-সায়াহ্নে ।।

"উঠেছে আদেশ
বন্দরের কাল হ'লো শেষ
যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল" ।[১৮৫]

জীবন-সায়াহ্নেও কবি একক পথের যাত্রী। সারা জীবন সংগ্রাম করিয়াও শেষ জীবনেও কবি একটু সুখের মুখ দেখিতে পান নাই। তাঁহার জীবনটা যেন একটানা দুঃখের পাঁচালী। দুঃখেই তাঁহার জীবন গড়া এবং দুঃখেই তাঁহার জীবন শেষ। ১৩০৮ হইতে ১৩১৮ সাল—কবির দুঃখময় জীবনের এক কাল-পরিক্রমা। ভাওয়াল রাজ-পরিবার হইতে ১৩০৮ সালে ১৪ই অগ্রহায়ণ কালীপ্রসন্ন ঘোষের অপসারণে কবি গোবিন্দদাসের ভাওয়ালে প্রত্যাবর্তন—একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই অধ্যায়ে কবি তাঁহার রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত সামান্য পৈতৃক সম্পত্তি ফিরিয়া পান। ১৩০৯ সালে রাজসরকারের অধীনে চাকরিও ফিরিয়া পান। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কবির অর্থাভাব দূর হয় নাই। কারণ প্রজা-পীড়নের চাকরি কবির ভাল না লাগায় তাহা তিনি ছাড়িয়া দেন। ফলে অর্থসংকট দিন দিনই বৃদ্ধি পায়। ১৩১৮ সালে কবি দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইলেন। ভাওয়াল হইতে যে ২৪ টাকা বৃত্তি আসিত, তাহাও হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল।[১৮৬] অনাহারে অনিদ্রায় ও নানা চিন্তায় কবির

---

১৮৫. বলাকা—৩৭ সংখ্যক কবিতা।

১৮৬. কবি গোবিন্দদাস ১৩১৮ সালে ৭ই ফাল্গুন লিখিয়াছিলেন—"জয়দেবপুরের বড় ও মেজোকুমার মারা যাওয়ায় তাঁহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। ছোটকুমারের নিজ খরচই কুলায় না। মাসিক ১১০০ টাকা তিনি পান।

স্বাস্থ্যও ভাঙ্গিয়া পড়িল। যে 'সাহায্য-কমিটি' গঠন করা হইয়াছিল, তাহারাও আশানুরূপ সাহায্য করিতে পারিল না। এই সময়কার কবির মনের অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি পাঠ করিলে সহজেই বোঝা যায় ঃ—

"আমাকে এক জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন—৩।৪ বছরের মধ্যে আমি মরিব। বাস্তবিক আমার শরীরও আজকাল নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। সামান্য একটু মাথা ধরিলেও আমি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়ি, যেন উঠিতে পারি না। আগে এমন অসুখ গ্রাহ্যই করিতাম না। আর সর্বদাই আমার অসুখ লাগিয়া আছে। একদিনও সুখ ভাগ্যে ঘটে নাই। শরীর নিতান্ত দুর্বল হইয়াছে, উঠিতে বসিতে যেন হাত পা ভাঙ্গিয়া পড়ে। পুষ্টিকর আহার অভাবে আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছি। জয়দেবপুরের কুমারেরা যে মাসিক ২৪ টাকা আমাকে সাহায্য করিতেন, তাহা বন্ধ হইয়াছে। একমাত্র রাজা জগৎকিশোরের সাহায্যে প্রাণে বাঁচিয়া আছি। দুধের সের চার-পাঁচ আনা, মাছ দুষ্প্রাপ্য। ভাত খাইয়া বাঁচিতে পারি না। দুধ মাছ কি করিয়া খাইব? একদিন একটি কবিতা লিখিলে পাঁচদিন মাথা ঘোরে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই আমার এ দুর্দশা হইয়াছে। যা' হউক একদিন মরিতে হইবেই, তাহার জন্য চিন্তা কি? (২৮শে ভাদ্র, ১৩১৮)"।[১৮৭]

রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্র প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"গরুর বাছুর গরুর বাঁটের কাছে গেলে যেমন দুধ আপনিই যুগিয়ে আসে, তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস বিশেষ বিশেষ উত্তেজনায় প্রকাশ পায়। তাই চার

তাহা তাঁহার প্রাইভেট খরচেই ব্যয় হয়, এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।"

১৮৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ গোবিন্দচন্দ্র দাস (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ৭৪), পৃঃ ৩৭।

পৃষ্ঠা চিঠি মনের যে ভাব প্রকাশ করে, কথা কিংবা প্রবন্ধে তাহা পারা যায় না"। গোবিন্দদাসের উপরি-উক্ত চিঠিখানি পড়িলে এই কথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। চিঠির এক স্থানে কবি লিখিয়াছেন—'একদিন একটা কবিতা লিখিলে পাঁচ দিন মাথা ঘোরে'—ইহার পর আর কি কিছু বলিবার আছে? অর্থাৎ শরীর সুস্থ থাকিলে কবি প্রায় প্রতি দিনই যে কবিতা লিখিতে পারিতেন এবং বাংলা কাব্য-সাহিত্যের সেবা করিতে পারিতেন, তাহা সহজেই বোঝা যায়। আবার যা হউক 'একদিন মরিতে হইবে, তাহার জন্য চিন্তা কি?' কবির ভাবটা এমনই যেন চিন্তার কোন কারণ নাই, তিনি যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের আচার-ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুতে কেহই তেমন চিন্তা করিবে না, চোখের জল ফেলিবে না; দেশ বা দেশবাসীর মনে বিশেষ কিছু রেখাপাত করিবে না। সত্যই তিনি যেন একজন অবহেলিত কবি—নীরবে কাহারও কোন চিন্তার উদ্রেক না করিয়া বা কাহারও সুখনিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া এই পৃথিবী হইতে, প্রিয় জন্মভূমি হইতে চলিয়া যাইতে হইবে। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে'—ইহা কবি ভালভাবেই জানেন। কিন্তু অকালে আয়ুসূর্য অস্তমিত হইলে অর্থাৎ পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যের অভাবে জীবনদীপ নির্বাপিত হইলে, তাহা কি কম বেদনা-দায়ক! এই অনশনক্লিষ্ট কবি মৃত্যুর জন্য মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন, দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দিয়া কর্তব্যকর্ম কিছু থাকিলে তাহা পালন করিবার একটা শেষ সুযোগ দিবার জন্য ১৩১৮ সালে 'নব্যভারত' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

"দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়
মাঝের রবি ডুবছে সাঁঝে, দিনটা গেল বৃথা কাজে,
এক পা কেবল পারে আছে, এক পা দিছি নায়।

আজ কর্‌ব না কর্‌ব কালি, এই ভাবে দিন গেল খালি,
কেমন ক'রে হিসাব দিব নিকাশ যদি চায়,
দিন ফুরায়ে যায় রে আমার, দিন ফুরায়ে যায়।"

এই সময় কবি গভীর মর্মবেদনায় দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়া লিখিলেন—

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোস করি,
না খেয়ে শুকায়ে মরি,
হাহাকারে দিবানিশি
ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্‌।
সে দিকেতে নাইক দৃষ্টি,
কেবল তোমাদের কথা মিষ্টি,
নির্জলা এ স্নেহ বৃষ্টি
শিল পড়িছে পট্‌পট্‌।
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ।"[১৮৮]

—কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে কবির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু সাহায্য আসিয়াছিল। কিন্তু কবির নিকট—

"এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।[১৮৯]

১৮৮. গোবিন্দচন্দ্র দাস: 'আমায় চিতায় দিবে মঠ'। 'নব্যভারত', শ্রাবণ, ১৩১৮, পৃঃ—২১৮।

১৮৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'প্রতিনিধি' ("কথা"—১৯০০)।

তাই কবির আর্থিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি ঘটে নাই। এদিকে অনশন-অর্ধাশনে কবির জীবনীশক্তি কমিয়া আসিতেছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিবার শক্তিও যেন কবি হারাইতেছেন। আশাহীন উৎসাহহীন কবির কণ্ঠে শোনা যায় বিদায়ের রাগিনী :

"আর্ত্তনাদ হাহাকার চিরস্থায়ী যে আমার,
দুঃখ শোক—তুই বন্ধু মোর।
যাবার সময় এল স্তব্ধ হবে কোলাহল,
এখন থামুক কাঁদা তোর।"

'যাবার সময় এলো'—কথাটি কি করুণ ও মর্মান্তিক! আরও মর্মান্তিক ঘটনা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা কবির জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ১৩১৮ সালেই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ ৫১ জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির স্বাক্ষরে একখানি আবেদন-পত্র ভাওয়ালের বিধবা রাণীর নিকট প্রেরিত হয়। আবেদন-পত্রে কবি গোবিন্দদাসকে সাহায্য করিবার জন্য এইরূপ অনুরোধ ছিল :—

"......আমরা আপনাকে এখন এই অনুরোধ করি যে, যে কবি আপনার স্বামী-দেবতার সহিত,—শ্বশুরকুলের সহিত চিরজীবন জড়িত, সেই দরিদ্র কবিকে আপনি ঢাকা নগরীতে একটি বাসগৃহ প্রদান করিয়া তাঁহাকে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। তিনি বিক্রমপুরে এখন যে গ্রামে বাস করিতেছেন, তাহা আচিরে পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছে। ভাওয়ালেও এখন বাস করা তাঁহার পক্ষে কঠিন; সমস্ত কারণ আপনি সবিশেষ অবগত আছেন। পাঁচ কি ছয় হাজার টাকা হইলেই, তাঁহার উপযুক্ত বাসগৃহ হইতে পারে। আপনার পক্ষে ইহা ইহজীবনের সংস্থান। আপনি অবগত আছেন যে, আপনার স্বর্গগত স্বামীদেবতা গোবিন্দবাবুকে একখানি বাটী নির্মাণ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। আশা করি, এই নিরাশ্রয়, বঙ্গসাহিত্যের কীর্তিমান কবিকে আপনি একটি বাসোপযোগী গৃহ

প্রদান করিয়া রাজবংশের পূর্বগৌরব ও বদান্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। গোবিন্দবাবু সেই গৃহ আপনার নামে অথবা আপনার স্বর্গীয় স্বামীর নামে নামকরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত আমরণ এই দান স্মরণ রাখিবেন, এবং সমগ্র দেশবাসীর হৃদয়ে ও ভবিষ্যৎ বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার এই কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল থাকিবে।”

বলা বাহুল্য, দেশবাসীর ও কবির অনুরাগী বন্ধু-বান্ধবদের এই আবেদন ‘নিষ্ফল মাথা কুটে’। রাণী ধন্যবাদ সহকারে এই আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

১৩১৮ সালের ১লা চৈত্র কবি গোবিন্দদাসের অন্ন-সংস্থানের প্রচেষ্টায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উদ্যোগে কবিকে সাহায্য করিবার জন্য একটি শক্তিশালী সাহায্য-সমিতি গঠিত হয়। এই সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে ভাওয়ালের বড় রাণী সরযূবালা ১৩১৯ সালের বৈশাখ হইতে কবিকে পূর্ববৎ মাসিক ৮ টাকা নিয়মিত-ভাবে সাহায্য করিতে থাকেন। মেজরাণী কৃপাবশতঃ এককালীন ১০ টাকা মাত্র সাহায্য তহবিলে দান করিয়াছিলেন।

জীবন-শেষের শেষ খেয়ায় কবি গোবিন্দদাসের দুর্ভাগ্য চরমে পৌঁছাইয়াছিল। এই সময়ে আবার অর্শরোগের প্রবল আক্রমণে কবির জীবনীশক্তি অনেকটা কমিয়া গেল। অর্থাভাবে পথ্যের যেখানে কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে চিকিৎসার তো কোন কথাই নাই। ১৩২৯ সালের ২৫শে শ্রাবণ কবি লিখিতেছেন—

“বলিতে কি, এবারের ব্যারামে আমার শরীর এত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, আমি আর বেশীদিন বাঁচিবার আশা কিছুতেই করিতে পারিতেছি না। জ্যোতির্বিদের কথা সত্য বলিয়াই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে।……এই জন্য অসহায় নাবালক ছেলেদের কথা ভাবিয়া বড় ব্যাকুল হইয়া পড়ি, আর বড় কষ্ট হয়। পদ্মা ঘনাইয়া আসিতেছে,

এই সময় অন্যত্র একটা বাড়ীর যোগাড় করিতে পারিলে অনেকটা দুর্ভাবনা দূর হইত। ঢাকায় একটা বাড়ীর জন্য অনেকের খোসামোদ করিতেছি, অনেক চেষ্টা করিতেছি, কিছুতেই সুবিধা হইয়া উঠে না। কেবল পদ্মা বলিয়া নহে, আমার মত অসহায় অবস্থায় শত্রুপূর্ণ বামনগাঁয় বাস করা স্বতঃই বিপদ্‌জনক। মরিলেও কেহ জিজ্ঞাসা করে না, শৈবার মত মা-মরা সন্তান কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলেও ডোমের অধম ডোমগুলি ফিরিয়া চাহে না—বরং বিপন্ন দেখিয়া তামাশা দেখে, সেখানে আর এক মুহূর্তও বাস করিতে ইচ্ছা নাই।"

—যেখানে প্রতি মুহূর্তে বাঁচিবার ইচ্ছা, সেখানে 'এক মুহূর্ত' বাঁচিবার বা 'বাস' করিবার ইচ্ছা নাই—কি ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাবহ উক্তি! সমাজ ও সমাজ-চরিত্র সম্বন্ধে কি স্বচ্ছ বিশ্লেষণ—'বরং বিপন্ন দেখিয়া তামাসা দেখে'। তাই জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী কবি লিখিয়াছেন— 'আমি আর বেশী দিন বাঁচিবার আশা কিছুতেই করিতে পারিতেছি না।' সত্যই কবি আর বেশীদিন বাঁচেন নাই, 'পূরবীর শেষ রাগিনীর বীণ' বাজিয়া উঠিয়াছে?

১৩২২ সালের কথা। কবি গোবিন্দদাস তখন বৈষয়িক কার্যে ঢাকা, জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। "জয়দেবপুরে অবস্থানকালে অকস্মাৎ তাঁহার উরুতে একটি কার্বাঙ্কল বা বিস্ফোটক দেখা দেয়। একে অর্থাভাব, তাহাতে পরিবার-পরিজন নিকটে নাই যে, শুশ্রূষা করিবে। তিনি বন্ধুগণের পরামর্শে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার অবস্থা তখন সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে"।[১৯০] কবির এই অসুস্থতার কথা সংবাদপত্রে ও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, "কবিবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস ঢাকা মিটফোর্ড হসেপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

১৯০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: গোবিন্দচন্দ্র দাস (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ৭৪), পৃঃ ৪০।

তাঁহার বাম উরুতে একটি দুরারোগ্য বিস্ফোটক হইয়াছিল"।[১৯১] ১৩২২ সালে ২৫শে শ্রাবণ তারিখে "বাঙ্গালী" পত্রিকা কবির অসুস্থতার সংবাদ প্রকাশ করিয়া দেশবাসীর নিকট সাহায্য করিবার আবেদন জানাইয়াছেন—"গোবিন্দদাস বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। কিন্তু তিনি নিঃস্ব, চিরদিন দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রামে কাতর। আজ তাঁহার দেশবাসী তাঁহার দিকে লক্ষ্য করুন, তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করুন। হাসপাতালে যাহাতে তাঁহার সুব্যবস্থা হয়, তাহার উপায় নির্ধারিত করুন। নতুবা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে"।[১৯২] সংবাদপত্রে কবির এই সংবাদ জানিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন ; কিন্তু ঢাকার বুদ্ধিজীবী ও লেখক সমাজের মধ্যে তেমন কোন তৎপরতা দেখা যায় নাই। চিত্তরঞ্জন দাশ তখন ভাগলপুরে, তিনি অবিলম্বে তৎকালীন ঢাকার ব্যারিস্টার প্রাণকিশোর বসুর নিকট এই মর্মে তার করেন :—

"Kindly see to treatment of poet Govinda Dass. Am responsible for expenses. Write to me here.—C. R. Dass. 17 Aug, 1915." দেশবন্ধু চিরকালই দেশের বন্ধু। তাই দূরে থাকিয়াও তিনি কবির চিকিৎসার যে ব্যবস্থা করিলেন, নিকটের বন্ধুরা, তাহা করা ত দূরের কথা, দুই একজন ছাড়া আর কেউ অসুস্থ কবিকে দেখিতে হাসপাতালে যান নাই। তাঁহাদের আচরণে রুষ্ট হইয়া কবি-বন্ধু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য পরবর্তী কালে এক পত্রে লিখিয়াছেন—"কয়েক বৎসর আগে কবি গোবিন্দচন্দ্র দুষ্টব্রণে পীড়িত হইয়া ঢাকা হস্পিটালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে পূর্ববঙ্গের সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কামিনীকুমার সেন মহাশয়

১৯১. সাহিত্য-সংবাদ, 'সৌরভ', আশ্বিন, ১৩২২ ; পৃঃ ৩৯০।

১৯২. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী : স্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ১৯১-৯২।

সর্বদা তাঁহার সংবাদ লইতেন। আর ময়মনসিংহের বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া কবিকে দেখিয়া আসিতেন। ঢাকার আর সাহিত্যিকগণের মধ্যে কাহাকেও ত একদিন সেখানে দেখি নাই। মিঃ পি. কে. বসু এক কি দুই দিন গিয়াছিলেন। অনেককে আমি নিজেও অনুরোধ করিয়াছি, কেহ সেদিকের ছায়াও মাড়ান নাই।"[১৯৩] যাহাই হোক, সুচিকিৎসার ফলে কবি গোবিন্দ-দাস এই যাত্রায় মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মাসাধিক কাল হাসপাতালে থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন। একটু সুস্থ হইয়া কবি বাড়ীতেও ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অভাবী রাক্ষসী তাহার পাঠশালায় দেনা-পাওনার ধারাপাতখানি খুলিয়া বসিলেন। নিত্যনূতন অভাব-অনটনের ধাক্কা, মহাজনের তাগাদা, দোকানীর রূঢ় কথা এবং ক্ষুধাতুর স্ত্রীপুত্রের করুণ মুখচ্ছবি দেখিয়া অনশনক্লিষ্ট কবি কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—

"কেন বাঁচালে আমায় ?

চাল ডাল তেল নুন, আবার ভাবিয়া খুন,

জ্বালালে আগুন ফিরে হৃদি কলিজায়,

ক্ষুধিত সন্তান বুকে, গৃহিণী বিষণ্ণ মুখে,

সম্মুখে আসিয়া সে যে আবার দাঁড়ায়!

মুখে নাহি ফোটে ভাষা, মূর্তিমতী ক্ষুৎপিপাসা,

গরাসে গরাসে পেলে গ্রহতারা খায়,

ভয়ে ভীত চিত্ত মম, অচেতন শব সম,

আতঙ্কে তরাসে তার চরণে লুটায়।"[১৯৪]

---

১৯৩. বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী: কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস। 'নব্যভারত', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ৩৩৯।

১৯৪. গোবিন্দচন্দ্র দাস: 'কেন বাঁচালে আমায়', 'সৌরভ', কার্তিক, ১৩২২, পৃঃ-২৬।

ক্ষুধার রাজ্যে 'অন্নচিন্তা চমৎকার', সেখানে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার যেন কোন মূল্য নাই। সেখানে 'ক্ষুধিত সন্তান বুকে' রাখিয়াও কবি-পত্নী শরীর হইতে সামান্য স্বর্ণালঙ্কার খুলিয়া দেন এবং পত্নীর খালি হাত দেখিয়া কবির মনে হইয়াছে—"মরণে বাঁচনে একই, দুয়েতেই খালি হাত—নাহিক উপায়।" কিন্তু বাংলার সারস্বত সমাজ নির্বিকার ও নিরুত্তাপ। তাঁহাদের উপেক্ষার ফলে কবির শেষ দিন আসন্ন হইয়া উঠিল। অথচ এই সময়ে নানা সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা ও সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালা ভাষার বিজয়-নিশান উড়াইয়া দিতেছেন, নানা মনীষী ব্যক্তিগণ এখন বাঙ্গালা ভাষার পঠন-পাঠন করিতেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার পরিপোষণ করিতেছেন, নানা সংবাদপত্র ও বহু বহু সুন্দর সুন্দর মাসিক পত্রিকা বাঙ্গালা ভাষার গৌরব ঘোষণা করিতেছেন।[১৯৫]

ভাওয়াল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ঢাকা নগরীর সন্নিহিত "কুর্মীতলা" নামক স্থানে কবি কিঞ্চিৎ ভূমি সুলভে 'পত্তনী' লইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, নির্বাসিত হইবার পর তাঁহার পৈত্রিক ভূসম্পত্তি—যাহা রাজ্য-সরকার কর্তৃক 'বাজেয়াপ্ত' হইয়াছিল, তাহাও তিনি ফেরৎ পাইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে নিয়মিত খাজনা দিতে না পারায় ১৩২৫ সালে রাজসরকার হইতে কবির নামে বাকী খাজনার দায়ে 'নালিশ' করা হয় এবং খাজনা অনাদায়ে ১৯১৮ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রিত হইবে—এই মর্মে কবিকে জানানো হইলে কবি দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। কারণ "এই সম্পত্তি হাতছাড়া হইলে তাঁহার অবর্তমানে পরিবারবর্গ যে কিরূপ বিপদাপন্ন হইবে, তাহা ভাবিয়া যে-কোন প্রকারেই হউক তিনি এই সম্পত্তি রক্ষা করিতে

---

১৯৫. সম্পাদক: 'পরিসমাপ্তির অবস্থায় কি ভাবলাম'। 'সৌরভ', বৈশাখ, ১৩২৪; পৃঃ ৫।

বদ্ধপরিকর হইলেন। 'ভগবান্ রক্ষা করেন কিনা দেখিব'—এই সঙ্কল্প লইয়া তিনি রোগজীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহেই ঢাকা যাত্রা করিলেন।"[১৯৬] এই যাত্রাই কবির শেষ যাত্রা এবং সম্ভবতঃ কবিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই যাত্রার কয়েকদিন পূর্বেই তিনি পত্নীকে বিষয়-সম্পত্তি ও দেনা-পাওনার হিসাব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে পত্নীকে জানাইয়াছিলেন।

ঢাকায় আসিয়া কবি কয়েকদিন অবস্থান করিলেন। তাহার পর বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার জন্য অর্থসংগ্রহ-মানসে কবি জয়দেবপুর, গৌরীপুর, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা প্রভৃতি স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "গৌরীপুরে আসিয়া গোবিন্দচন্দ্র কবিবর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে পাঁচ ছয় দিন অবস্থান করেন। তাঁহাকে সর্ব প্রথম তথায় দেখিতে পাইয়া স্থানীয় জনসাধারণ আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন। প্রত্যহ রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত কবি যতীন্দ্রের গৃহে দাস-কবিকে লইয়া সাহিত্যিক 'বৈঠক' বসিত। কবি গোবিন্দচন্দ্রের সংস্পর্শে যতীন্দ্রপ্রসাদের গৃহে আনন্দ প্রস্রবণ বহিয়া গিয়াছিল।"[১৯৭] যাই হোক, যতীন্দ্রপ্রসাদের চেষ্টায় স্থানীয় জমিদারদের নিকট হইতে কবি কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তারপর কবি ৩২শে শ্রাবণ মুক্তাগাছায় গমন করেন। কিন্তু সেখানেও আশানুরূপ অর্থ না পাওয়ায় কবি তীব্র অর্থসঙ্কটে পড়িলেন এবং খাজনা পরিশোধ হইবে না ভাবিয়া মানসিক দুশ্চিন্তা ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়কার জীবন-যন্ত্রণায় বিপর্যস্ত কবি-জীবনের একটি করুণ ও মর্মান্তিক ছবি পাওয়া যায় পূর্ণচন্দ্র

---

১৯৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গোবিন্দচন্দ্র দাস (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ৭৪), পৃঃ ৪১।

১৯৭. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী : 'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ ২২৬।

ভট্টাচার্যের চিঠিতে :—"কবি যে কত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, কবির ভাগ্যে যে কত দুঃখ ভগবানের কল্পনায় স্থান পাইয়াছে, কবিবর গোবিন্দবাবুকে দেখিয়া তাহা অনুভব করিতেছি। আজ রাত্রি ৮টার সময় বাসায় আসিবার পথে কবির সহিত একত্রেই আসিতেছিলাম। পাটুয়াটুলী হিরণ-কুটীরে একখানি ক্ষুদ্র প্লেটে তিনি নুন-জল দিয়া চিঁড়া খাইতেছিলেন। পথে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'কি খাইব পূর্ণবাবু? আজ ঠিক ৩০ দিনের মধ্যে মাত্র ৮বার ভাত খাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে! অর্থাভাবে হোটেলে নিত্য খাইতে পারি না। তাই তিন বেলা তিন পয়সার চিঁড়া খাইয়া প্রাণ রক্ষা করি!' ভাই! গোবিন্দবাবুর যে কি দুঃখ, তাহা কাহাকে বলিব? গত মাঘ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় ছেলে বরুণকে লইয়া কত জনের দ্বারস্থ হইয়াছেন, শুধু চারিটি ভাতের জন্য। বরুণ এখানে স্কুলে পড়ে। ঢাকায় এমন কেহ নাই যে, কবির ছেলেটিকে ভাত দেয়। এত যে দুঃখ—তবু তাঁর মুখে হাসি, কথায় মধু!"[১৯৮]

কবি গোবিন্দদাস ঢাকার উপকণ্ঠে চন্দ্রকান্ত ঘোষের বাড়ীর একাংশে বাস করিতেন। চন্দ্রকান্ত ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে কবি এই আশ্রয় পাইয়াছিলেন। চন্দ্রকান্ত ঘোষ কবির স্বগ্রামবাসী। কিন্তু কবির আশ্রয় মিলিলেও আহারের ব্যবস্থা ছিল নিকটবর্তী একটি 'হোটেলে'। অথচ অর্থাভাবে কবির প্রায় দিনই অর্ধাহারে বা অনাহারে কাটিত। সত্যই "শেষ জীবনে অসহায়, রোগগ্রস্ত ছিন্নকণ্ঠ কবিকে ভিক্ষার মতো হীনবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।"[১৯৯]

---

১৯৮. বঙ্কিমচন্দ্র শাস্ত্রী : 'কবিবর গোবিন্দচন্দ্র দাস'। 'নব্যভারত', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ৩৪০।

১৯৯. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত", পৃঃ ৫২৯।

১৩২৫ সালের আশ্বিন মাস—কবির জীবনদেবতা যেন হিসাবের খাতা অসমাপ্ত রাখিয়াই আগমনীর মধ্যেই বিজয়ার করুণ রাগিণী বাজাইলেন। ফলে, মহাকালের করাল আহ্বানে কবিও 'অসমাপ্ত পরিচয় ও অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি' রাখিয়া পরপারে চলিলেন। মৃত্যুর মাত্র চারদিন পূর্বে (৯ই আশ্বিন, ১৩২৫ সাল) লিখিত শেষ চিঠিতে কবি শেষ জবানবন্দী দিলেন। চিঠিটির অংশবিশেষ পড়িলে সহজেই বোঝা যাইবে কবির অবস্থা কতখানি অসহনীয় ছিল—"আমার অবস্থার কথা কি লিখিব? আজিও বাড়ী যাইতে পারি নাই, কারণ ১লা অক্টোবর নিলামের তারিখ। ঐ তারিখের পরে ছাড়া আর যাইবার উপায় নাই। জগদীশ্বর রক্ষা করেন কিনা দেখিব। বড় ছেলেটা পূর্বেই পড়া ছাড়িয়াছে; বরুণকেও খরচের অভাবে ঢাকায় রাখিয়া পড়াইতে পারিতেছি না। গ্রামের স্কুলেও ভর্তি করে না। এই ত অবস্থা!

* * *

আমি হয়ত পূজার সময় বাড়ী যাইব। আজ ৬।৭ দিন যাবৎ জ্বর হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। আজও ভাত খাই নাই; এই অবস্থায় কাছারীতে ঘুরি।.........আমার শরীর এবার বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সর্বদা বিদেশে থাকিয়া অনিয়মিত ও অনুপযুক্ত আহারে স্বাস্থ্য একেবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর ডান কাঁধে বাত ধরিয়াছে।"[২০০]

উপরি-উক্ত পত্রখানি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, কবির দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। পত্রটির মধ্যে 'জগদীশ্বর রক্ষা করেন কিনা দেখিব' এবং 'আজও ভাত খাওয়া হয় নাই'—জীবন-অঙ্কের শেষ দৃশ্যের শেষ স্মৃতি! সত্যই ঋণ হইতে জগদীশ্বর তাঁহাকে রক্ষা

---

২০০. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী: 'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ ২২৯। পত্রখানি ১৩২৫ সালে ৯ই আশ্বিন ৪৭ নং সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা হইতে লেখা হইয়াছে। পত্রখানি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা।

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার আর ভাত খাওয়া হয় নাই। বিধিলিপির কি সুন্দর যোগ-বিয়োগ!

কবি যখন আত্মীয়-স্বজন-পরিজনহীন অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দিন ও সময় গুণিতেছিলেন, তখন ১৩২৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সহিত্য-সম্মেলনের হিসাব-নিকাশের জন্য ঢাকার বার লাইব্রেরিতে ১২ই আশ্বিন অভ্যর্থনা-সমিতির এক অধিবেশন হইল। সেই সভায় 'গোবিন্দচন্দ্র সাহায্য-ভাণ্ডার' নামে একটি স্থায়ী তহবিল গঠিত হয়, এবং কবিকে সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে ৭০০ টাকা সাহায্য-দানের ব্যবস্থা করা হয়। এই ৭০০ টাকা খাজনাই গোবিন্দচন্দ্রের বাকী পড়িয়াছিল। এই অর্থের জন্যই তিনি একান্তভাবে বিধাতার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন"।[২০১] এই ভাবে সত্যই জগদীশ্বর কবিকে রক্ষা করিলেন। মৃত্যুর আগের দিন ঐ টাকা গোবিন্দচন্দ্রকে দেওয়া হয় এবং বিষয়-সম্পত্তি শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাওয়ায় মৃত্যুপথযাত্রী কবি হৃদয়ে অপার আনন্দ অনুভব করিলেন। কিন্তু বাড়ী যাওয়া এবং ভাত খাওয়া আর হইল না। ঠিক ঐ দিন (১৩ই আশ্বিন, ১৩২৫) রাত্রি-অবসানে (রাত্রি ৫টা ১৫মিঃ) স্বভাবকবি গোবিন্দ-দাসের জীবনাবসান ঘটিল। স্বর্গে আগমন-বার্তা ঘোষিত হইল। মর্ত্যের স্বভাবকবি অমরাবতীর আহ্বানে সুসজ্জিত রথে স্বর্গারোহণ করিলেন। যে শক্তি কাহারও নিকট মাথা নত করে নাই, বিপদে অধীর হয় নাই; নিন্দা-আঘাতে বিচলিত হয় নাই, দুঃখে-শোকে-কষ্টে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই—বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী তাই তাঁহাকে যে জয়মাল্য পরাইয়া দিলেন; তাহা অমরাবতীর পারিজাত। মানুষ যেখানে নির্মম, নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ, নিথর এবং নির্বাক, প্রকৃতি সেখানে সবাক; স্নেহের দুলালের জন্য তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতেছেন।

---

২০১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়: গোবিন্দচন্দ্র দাস (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ৭৪), পৃঃ ৪৩।

সেদিন স্বর্গে যেখানে প্রস্তুতির ব্যস্ততা, মর্ত্যে সেখানে নীরব বিষণ্ণতা —"সূর্যদেব অস্তমিত হইলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি—গভীর অন্ধকারে সমস্ত জগৎ আবৃত হইল। ঢাকা নগরীর উপকণ্ঠে নারান্দিয়ার জন-কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। পূর্বকথিত বাড়ীর একটি কক্ষে মরণোন্মুখ কবি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইহাই কবির শেষ যুদ্ধ। গৃহকোণে একটি প্রদীপ তৈলাভাবে মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছিল। কবির জীবন-প্রদীপ তখন নির্বাণোন্মুখ। আর কবির শিয়রে ও পদপ্রান্তে তাঁহার দুইটি অসহায় পুত্র থাকিয়া থাকিয়া নিদ্রালস নয়নে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। বাহিরে ঘনান্ধকার—প্রকৃতি স্তম্ভিত—যেন কবির অন্তিম মুহূর্তে কালিমাময় মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। সেই ভীষণ রজনীতে, সেই অসহায় অবস্থায় মুমূর্ষু কবির পুত্র দুইটিকে সান্ত্বনা দান করিতে নিকটে কেহ উপস্থিত ছিল না।"[২০২]—মৃত্যুর সময় দুই পুত্র নিকটে থাকিলেও, প্রেমদা অর্থাৎ কবিপত্নী স্বামীর শেষ দেখা দেখিতে পাইলেন না। অবহেলিত কবি মৃত্যুর পরও অবহেলিত। তাই সাহায্যকারীর অভাবে মৃত্যুর পরদিন সূর্যোদয়ের পর স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের পার্থিব দেহ ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু খুবই বেদনাদায়ক এই যে, প্রয়াত কবির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্য কোন কবি-লেখক-সাহিত্যিক শ্মশানে যান নাই। শ্মশানে গিয়াছিলেন মাত্র সাত জন। এই সাতজনের মধ্যে আবার দুইজন কবির পুত্র, জনৈক আত্মীয়, দুইজন ঢাকা সেবাশ্রমের সেবক এবং অন্য দুইজন ভদ্রসন্তান। 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়—"বাণী-বরপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যু বড়ই শোচনীয়। অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা একপ্রকার হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তারপর আত্মীয়স্বজন অভাবে তাঁহার সেবা-

---

২০২. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী: 'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ—২৩২।

শুশ্রূষাও রীতিমত হয় নাই ; অধিকন্তু তাঁহার শবদেহ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবকগণ কর্তৃক শ্মশানে নীত ও ভস্মীভূত করা হইয়াছে”।[২০৩] কবির দেহত্যাগের পর ঢাকা নগরীতে যদিও শোকসভা হইয়াছিল এবং ১৩২৫ সালে সাহিত্য-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; তথাপি ঢাকার সাহিত্যিকবর্গ নিজেদের অক্ষমতা ও কলঙ্ক ঘুচাইতে পারিবেন না এবং লোকেও ভুলিতে পারিবে না যে, পূর্ববঙ্গের কবি পূর্ববঙ্গের ঢাকাতেই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদৃত হইয়াছিলেন। সত্যই অন্ত মূহূর্তে, অন্তিম তৃষ্ণায় তাঁহাকে আমরা একটুও জল দিতে পারি নাই”।[২০৪] তাই “কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর সমগ্র বঙ্গদেশে বিক্ষোভের স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল। বঙ্গদেশের অগণিত নরনারী নীরবে অশ্রুবারিতে তাঁহার তর্পণ করিয়াছিলেন”।[২০৫]

কবির জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে হইলেও বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তাঁহার স্থান ও মান হিসাবে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশের কবি। যদিও কবি গোবিন্দদাস ১৩১৮ সালের ১৯শে পৌষ লিখিয়াছিলেন, “পশ্চিম বাঙ্গালার লোকদের, আমাদের প্রতি একটা আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ আছে।” কথাটা অমূলক নহে, তথাপি এই কথা বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গেও কবির অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধু-বান্ধব আছেন, যাঁহারা কবিকে এখনও প্রাণ দিয়া ভালবাসেন এবং শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার ‘মগের মুলুক’ পূর্ববঙ্গের বিষয় হইলেও তাহা সমগ্র বঙ্গদেশের বিষয় —সর্বকালের সর্বযুগের অত্যাচারিত উৎপীড়িত ও নির্বাসিত মানুষদের জীবনবেদ। তাঁহার তিরোধানে “বঙ্গরত্ন” যথার্থই লিখিয়াছেন— “বাঙ্গালার খাঁটি বাঙ্গালী কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয় আর ইহ-জগতে নাই। * * * * ভাওয়ালের এই দুঃখ-দারিদ্র্যজর্জরিত

২০৩. দেশের কথা। ‘প্রবাসী’, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ১৭৩।

২০৪. সম্পাদক। ‘সৌরভ’, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ ; পৃঃ ৪১।

২০৫. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী : স্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ২৫৩।

কবি তাঁহার হৃদয়-শোণিত দিয়া যে অতুলনীয় কবিতাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা অমর স্থান অধিকার করিয়া রহিবে।"[২০৬] প্রয়াত কবিশেখর কালিদাস রায় লিখিয়াছিলেন—

"পরিষদের সভায়, রাজা মহারাজের তাজের ছটা
গ্রন্থশালায় রাজে হাজার ছবি ;
সম্মিলনে—সম্মেলনে মহোৎসবের প্রমোদ ঘটা
পায় না খেতে হায় রে কাঙ্গাল কবি।"

—'পায় না খেতে হায় রে কাঙ্গাল কবি'—'কাঙ্গাল কবি' কথাটির অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ। কবি যত ভালবাসার কাঙ্গাল ছিলেন, এত অর্থের কাঙ্গাল ছিলেন না। তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের ঢাক নিজে বাজাইয়া এবং আপোষ মনোভাব লইয়া শান্তিতে ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাইয়া দিতে পারিতেন ; কিন্তু কবির কুষ্ঠিতে তাহা ছিল না। তাই কবির তিরোধানে ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ[২০৭] যথার্থই লিখিয়াছিলেন—

---

২০৬. "কবি-প্রয়াণে 'ঢাকাপ্রকাশ', 'বঙ্গরত্ন', 'সৌরভ', 'নব্যভারত', 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' ইত্যাদি সাহিত্য-পত্রিকার কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সংবাদ-মন্তব্য-প্রবন্ধ প্রকাশ ক'রে মৃত কবির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেছেন। কিন্তু 'ভারতী', 'সবুজপত্র' ও 'সাহিত্য' পত্রিকার কর্মকর্তারা শোকপ্রকাশসূচক কোন সম্পাদকীয় মন্তব্য-কিংবা কোন নিবন্ধে তাঁর কাব্য-মূল্যায়ন করেননি"। 'উনিশ শতকের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দদাস'—কুমুদকুমার ভট্টাচার্য ; পৃঃ—৪৮।

২০৭. সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত :—জন্ম ১৮৮২ খ্রীঃ, ১২ই ফেব্রুয়ারী ; মৃত্যু ১৯২২ খ্রীঃ, ২৫শে জুন। নিবাস—চুপী, বর্ধমান ; পরে দর্জিপাড়া, কলিকাতা। খ্যাত-নামা অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র ; কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন ; সাহিত্য-সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল অপরিসীম ; 'আমরা' কবিতাটি তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮ বৎসর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। 'জন্মদুখী' (অনূদিত উপন্যাস) 'চীনের ধূপ'

"ফুল নীরবে যেমন ঝরে তেম্‌নি করে ম'রে গেল কবি,
চলে গেল মানস-যাত্রী প্রজাপতির নীরব পাখার ভরে ;
হাওয়া শুধু কর্‌লে হাহা ; আন্‌মনে হায়, সেই সমাচার লভি
দূরের বাঁশীর সুরের ধারা কেঁপে বারেক উঠল নিমেষ ভরে।

এই দুনিয়ার একটি কোণে কাঁটার বনে জন্মেছিল সে যে,
ফুটেছিল সেই কেয়াফুল সাপের ডোরায় কাঁটার মালা গলে
পাতায় চাপা গন্ধটুকুন্ পূবে হাওয়ায় বেরুল নীড় ত্যাজে,
পাথর চাপা রইল কপাল, বাদ্‌লা করে রইল চোখের জলে।

ধনজনের ধার্‌ত না ধার চিন্‌ত তারে অল্প ক'টি লোকে,
নয় দারোগা নয় খেতাবী—খাতির দাবী কর্‌বে সে কোন্ মুখে ;
মরমী কেউ বাস্‌ত ভালো, কল্পনা তায় দেখ্‌ত প্রীতির চোখে,
গান গেয়ে সে গেছে চলে ;—রেশ্ রয়েছে সারা দেশের বুকে।

বাদ্‌লা রাতির সাথী সে যে শরৎপ্রাতের আলোয় গেছে ঝ'রে,
মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা স'য়ে,
সরস্বতীর পায়ের ছায়ে যে পদ্মটি ফুট্‌ছে ত্রিকাল ধ'রে,
কবি জানে,—পরম সুখে সে আছে আজ তারি পরাগ হয়ে।"

(নিবন্ধ), 'রঙ্গমল্লী' (কবিতায় ও গদ্যে অনূদিত নাটকাবলী) ও 'ধূপের ধোঁয়ায়' নাটিকা ছাড়া তাঁহার রচিত বাকি পনেরোখানি গ্রন্থই কাব্য। সমসাময়িক ঘটনা ও মানুষের উপর তিনি অনেক কবিতা লিখিয়াছেন। বহু কবিতা এখনও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠাতেই আছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ছন্দে তাঁহারই অসাধারণ দক্ষতার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে "ছন্দ-ভারতী" বিশেষণে বিশেষিত করেন। ছন্দোজ্ঞানের বিশেষ প্রমাণ "ছন্দ সরস্বতী" ('ভারতী', বৈশাখ, ১৩২৫) প্রবন্ধেও পাওয়া যায়। তাঁহার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'কুহু' ও 'কেকা' প্রভৃতি। 'ডঙ্কানিশান' তাঁহার অসম্পূর্ণ রচনা।

—"মরেনি সে জুড়িয়ে গেছে, বঞ্চনা-লাঞ্ছনার ঝঞ্ঝা সয়ে"—কবি-জীবনেরই ভাষ্য। তাই বলা যায়—"বাঙ্গালীর খাঁটি কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস মরিয়াছেন,—না, না, মরিয়া বাঁচিয়াছেন। নানা কষ্ট সহ্য করিয়া অর্ধাশনে, অনশনে সুদীর্ঘকাল কাটাইয়া আমাদের চির দরিদ্র পল্লী-কবি গোবিন্দদাস মরিয়া গিয়াছেন, এখন তোমরা সভা কর, বক্তৃতা কর, তাঁহার 'চিতায় মঠ' দেও। সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা, শস্য-শ্যামলা, বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়া যে এত কষ্ট পাইয়া মরিয়াছে, সাবধান! তাঁহার জন্য কেইই শোক প্রকাশ করিও না, সে অধিকার আমাদের নাই।"[২০৮] কারণ বহু পূর্বেই 'সে অধিকার' আমবা হারাইয়াছি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সামন্ত প্রথার প্রতিভূ অত্যাচারী শাসক, সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য ১৩১৭ সালে ১২ই ভাদ্র (২৮শে আগস্ট, ১৯১০ খ্রীঃ) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে যে শোকসভা হয়; তাহাতে লোকে-লোকারণ্য; বক্তা ছিলেন বিহারীলাল সরকার, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু ও যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ প্রথম সারির সাহিত্যিকবর্গ। এই সভায় দুইটি কার্যকরী প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়:—

(ক) গভীর দুঃখ ও বেদনা প্রকাশপূর্বক শোক-প্রস্তাব; (খ) ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য 'সমুচিত ব্যবস্থা' অবলম্বনের জন্য সংকল্পসূচক প্রস্তাব।"[২০৯] অথচ সামন্ত-বিদ্রোহী রণক্লান্ত সৈনিক ও স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩২৫ সালে ২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খৃঃ) মামুলি ধরনের সভা আহ্বান করেন এবং নিতান্ত কর্তব্যের অনুরোধে অন্যান্য

---

২০৮. 'ভারতবর্ষ', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ সন; পৃঃ ৮৫৫।

২০৯. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী: সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭ সন, পৃঃ ২৯-৩৫।

প্রয়াত বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শোক প্রস্তাব করেন। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! 'কি বিচিত্র এই দেশ! সভায় বক্তা ছিলেন মাত্র দুইজন—নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এবং সভাপতি মহাশয়। কিন্তু কবির স্মৃতিরক্ষার জন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই'।[২১০]

কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কবি গোবিন্দদাসের উদ্দেশ্যে এক মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেন—

"গোবিন্দ! সুহৃদ্‌সম! হে শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম!
সব অবসান,—
নাহি দুঃখ দৈন্য আর, নাহি অশ্রু হাহাকার,
ব্যথা—অপমান!
সমাগত দেব-রথ, সিদ্ধ তব বাণীব্রত,
সিদ্ধ মনস্কাম,—
শান্তি-তৃপ্তি-পূর্ণ বুকে, অগ্রসর কাম্য সুখে
হর্ষে অভিরাম!
ধ্রুবতারা হয়ে রও, আত্মার আরতি লও,
যুগ যুগান্তরে,
হে অমর মর্ত্যলোক ধন্য হোক্! ধন্য হোক্!
তোমা লক্ষ্য করে!"

গোবিন্দদাস নীরব সাধক ছিলেন, তাই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর 'ধ্রুবতারা' হইয়া নির্ভীক দেশপ্রেমিকদের নির্ভুল দিক্‌নির্দেশ করিতেছেন। মর্ত্যবাসী তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই চলিয়াছে, যুগ-যুগান্তরেও চলিবে। কবি-বান্ধব ৺যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয় কবির অন্তর্ধানে, বেদনা-কাতর হৃদয়ে এক হৃদয়-বিদারক কবিতা লিখিয়াছিলেন,

---

২১০. ঐ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২৫ সন, পৃঃ ৩৮

যাহার প্রতিটি চরণ করুণ-রসে সিক্ত। কবিতাটির নাম—"কবি-প্রয়াণে।" ১৩২৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা "সৌরভ" পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়। এখানে সম্পূর্ণ কবিতাটি তুলিয়া দেওয়া হইল—

কবি-প্রয়াণে

(১)

"গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্‌বে না সে আর !
ভাতের অভাব ঘুচ্‌লো এবার, ঘুচ্‌লো হাহাকার !
সারা জীবন কেঁদে গেছে তু মুঠ ভাতের দায় !
হাত পাতেনি কারুর কাছে দারুণ যন্ত্রণায় !
মাসের ভিতর বেশীর ভাগই থাকতো চিড়া খেয়ে ;[২১১]
জীবন-ভরা জীবন-জ্বালা দেখ্‌লো না কেউ চেয়ে !
জগৎকিশোর বুঝতো দরদ্—গরীব তুখীর পিতা ;
তার দয়াতেই জাত্ রেখেছে কবির পরিণীতা !
সন্তানেরা পাচ্ছে খেতে, যায়নি যমাগার ;
বাঁচুক কিম্বা মরুক্ তারা, আসবে না সে আর !

(২)

গোবিন্দদাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
তোম্‌রা এখন শোকের সভা করো চমৎকার !

২১১. কবির তুঃখময় জীবনের শেষ পর্যায় সম্পর্কে অক্ষয়কুমার মৌলিক বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"কবি নিজ মুখে বলিয়াছেন আমার পথ্য তিন বেলাই জলচিড়া ! কবি পাটুয়াটুলীর এক দোকানে বসিয়া জল নুন দিয়া চিড়া ভক্ষণ করেন, আর দিন কাটান। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া ছাতা—জুতাহীন পায়ে শহর ভ্রমণ—এই ত তাঁহার কাজ। এই আমাদের পূর্ববঙ্গের কবির মর্যাদার শেষ।" (অক্ষয়কুমার মৌলিক বিদ্যাভূষণ : গোবিন্দচন্দ্র দাস, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা, ৭৪ ; পৃঃ ৪৩)।

চিতায় এখন মঠ্ দাওগে, কেঁদে ভিজাও মাটি ;
বক্তৃতাতে তুব্ড়ি ছুটাও টেবিলে দাও চাঁটি।
বুকের নীচে তাকিয়ে রেখে তর্ক করো সবে,
গোবিন্দদাস মস্ত কবি, নাম রেখেছে ভবে।
তোদের এসব কথা শুনে ঊর্দ্ধে দেবপুরে,
ক্ষুৎপীড়িত কবির আত্মা মর্ছে মাথা খুড়ে !
এখন হাজার গলা ফাটা, চেঁচা বারম্বার ;
কবি তোদের দেখ্বে না সুখ, আস্বে না সে আর !

(৩)

গোবিন্দদাস গেছে চ'লে, আস্বে না সে আর !
যায় না বলা সে সব কথা সকল ঘটনার।
যারা বেশী গর্ব করে দাস কবিকে নিয়ে,
তারাই আগে মাথা কুটুক্ ঘরের কোণে গিয়ে।
কি করেছিস্ তোরা তাঁহার যখন ছিল বেঁচে ?
এক মুঠো ভাত দিস্নি খেতে একটা দিনও যেচে !
মনের কষ্টে ঢাকার কবি ফিরতো পথে পথে ;
ক্ষুধায় চক্ষু কোটরগত, চল্তো কোনো মতে !
দোনের মত পেটটি ছিল, হাড় কখানি সার ;
জীবন দিয়ে মান রেখেছে, আস্বে না সে আর।

(৪)

গোবিন্দদাস গেছে চ'লে, আস্বে না সে আর !
পূর্ববঙ্গ করে গেছে গভীর অন্ধকার।
বিনা পথ্য চিকিৎসাতে কয়টা দিনের জ্বরে,
দেশের মস্ত অবহেলায় মনের ক্ষোভে মরে !

এদেশে কি পাঠক আছে? এইগুলি সব চাষা!
বুক-ফাটা সে ভীষণ কাঁদন কাঁদবে কবির ভাষা!
গরীব কাঙ্গাল কবি ব'লে কেউ চাহেনি হেসে;
আপন ক'রে নেয়নি তারে গভীর ভালবেসে!
পুর্ববঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবির অন্ন পাওয়া ভার?
ভুঁড়ি-ভোজন চলুক্ তোদের, আস্‌বে না সে আর!

(৫)

গোবিন্দদাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর
একটি খাঁটি কবি গেল কাঙ্গাল পল্লী মা'র!
শুভ্র ছিল হৃদয় তাহার কুন্দ ফুলের মত;
একটু স্নেহে ফেল্‌তো কেঁদে লাগতো থতমত
ক্ষুধার চোটে নিত্য তাহার বইতো বুকে বান!
সহ্য নাহি কর্‌তো তবু আত্মার অপমান!
মনুষ্যত্বের কর্‌তো পূজা শক্ত বুকের ছাতি;
কলুষ-হৃদয় লাখ্‌পতিদের মাথায় মার্‌তো লাথি।
নেহাৎ গরীব কবি কিন্তু ধৈর্যের অবতার;
একটি নিখুঁত মানুষ গেল, আস্‌বে না সে আর।

(৬)

গোবিন্দদাস গেছে চলে, আস্‌বে না সে আর!
পা'র হয়ে সে গেছে চ'লে দুখের পারাপার!
দেশের এসব ধনী মানী মিছাই থাকে ঢাকা!
বৃথা এসব বি. এ., এম. এ. কেবল চেনে টাকা।
দেশের কবি চিড়া খেয়ে কাঁদতো নারিন্দায়!
পয়সা হ'লে তবেই চাট্টি হোটেলে ভাত পায়!

নীলকণ্ঠের মত কেবল গরল পিয়ে নেছে !
সকল জ্বালার হাত থেকে সে মুক্তি পেয়ে গেছে !
কাঙ্গাল কবি আর চাহে না তোদের সুবিচার ;
কুকুর শেয়াল কাঁদুক এখন, আস্‌বে না সে আর ।

(৭)

গোবিন্দদাস গেছে চ'লে, আসবে না সে আর ।
বিনা দোষে দেশান্তরী করলো জমিদার ।
সে কেঁদেছে সারা জীবন মনের মহা দুখে
রক্ত দিয়ে লিখে গেছে মাতৃভাষার বুকে ।
নির্যাতনে ক্ষিপ্ত হয়ে করলে কষাঘাত ;
ধর্ম শাস্ত্র বলে না তার করতে মুণ্ডপাত ।
"ভাওয়াল তার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল তাহার প্রাণ,"
সেই ভাওয়ালে জীবনের তার হয়নি অবসান !
কেউ করে না এমনতর ভীষণ অত্যাচার ;
গোবিন্দদাস গেছে চলে, আসবে না আর ।

(৮)

গোবিন্দদাস গেছে চলে, আসবে না সে আর ।
একটি মানুষ পাই না খুঁজে দুঃখ বলিবার ।
থাকলে মানুষ কবির মৃত্যু হয় না অনাহারে ;
দুই মুঠো ভাত সবাই দিও শাস্ত্র অনুসারে ।
এদের চেয়ে হাজং গারো হাজার গুণে ভালো ;
তাদের হৃদয় এদের মত নয় তো মসী কালো !
বাহার ক'রে কাপড় প'রে বেড়াস্‌ বাবু সেজে ;
হাজার চেষ্টা করলে মানুষ হয় না ঘসে মেজে ;

'দামড়ি' 'চামড়ি খুব চিনেছে, হায় কি ব্যবহার।
গরীব কবির হাড় জুড়ালো, আসবে না সে আর ;

(৯)

গোবিন্দদাস গেছে চলে, আসবে না সে আর।
মনুষ্যত্ব নাই এদেশে, গেছে ছারেখার !
চতুষ্পদের গোষ্ঠী জ্ঞাতি ঘুরছে দ্বিপদগুলা ;
বাঁধা বুলি ঢের শিখেছে, মুখে ধোনে তুলা !
এদের কি আর হৃদয় আছে ? পাষাণ কবে গলে ?
কথায় যদি ভিজতো চিড়া, কাজ ছিল না জলে।
যখন তখন তাহার বিহার চলছে রাত্রি দিবা ;
মুখ আছে তাই বেঁচে গেছিস, নয়তো খেতো শিবা।
কলম-পেষা জাত-ব্যবসা, সবাই চাটুকার ;
মিট্‌লো কবির পেটের ক্ষুধা, আসবে না সে আর।

(১০)

গোবিন্দদাস গেছে চ'লে, আস্‌বে না সে আর !
জীবন গেলে ভুলবো না আর এদের অবিচার।
এদের খ্যাতির মূল্য নহে একটি কানাকড়ি ;
ক্ষুধায় ম'লো দেশের কবি, নাই কি গলার দড়ি ?
এরাই আবার মিটিং করে, লক্ষ্মীছাড়ার জাত !
বক্তৃতাতে স্বর্গে তোলে, দিন্‌কে করে রাত !
চরণ-চাটা অপদার্থ এদের মত নাই ;
হা ভগবান, মানুষ পাঠাও—মানুষ কোথা পাই।
এদেশবাসীর জীবনে ঠিক, ঠিক্ সে কোটিবার !
গোবিন্দদাস বেঁচে গেছে, আসবে না সে আর !

—সুদীর্ঘ কবিতাটি কবির জীবনার্ধের শেষ অঙ্কের শেষ পরিচিতি। মানুষ মরিয়া বাঁচে, না বাঁচিয়া মরে—এই প্রশ্নের একটা যথার্থ উত্তর মিলিবে আলোচ্য কবিতাটিতে। গোবিন্দদাসের "সারাজীবন কেঁদে গেছে দু-মুঠ ভাতের দায়"—ইহা যেমন সত্য; তেমনি সত্য "হাত পাতেনি কারুর কাছে দারুণ যাতনায়"। তাই "জীবন দিয়ে মান রেখেছে, আস্‌বে না সে আর"!—ইহাই কবি গোবিন্দদাস সম্বন্ধে শেষ কথা, চিরকালের কথা, সোনার ভাবের কালিতে লেখা পরম সুন্দরের কথা!

দ্বাদশ অধ্যায়

॥ বাংলা সাহিত্য ও কবি গোবিন্দদাস ॥

বাংলা সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাস অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিভার যথাযোগ্য বিকাশ এবং স্বীকৃতি ঘটে নাই; যেটুকু ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আছে অদম্য সাহস, নির্ভীক উক্তি এবং নীলকণ্ঠের মত বিষপান করিবার উদারতা। তাঁহার কাব্যে আমরা তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই ঃ—প্রথমতঃ, সত্যভাষণ; যাহাকে ইংরাজীতে বলা যায়—"The touch of truth is the touch of life." দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব (Personality) ;—অর্থাৎ নিজস্ব মহিমায় মণ্ডিত চিন্তাকল্পনা-রূপায়ণ। তৃতীয়তং, কবির নিজস্ব রচনা-রীতি (Style)। তাঁহার রচনা ভাবে ভাষায় সুরে ছন্দে কতকগুলি সুললিত বাক্য-বিন্যাস নহে; আবার ইংরাজী ভাবধারায় বা আদর্শে অনুপ্রাণিত নহে। গোবিন্দদাস একটি যুগ, একটি নাম —যাহা বৈষ্ণব পদাবলীর কবি গোবিন্দদাসের[২১২] ভাবধারায় স্নাত

২১২. গোবিন্দদাস ঃ—পদাবলীর কবি গোবিন্দদাস, চৈতন্য-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তা। তিনি বৈষ্ণব দর্শন ও তত্ত্বে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার কবিতায় ভক্ত বৈষ্ণবের তত্ত্বদৃষ্টির সহিত কাব্য-সৌন্দর্যের চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তিরিশের কিংবা চল্লিশের কোঠায় গোবিন্দ-দাস কবিরাজের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা চিরঞ্জীব, মাতা সুনন্দা, মাতামহ শ্রীখণ্ড নিবাসী দামোদর। গোবিন্দদাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন নরোত্তম দাসের সুহৃদ্ রামচন্দ্র কবিরাজ। অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় দুই ভাই মাতামহাবাসে লালিত-পালিত হন। পরে পৈত্রিক নিবাস কুমারনগরে এবং আরও পরে তেলিয়াবুধরী গ্রামে গিয়া বাস করেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের স্ত্রীর নাম—মহামায়া, তাঁহাদের একমাত্র পুত্র দিব্যসিংহ। এই দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজ

হইয়াও বুড়িগঙ্গার জলে অবগাহন করে। তাঁহার কবিতা তাঁহার নিজস্ব দর্শনের (Personal vision) অভিব্যক্তি এবং জীবনে জীবন যোগ করায় তাহা জীবন-সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কবিতায় ছোট সুখ, ছোট ব্যথা এবং 'ছোট ছোট দুঃখ কথা' সহজ সরল সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করায় তাহা জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে। সেখানে যেমন ভঙ্গী দিয়া চোখ ভুলাইবার বিষয় নাই, তেমনি নাই কৃত্রিম পণ্যে' গানের পসরা সাজাইবার অহেতুক ব্যস্ততা। শুধু তাহাই নহে—

"নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি র'বে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

—স্বভাব কবি গোবিন্দদাসের ইহাই কাব্য-পরিচিতি এবং বিশেষ পরিচিতি বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তিনি জাতীয় কবি।

সপ্তদশ শতকের একজন বিশিষ্ট পদকর্তা ছিলেন। মাতামহের প্রভাবে রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিন্দদাস কবিরাজ উভয়েই প্রথম বয়সে শাক্তমতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলন। পরে যৌবনশেষে গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব হইয়া গোবিন্দদাস রাধাকৃষ্ণলীলা গীতি রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহা ঠিক জানা যায় না। তাঁহার সব পদই ব্রজবুলিতে লেখা, কচিৎ সংস্কৃতে। "সংস্কৃত মাধব" তাঁহার রচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক। বৃন্দাবনের শ্রীজীব প্রমুখ তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। শ্রীজীব তাঁহাকে "কবীন্দ্র" অর্থাৎ "কবিরাজ" উপাধি দিয়াছিলেন। মদীয় গবেষণালব্ধ গ্রন্থ "পদাবলী সাহিত্য ও গোবিন্দদাস" এবং "শ্রীখণ্ড ও শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণবে" এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ রহিল।

কবি গোবিন্দাসের প্রায় কবিতাই দুঃখবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই দুঃখবাদ পলায়নবাদ নহে বা ধনী কবিদের অথবা অভিজাত শিল্পীদের স্বপ্নবিলাস বা কাব্যবিলাস নহে। ইহা জীবনসিন্ধু মন্থন করিয়া যে রস উঠিয়াছে, তাহারই ঘনীভূত নির্যাস। প্রত্যক্ষ জীবনের অভিজ্ঞতা-সংক্রান্ত এবং জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত কবি গোবিন্দদাসের কাব্য প্রথম শ্রেণীর কাব্য। সে যুগে জন্মগ্রহণ না করিয়া তিনি যদি এই যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন; তবে তিনি কবি না হইয়া ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার হইতে পারিতেন। গোবিন্দদাস ধর্মে শৈব এবং তাঁহার কাব্যে শিব মহাভোগী, অথচ মহাযোগী। তিনি ইংরেজী জানিতেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন নাই—যেন প্রয়োজন নাই বলিয়াই না জানা। তিনি খাঁটি বাঙ্গালী কবি, তাঁহার কবিতা কোমলে-কঠোরে সংমিশ্রণে অপূর্ব গীতি-কবিতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খাঁটি বাঙ্গালী কবি, স্বদেশী কবি ও জাতীয় কবি হইয়াও তিনি বাঙ্গালীর নিকট উপেক্ষিত, অবহেলিত ও অনাদৃত রহিয়া গেলেন। বোধ হয়, কবি জীবদ্দশাতেই যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা যেন সাধকের দৃষ্টিতে দেখা এবং চোখের জলে লেখা—

“যা-হ’ক আমি শত ধন্য,
        কৃতজ্ঞ, কৃতার্থমন্য
তোমাদের এই স্নেহের জন্য
        আজ তোমাদের সন্নিকট,
চিতায় মঠ দিবে কেহ,
        গড়বে ষ্ট্যাচু অর্ধ দেহ,
ছায়া চিত্র রাখবে কেহ
        কেউ বা তৈল চিত্রপট।
ক’রবে তোমরা শোকসভা,
        চক্ষে চসমা শ্বেত-জবা,

ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রপ্রভা,
করতালি চট চট,
স্বর্গ কিম্বা নরক হ'তে
আসব তখন আকাশ-পথে,
দেখতে আমার শোক-সভা,
সঙ্গে নিয়ে অলকট।"

—এইরূপ শ্লেষাত্মক সত্যভাষণ বাংলা কাব্য-সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। ভাষণটি শুধু সত্য নহে, অপ্রিয়। এই অপ্রিয় সত্য-ভাষণের জন্য কবি সারাজীবন দেশবাসীর নিকট উপেক্ষিতই রহিয়া গেলেন।

আধুনিক গীতি-কবিতা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক বহিঃ-প্রকৃতির কবি এবং দুই অন্তঃপ্রকৃতির কবি। কবি গোবিন্দদাস প্রথমোক্ত শ্রেণীর কবি ছিলেন। ফলে, বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃ-প্রকৃতির একটা নিগূঢ় যোগসম্বন্ধ এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অনেক সময় স্থূল প্রকৃতি শক্তির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। প্রেম-সম্পর্কীয় কবিতাগুলিকে ইহার প্রভাব বা ছায়া এতদূর পড়িয়াছে যে, বর্তমানের অপসংস্কৃতি দূর করা আন্দোলনের মাপকাঠিতে রুচি-বিগর্হিত বলিয়া মনে হইবে। "ভগ্ন-হৃদয়"-এর কবির প্রেমোচ্ছ্বাস তৎকালেই গীত হইয়াছিল। গোবিন্দদাসের কবিতায় 'আর্ট' বা কলানৈপুণ্য নাই বলিয়া অনেকে সমালোচনা করেন, কিন্তু তাঁহার কবিতায় যাহা আছে তাহা প্রাচীন কালের মহাকবি কালিদাস হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের অনেক সাহিত্য-রথী-মহারথী দিতে পারেন নাই। এইখানেই গোবিন্দদাস অনন্য। তাঁহার কবিতাগুলি আলোচনা করিলেই বিষয়টি সহজেই বোঝা যাইবে। কবি শশাঙ্কমোহন সেন যথার্থই বলিয়াছেন—"নিজের নিতান্ত সাধারণ সুখ-দুঃখের ঐকান্তিক এবং আসন্ন সম্পর্ক ব্যতীত গোবিন্দ-

দাসের সরস্বতী কখনও বীণা ধারণ করেন নাই—এমন সীমা-সংকীর্ণ আত্ম-শৃঙ্খলিত সরস্বতী সাহিত্য-জগতে প্রায়ই দেখা যায় না।"

কবি গোবিন্দদাস বিভিন্ন শ্রেণীর কাব্য-কবিতা লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে—(১) প্রেমমূলক কবিতা; (২) সামাজিক কবিতা; (৩) শোক-সংগীত; (৪) দেশাত্মবোধক কবিতা; (৫) বিদ্রূপ রসাত্মক কবিতা; (৬) নানা বিষয়ক কবিতা উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর কবিতাগুলি বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদ। নিভৃত পল্লীর নিরালায় বসিয়া "নীলকণ্ঠ কবি সমস্ত গরল নিজে ধারণ ক'রে মরণ-যন্ত্রণাক্লিষ্ট কণ্ঠ থেকে যে গান ধ্বনিত করলেন"[২১৩] তার তীব্র দাবদাহে দগ্ধ হইয়াছিল সামন্ত প্রথায় পুষ্ট বিদ্বৎসমাজ। তাঁহার কবিতাগুলি বিশ্লেষণে এবং জীবন-দর্শনে এই সত্য পরিস্ফুট। এইবার দিগ্‌দর্শন স্বরূপ বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতাগুলি আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) প্রেমমূলক কবিতা—

কবি গোবিন্দদাসের প্রেম কবিতাগুলি সহজ-সরল-লৌকিক উপমায় ও প্রচলিত এবং দেশজ শব্দে সমৃদ্ধ এই প্রেমমূলক কবিতা-গুলিতে নারী-প্রীতি নারী-ভক্তি এবং পত্নীপ্রেমই মুখ্য। এই শ্রেণীর কবিতা যাঁহারা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের গুরু বিহারীলাল। তাঁহার অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়াছেন, কবি অক্ষয়কুমার বড়াল এবং সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদার। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি বিহারীলালের শিষ্য ছিলেন। তিনিও এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন। সেকালের কবিয়া প্রেমসঙ্গীতকে প্রেমগীতি উপহার হিসাবে রচনা করিতেন ও গাহিতে ভালবাসিতেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা"র তারে হাজার রাগের রাগিণী বাজিলেও প্রেমের রাগিণীই বেশী মাত্রায় ঝংকৃত হইত।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাসের প্রেমমূলক কবিতার

---

২১৩. ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত পৃঃ ৫২৮।

সংখ্যা প্রচুর। বোধ হয় বাংলা সাহিত্যে তখন প্রেম-সম্পর্কীয় কবিতার বেশী আদর ছিল বলিয়াই পূর্ণবয়স্ক যুবক গোবিন্দদাস এত বেশী প্রেম-মূলক কবিতা লিখিয়াছিলেন। ইহা ১২৮৪-৮৫ সালের কথা। নারীকে তখন শুধু সাংসারিক জীবনে সহধর্মিণী হিসাবে দেখা হইত না দেবী হিসাবে পূজা করা হইত। নারী-ভক্তিতে কবি গোবিন্দদাস যেমন আত্মহারা, তেমনি নারী-বিদ্বেষেও তিনি সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। নারী-ভক্তিতে তাঁহার আত্মহারা সীমাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছে—

"সে আমার পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী,
সমগ্র যোজনে থাকি নিলে তার নাম,
হৃদয় নির্মল হয় শান্ত হয় মতি,
অনায়াসে জয় করি পাপের সংগ্রাম!
স্মরণে অনন্ত পুণ্য, মরণে উল্লাস,
আমি পাপী—আমি আর কিছুই না জানি,
দগ্ধ বুকে শত মুখে বহে বারো মাস,—
তোমরা বৈকুণ্ঠ লহ, আমি—পা দু'খানি।"

—কবিতাটি পড়িলে মনে হয় কোন ভক্তের স্বর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিকট বরলাভের প্রার্থনা এবং সশ্রদ্ধ আত্মনিবেদন। ভগীরথের গঙ্গা-আনয়নে মর্ত্যবাসী যেমন তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করে, তেমনি তোমার আবির্ভাবে অমরাবতীর সুখ ও শান্তি মর্ত্যে নামিয়া আসে; তাই তুমি 'পুণ্যময়ী প্রিয় ভাগীরথী'। ইহা যেন রবীন্দ্রনাথের সেই কথা—

"নারী সে যে মহেন্দ্রের দান—
এসেছে ধারিত্রীর তলে
পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান"।

কবি গোবিন্দদাস তাই বলেন—'স্মরণে অনন্ত পুণ্য, মরণে উল্লাস'। প্রেমে পাগলপারা কবি আবেগের ভাষায় লিখিয়াছেন—

"বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ,
প্রেমের অনন্ত উৎস,—নহে ও পাষাণ!
প্রত্যেক আঘাতে বুকে, এক গঙ্গা শত মুখে
ছুটিছে অনন্ত বেগে বহে না উজান!
বুঝিলাম আজি ওই দেবতার প্রাণ।
আজি বুঝিয়াছি হায়; ওই ফল্গু-গঙ্গা-ধায়,
হৃদয়ে অনন্ত স্রোত সদা বেগবান,
প্রেমের অনন্ত উৎস—নহে ও পাষাণ!"

কবি যে দেবীকে বা নারীকে বলেন—'নহে ও পাষাণ' এবং 'প্রেমের অনন্ত উৎস', তাঁহাকেই আবার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বলেন—

"দয়া মায়া নাহি যারি, আমি জানি সেই নারী,
আমি জানি রমণীর ইহাই লক্ষণ;
* * * *
আমি দেখি নাগপাশে, রমণী জীবন-নাশে,
আনন্দে বর্বর ভাসে—বলে আলিঙ্গন!'

আবার জীবনে যখন নৈরাশ্য আসে, কাব্যে তখনই তার প্রতিফলন ঘটে—

"কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার?
বিশ্বাসে তোমার কথা, নিশ্বাসে নিশ্বাসে ব্যথা,
নড়িতে চড়িতে বুকে বিঁধে শতবার!
বিষাক্ত স্বপন সম, জ্বলন্ত জীবনে মম,
জাগিয়া রয়েছে তব ফুল-উপহার!
হাত দিয়ে কি বুঝিব তোমার?"

কবির নিকট সত্য, প্রেম ও বিশ্বাসের মূল্য অনেক। সেখানে 'ভাবের ঘরে চুরি' হইলে কবি সহ্য করিতে পারেন না; পুরুষসিংহের মত গর্জন করিয়া ওঠেন এবং প্রতিবাদ জানান। এমন কি, যে নারীকে তিনি 'অস্থি-মাংস-মজ্জা সহ' ভালবাসেন, তাহার বিরুদ্ধেও—

"বজ্র হ'তে ভয়ঙ্কর, বিষ হ'তে বিষ,
সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস!"

—নারী-বিদ্বেষের এত উচ্চগ্রামের সুর আধুনিক কাব্য-কবিতাতেও দেখা যায় না। 'সাগরের চেয়ে নারী ডাগর জিনিস'—উপমা ও অলঙ্কারের চাতুর্যে কবি বক্তব্য বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, নিজে এক ছত্র লিখিয়া দশ ছত্র লিখিবার অবকাশ রাখিয়াছেন।[২১৪]

কবি গোবিন্দদাসের প্রেমের কবিতা নানা ভাবে, নানারূপে রূপায়িত হইয়াছে। কবি সরল প্রাণের সরল প্রেমের বিশ্বাসী এবং দাম্পত্য প্রেম তাঁহার নিকট কল্পিত প্রেমের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। প্রসঙ্গ-ক্রমে তাঁহার একটি চিঠির অংশবিশেষ এখানে স্মরণীয়:—"সংসারে থাকিতে হইলে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে থাকাই সঙ্গত। নতুবা সংসারে থাকিয়া নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী-জীবন,—সে ত নিজেকে পরকে,—ইহকালকে

---

২১৪. তুলনীয়:—

"যৌবন জলধি বক্ষে হয় সিন্ধু পার।
যৌবনে নারীর বক্ষে ডুবিল সংসার॥
বিচারিয়া দেখি নারী জ্ঞানবুদ্ধিহীনা।
কিছু নাহি তার দেহে রস-রক্ত বিনা॥
ইহা লইয়া কি করিবে মহামতিগণ।
শৃগাল আর কুক্কুরের মাংস ভক্ষণ॥

—মহাজন পদাবলী

পরকালকে,—সকলকে ঠকানো। অর্থাৎ নিজে সর্ববিষয়ে ঠকা। * * * টাকা পয়সা কম পাইলেও * * সংসার চলিলেই হইল। দুরাশাগ্রস্ত লোকের কেবল টাকার খাই খাই—তাহারা প্রকৃতই পিশাচপ্রকৃতি। উহাদের দয়া-মায়া, স্নেহ, ভালবাসা কিছু নাই। টাকাই উহাদের সর্বস্ব। হৃদয়শূন্য মানুষ, আর হিংস্র পশু সমান। আমার বিবেচনায় পৃথিবীর সর্বপ্রধান সুখ স্নেহ-মমতা-ভালবাসায়—সংসার-জীবনে। নির্বাসিতের সংসার-জীবন নাই। তাহার জীবন জ্বলন্ত মরুভূমি।"[২১৫] পত্রটিতে আদর্শ গৃহস্থ জীবনের কথা, সাংসারিক জীবনে 'পিশাচপ্রকৃতি' মানুষের কথা, টাকার সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাসিতের জীবন-যন্ত্রণার কথা বলা হইয়াছে। মানুষের গৌরব—মনুষ্যত্বে, অমানুষের গৌরব—অর্থে। আর নির্বাসিতের জীবনের গৌরব—দেশপ্রেমে। কবি গোবিন্দদাস সংসারকে ভালবাসিয়াই দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন। তাই কবি প্রতিভায় যেমন ধনী, প্রেমে তেমনি ধনী ছিলেন। তাঁহার পত্নীপ্রেম আদর্শ-স্বরূপ ছিল। "সাংসারিক জীবনে গোবিন্দদাস" অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। এখানেও প্রসঙ্গ-ক্রমে আলোচিত হইল। পত্নীহারা কবি "চন্দনে" লিখিয়াছেন—

"সেই নিশি সেই দিবা, নূতন হয়েছে কিবা,
সেই আলো অন্ধকার আগের মতন।

* * * *

পুরাতন এই রাজ্যে, প্রতি কথা প্রতি কার্যে
সে ত গো হইয়া গেছে অতি পুরাতন।

---

২১৫. ১৩২৪ সালে ১৪ই মাঘ, ৪৭ নং সা সাহেব লেন, 'নারিন্দা'; ঢাকা হইতে শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত কবির পত্রের অংশবিশেষ।

সকলে ভুলেছে তারে, মনে নাই একেবারে
সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন।
লইয়া দুঃখিনী মেয়ে, গেছে কত দুঃখ পেয়ে,
ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন?"

কবিতাটি পত্নীবিয়োগ-প্রসঙ্গে কবির স্মৃতি-উপহার হইলেও, ইহা যেন নিজের অবর্তমানের নিজের পরিণতির কথা লেখা—

"সকলে ভুলেছে তারে, মনে নাই একেবারে
সে যে গো এদেশে আহা ছিল একজন।"

আবার,—'ভাবিতে তাহার কথা কার প্রয়োজন?' এই 'কার প্রয়োজন?' কথাটি বড়ই করুণ, বড়ই মর্মান্তিক! হয়তো কাহারও প্রয়োজন নাই, কিন্তু কবির প্রয়োজন আছে; প্রয়োজন নাই বলিয়াই হয়তো প্রয়োজন আছে—

"আছে প্রয়োজন আছে, নহিলে কি প্রাণ বাঁচে
নহিলে কি তার কথা করি আন্দোলন?

*   *   *   *

রক্ত-মাংসে মাখামাখি, সে আকাঙ্ক্ষা নাহি রাখি,
করে না কামের ক্লেদে কুটু কুটু মন।"

—ইহা দেহকে কেন্দ্র করিয়াও দেহাতীত প্রেমের কথা। তাই 'তার কথা করি আন্দোলন', 'নহিলে, কি প্রাণ বাঁচে?' বাঁচে না! এই জন্য 'আত্মেন্দ্রিয়ের' পরিবর্তে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়'-র কথাই পদাবলীতে বেশী। কবির গভীর ভালবাসায় প্রকৃতিও সাড়া দেয়, নাড়া দেয় হৃদয়-তন্ত্রীকে। তাই—

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ,
বিনোদ বৈশাখে নব চম্পক-চন্দন,
ঊষার কদম্ব-কেলি, সাঁজের ফুটন্ত বেলি,
সিক্ত-বেনামূল গন্ধী শীত সমীরণ!

সেই মম প্রিয় নারী, নবীন মেঘের বারি,
অবনীতে শ্যামশোভা করে আনয়ন,
শিখী নাচে পাখী গায়, আনন্দে চাতক চায়,
উল্লাসে ভরিয়া যায় সমস্ত ভুবন।"

—আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবজলধর হেরিয়া যক্ষের প্রাণে যে অসহনীয় বিরহ-ব্যথা জাগিয়া উঠে, নববর্ষে কবির প্রাণে তাহা অপেক্ষা কম ব্যথা জাগে নাই। আকাশ জুড়িয়া সজল ঘন মেঘ বিস্তারলাভ করিয়াছে। তন্দ্রার ঘোর লাগিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতিতে। সূর্যের খরদীপ্তি সাময়িকভাবে অন্তর্হিত হইয়াছে। বোধ হয়, দিনের অবসানে হইয়াছে রাত্রির আবির্ভাব। অকাল সন্ধ্যার ঘনঘোর মূর্ছনা বিশ্বভুবনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে অদৃশ্য যাদুবলে। দিনেই অকাল রাত্রির আবির্ভাবে বিরহকাতর যক্ষের বিরহ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। তাপতপ্ত প্রকৃতি বর্ষাগমে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি শান্ত হইলেও যক্ষের অন্তরের বিরহজ্বালা বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়াছে, প্রশমিত হয় নাই একেবারেই। অতএব ভাগ্যদোষে যক্ষের আজ যে অবস্থা, সেই অবস্থার ক্লেশ কিছুটা দূর করার জন্য যক্ষ শরণাপন্ন হইয়াছে মেঘের। যক্ষ বর্ষার যে মেঘকে তার করুণ অবস্থার কথা নিবেদন করিয়াছে, সেই মেঘ বজ্রপাণি ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহুসদৃশ অর্থাৎ প্রধান সহায়। বর্ষার মেঘের সঙ্গে বজ্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বজ্র হইতেছে ইন্দ্রের অস্ত্র। সুতরাং মেঘকে ইন্দ্রের প্রধান সহচর-রূপে গণ্য করিয়াছে যক্ষ। এই মেঘ যেমন ইন্দ্রের সহায়, তেমনি বংশগৌরবও তার অত্যন্ত বেশী। ভুবনবিদিত পুষ্করবংশে এই মেঘের আবির্ভাব। অতএব বংশগৌরবে যে মহান, ক্রিয়াকর্মে যে বলবানের অস্ত্রসদৃশ, সে তো সামান্য নয়। সামান্য নয় বলিয়া যক্ষের মত কবি তাহাকে পূজা করিয়া অভিনন্দন ও প্রার্থনা জানায়—

"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ
শুভ চন্দ্র সম তার শুভ চন্দ্রানন,
কি পুণ্য অমৃতযোগ, প্রাণে করি উপভোগ,
একটি মুহূর্ত তারে করিলে স্মরণ।"

'একটি মুহূর্ত'—জীবনের বহু মুহূর্তকে ভুলাইয়া দেয়। 'অমৃতযোগ' —জীবনের অমৃত সব সময় না আনিলেও শোকার্ত হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করে। সেইজন্য কবি বলিয়াছেন—"সেই মম নববর্ষ, আনন্দ আহ্লাদ হর্ষ"।

(২) সামাজিক কবিতাঃ—কবি গোবিন্দদাসের সামাজিক কবিতাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা। বাঙ্গালীর ভীরুতার প্রতি কবির কটাক্ষপাত—

"রেলে কি জাহাজে গেলে,
কেহ তারে ঠেলে ফেলে,
নিলে তার মা বোনেরে চুপ করে রয়!
যুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?
দেও তারে শত গালি,
দেও তারে চুন কালি,
বেহায়ার তাতে কিবা লোক-লাজ ভয়!
বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয়?"

বাঙ্গালী আত্মবিস্মৃত জাতি। তাই সে অতীতের স্মৃতিভোরে ঘুমাইয়া থাকে; ভুলিয়া যায় নিজেদের গৌরবময় ইতিহাসের কথা। ফলে—

"যুতা, লাথি, ঝাঁটা, বেতে,
এরা না কিছুতে চেতে,
অচেতন জড়ে কবে ব্যথা বোধ হয়?"

'অচেতন জড়ে' যেমন কোন চেতনা থাকে না, তেমনি বাঙ্গালী জাতির কোন লজ্জা ঘৃণা নাই ; 'বেহায়ার মত' আচরণ করে, মা বোনের অত্যাচার দেখিয়াও উত্তেজিত হয় না। প্রতিশোধ-গ্রহণে সঙ্কল্প গ্রহণ করে না। কবি তাই ক্ষোভে-দুঃখে-লজ্জায় বলিয়াছেন—"বাঙ্গালী মানুষ যদি প্রেত কারে কয় ?"

সমাজের একটি কলঙ্ক হইতেছে পতিতা নারীদের অসহনীয় জীবন-যন্ত্রণার কথা। যে সমাজে পণের দায়ে 'বলিদান হয়', 'টাকা দিয়ে গরু ছাগলের মত M. A. B. A. পাশ করা' ছেলে কিনতে হয়, কুলিনের কৌলীন্যের ফলে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের পালা চলে, চলে আগুনের ফুলকির মত বালবিধবাদের উপবাস এবং ব্রত-উদ্‌যাপন, সেখানেও ভদ্রভাবে বাঁচার কোন উপায় নাই। কারণ—

"অই যে উপর ছাতে, গোলাপের তোড়া হাতে
ডাকিছে কমলমুখী আঁখি-ইশারায়,
'আমি যে বিধবা মেয়ে,
দি'ছ মোর মাথা খেয়ে,
পাপিষ্ঠ সমাজ তুমি পাপ-ছলনায় !
তুমিই করেছ নষ্ট,
করিয়া ত্রিদিব ভ্রষ্ট,
হা কি লজ্জা, হা কি কষ্ট, সে কি বলা যায় ?
তুমি কিন্তু সাধু হ'লে
আমি দোষী পাপী বলে ;
আমি মরি দিবানিশি কলঙ্কে লজ্জায় !
তুমিই নরকে নিলে,
নারকী করিয়া দিলে,
তুমিই আমারে শেষে ছোঁও না ঘৃণায় !

কুকুর বিড়াল হায়,
সেও ত আশ্রয় পায়,
সেও ত তোমার ঘরে এটো কাঁটা খায় ?
আহা এই অবলারে,
অত্যাচারে অবিচারে,
কি দুঃখ না দিয়ে তুমি করেছ বিদায় ?”

—এই দুঃখের গভীরতা কতখানি, তাহা বোধ হয় একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই জানেন ; আর কেহই জানেন না, বোঝেন নাই। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের মত[২১৬] কবি গোবিন্দদাসও যেন বুঝিতে চাহিয়াছেন, অত্যাচার অবিচারের বিচার ! কিন্তু ‘আইন যেখানে তামাশা’, সেখানে বিচার নিরর্থক ! তাহা না হইলে কবির ‘মগের মুলুকে’র বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র কেন, মানহানির মামলাইবা কেন? আসলে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া ভয়ে আশঙ্কায় চীৎকার করিয়া উঠিতেছি ! আসলে অনুশোচনা, আত্মচেতনা ও আত্মোপলব্ধি ছাড়া এই সমস্যার সমাধান নাই। তাই ১২৯২ সালে কবি গোবিন্দদাস বাল্যবিবাহ প্রসঙ্গে আক্ষেপ করিয়া বড় দুঃখে, ভগ্নহৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ নয়নে লিখিয়াছিলেন—

“বৃথা দোষি বিধাতায়—দেশের এ দোষ—
সমাজের দোষ এই, নহে বিধাতার,
হেন মূর্খ আছে কে হে, যে হয় সন্তোষ
প্রতপ্ত গরল বক্ষে মাখি আপনার ?
নির্ব্যূঢ় অজ্ঞান সেই এ বঙ্গসমাজ
তাহার(ই) প্রীতির কার্য বাল্য পরিণয়,

---

২১৬. রবীন্দ্রনাথ “পতিতা” কবিতায় ‘পতিতা’দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—
“জানিনা করম লজ্জা শরম জানিনা জীবনে সতীর প্রথা
তা’বলে নারীর নারীত্বটুকু ভুলে যাওয়া সে-কি কথার কথা।”

সেই পূর্ণ নির্বোধের বিষময় কাজ
অচিরে প্রসবে এই ফল বিষময় !
বক্ষে করি এই বিষ নরক অনল
প্রবেশে সংসার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী দুর্লভ !

* * *

না খুলিতে বালকের জ্ঞানের নয়ন,
রে পাপিষ্ঠ দুরাচার সমাজ নিষ্ঠুর,
সংসারের এ বিষাক্ত কণ্টক কাননে
প্রবেশ করাও তারে পিশাচ অসুর !"

কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রও সমাজের এই দিক্‌টির প্রতি সীমাহীন দরদ দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নারীর সতীত্ব কোথায় ? দেহে না মনে ? সতীত্ব বড়, না নারীত্ব বড় ?" তিনি প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কিন্তু উত্তর দেন নাই। সমস্যার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সমাধান করেন নাই। আর এই সমস্যার সমাধান কোথায় ? এ যে 'সমাজের দোষ,' 'দেশের এ দোষ'। তিনি বলিয়াছেন—"সব জিনিসের একটা সত্যকার অধিকার আছে। সমাজ উন্নত হয়ে যখন সেই সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তাকে আঘাত করা উচিত। সে আঘাতে সমাজ মরে না, তার চৈতন্য হয় ; মোহ ছুটে যায়।" গোবিন্দদাসের কবিতা সমাজকে আঘাত করে, নাড়া দেয়। ফলে, 'মোহ ছুটে যায়', চৈতন্য উদয় হয়। বাংলা কাব্য-সাহিত্যে কবি গোবিন্দদাসের স্থান ও মান এইখানেই।

(৩) শোক-সঙ্গীত :—কবি গোবিন্দদাসের জীবন-সঙ্গীতই শোক-সঙ্গীত। দুঃখ-কষ্ট-বিরহ-যন্ত্রণা তাঁহার নিত্যসঙ্গী। "শৈশবে পিতার অভাব, যৌবনে পত্নীশোক, সন্তাননাশ এবং বার্ধক্যে নিরন্ন অবস্থা প্রভৃতি কবি গোবিন্দদাসের দুঃখের মূলীভূত কারণ। এই জন্যই কবি

গোবিন্দের কাব্যগুলি, এমন কি সমগ্র জীবন পর্যন্ত Pessimistic ; ইহা পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে ঋণ-করা Pessimism নহে, ইহা তাঁহার নিজস্ব"।[২১৭] কিন্তু 'নিজস্ব' হইলেও ইহা 'সাধারণীকরণের' জন্য সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাই কবি গোবিন্দদাসের শোক-সংগীত ব্যক্তিগত হইয়াও অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়াছে। করুণ অথচ মর্মস্পর্শী শোক-সংগীতগুলি যেন শোকগাথা—

"সারদা ! এসেছি আমি দেখ গো চাহিয়া,
আজি কতদিন পরে, ফিরিয়া এসেছি ঘরে,
এই যে নিকটে দেবি ডাকি দাঁড়াইয়া,
ওঠ ওঠ আর কেন, শ্মশান শয্যায় হেন,
অযতনে ছাইভস্মে আছ ঘুমাইয়া।"

'মৃত্যুই কি জীবনের শেষ' ? 'যে যায় সে কোথায় যায়' ? কবি গোবিন্দদাসের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছে—"অঙ্গারের চেয়ে মান এতই অঙ্গার ?' মানুষ তাহার প্রিয়জনকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। কিন্তু মহাকাল বাঁধন শিথিল করিয়া দেয়। তবু 'তারে ভোলা যায় না' ! নির্বাসিত কবিও ভুলিতে পারেন নাই—

"কি হবে শুনিয়া ভাই কোথা বাড়ী ঘর ?
যে দেশে আছিল বাড়ী, আজি তার নর নারী,
শোকে দুঃখে বিষাদিত ব্যথিত কাতর !
নীরবে সকলি সহে, মরার মতন রহে,
মা বোন্ সতীহারা করে ধড়ফড় !
হায় সে সে দেশের কথা, দুঃখময় সে বারতা,
আমি যে রেখেছি বুকে চাপিয়া পাথর !
কি হবে শুনিয়া ভাই, কোথা বাড়ী ঘর ?"

---

২১৭. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী : 'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ ২৭৭।

সব থাকিতেও যেখানে কিছু নাই, সেখানে বেদনা বড়ই মর্মান্তিক, মৃত্যু সেখানে 'শ্যাম সমান' নয়, শ্মশান সমান, সব সমান! পৃথিবীতে প্রকৃত গণতন্ত্র বলিতে বুঝি শ্মশানের গণতন্ত্র—ধনী-গরীব, রাজা-প্রজা সবাই সমান—"মৃত্যু মাঝে চিতা ভস্মে হ'তে হবে সবার সমান"। কবি গোবিন্দদাস তাই বলেন—

"রাবণের চিতা সম, জ্বলে জন্মভূমি মম,
ধুইয়া শ্মশান সেই বহিছে চিলাই"।

শ্মশান ত ধোয়া যায় না, স্মৃতিও মোছা যায় না। তাই, কবি ও কবির স্মৃতিও ভোলা যায় না। তাহা "একবিন্দু নয়নের জলে, কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে"।

(৪) দেশাত্মবোধক কবিতা :—

কবি গোবিন্দদাস একজন খাঁটী বাঙ্গালী ও খাঁটী স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি খাঁটী বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপর ইউরোপীয় প্রভাব পড়ে নাই। তিনি মনে-প্রাণে স্বদেশী ও বাঙ্গালী ছিলেন। তাঁহার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে যে, "তিনি ঠিক যেমন বাঙ্গালীটি হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, শেষ দিন পর্যন্ত তেমনি বাঙ্গালীটিই ছিলেন।" তাঁহার জন্মভূমি 'ভাওয়াল' তাঁহার নিকট স্বর্গের চেয়েও প্রিয়, প্রাণের চেয়েও শ্রেয়ঃ। এই জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হওয়ার অন্যতম কারণ প্রবল দেশাত্মবোধ, আত্মমর্যাদাবোধ এবং স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশ-ভক্তি। "চন্দন" কাব্যে ছড়াইয়া আছে নির্বাসিত কবির অশ্রুমালা হাহাকার—

"ভাওয়াল আমার অস্থি মজ্জা, ভাওয়াল আমার প্রাণ।
আমি তার অধম সন্তান॥"

তাঁহার দেশভক্তি ছিল অপরিসীম। সেখানে কিছু তথাকথিত চাওয়া-পাওয়া ছিল না। জন্মভূমির প্রতি ছিল অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তাঁহার দেশাত্মবোধক কবিতাগুলি সে যুগে স্বদেশবাসীকে স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা দিত, যেমন—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়
কার স্বদেশে কাদের খেয়ে, এমনতর পথে পেয়ে
জোর জবরে গাড়ীর ভিতর সাড়ী কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম অন্ধ কাণা খোঁড়া
ভিস্তিওয়ালা পাল্কাকুলী পিলা ফাটার ভয়
কার স্বদেশ সর্বনেশে এমন অভিনয়?
সোনার বাঙ্গলা সোনার ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি
ভারত তোমার আস্বে কোলে এই কি মনে লয়?
সোনার যাদু মিষ্টি ভাষে, ছেলে মেয়ে কোলে আসে
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়।
কবির কথায় তুষ্ট নহে ভবি মহাশয়!"

তৎকালীন যুগে এই গানটি লোকের মুখে মুখে ফিরিত, রাখাল গরুর পাল লইয়া যাওয়ার সময় গানটি গাহিত, চাষা চাষ করিবার সময় গাহিত এবং ফসল কাটার গানে এই গানটি আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিত। স্বদেশপ্রেমিকরা এই গানটি গাহিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনকে জোরদার করিত, বন্দীরা 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য গাহিত এবং স্কুল-কলেজের ছাত্ররা গানটি গাহিয়া ভবিষ্যৎ আন্দোলনে উন্মাদনা অনুভব করিত। এমনি ছিল কবি গোবিন্দদাসের গানের সম্মোহন-শক্তি। এই শক্তির পরিচয় "বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম ও কবি গোবিন্দদাস"—শীর্ষক

অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানেও প্রসঙ্গ-ক্রমে কিছু আলোচিত হইল।

১২৯১ সালে প্রবাসী গোবিন্দদাস স্মৃতি-রোমন্থনে বিগত বৎসর সমুহের আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"পুণ্যযোগ গত বর্ষ আমার জীবনে
আমি ভারতের পুত্র আর্য কুলাঙ্গার,
স্বদেশ, স্বজাতি প্রেম মৃত সঞ্জীবনে,
এতদিনে জাগিয়াছে হৃদয় আমার।
জন্মিয়াছে ব্যথা বোধ জাতীয় পীড়নে,
পক্ষাঘাত বক্ষ আজ হতেছে স্পন্দিত
আমূল স্নায়ব-যন্ত্র ঘোর বিকম্পনে,
কি এক দৈবীয় বলে হতেছে কম্পিত।
জাতীয় শকার্তি প্রাণে হয়েছে সঞ্চার,
পুণ্যযোগ গত বর্ষ জীবনে আমার!
যে জাতীয় উদ্দীপনা, জাতীয় সম্মান,
মহান্ জাতীয় সত্ব ভিক্ষা দি'ছ তুমি
ভুলিব না সেই আত্ম অধিকার জ্ঞান,
'স্বর্গাদপি গরীয়সী' প্রিয় জন্মভূমি।
নহে যোগ্য পূর্ণ প্রাণ বিনিময় তার
পুণ্যযোগ গত বর্ষ, জীবনে আমার!"

কবি গোবিন্দদাসের স্বদেশপ্রেম আত্মপ্রচারমূলক ছিল না, ছিল আত্ম-নিবেদনমূলক। "তাঁহার দেশভক্তির কবিতা অদ্বিতীয়—অনবদ্য। জন্মভূমির প্রতি আবাল্য অনুরাগ ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধা পরবর্তী জীবনে তাঁহার প্রাণে প্রবল দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। কবি তাঁহার যৌবনে, জন্মভূমি-বন্দনায় ইহার আভাষ দিয়া গিয়াছেন।

তিনি কপটাচারী ছিলেন না। প্রাণের কথা তিনি সরল ভাষায় সর্বত্রই ব্যক্ত করিয়াছেন।"[২১৮] যথা—

"কুটীর নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
জনমে পুরেনি আশা,
পাই নাই ভালবাসা,
নাহি মোর পুত্র-কন্যা ভাই বন্ধু নারী,
পথের কাঙ্গাল আমি দরিদ্র ভিখারী।
তথাপি জনমভূমি আছিলে আমার
ভার্য্যা সমা অতি প্রিয়,
মাতৃসমা অদ্বিতীয়
পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার,
স্নেহের পবিত্র মূর্ত্তি কন্যা করুণার"।

* * * *

প্রাণের গভীর এই ভক্তি, প্রেম, স্নেহ,
সালান্থ পল্লীতে বাস,
করিয়াছি বার মাস,
গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ?
শত মুখে বাগ্মীবেশে
বলি নাই দেশে দেশে
তোমারে করেছি যত ভক্তি, প্রেম, স্নেহ
স্বদেশ-হিতৈষী বলি নাহি জানে কেহ।"

—কবি 'শতমুখে বাগ্মীবেশে' প্রচার করিতে পারেন নাই বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'স্বদেশ-হিতৈষী' বলিয়া জানেন না ; কারণ নীরব-

২১৮. হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—'স্বভাবকবি গোবিন্দদাস', পৃঃ ২৭৪।

কর্মী হিসাবে তিনি গোপনে স্বদেশকে ভালবাসিয়াছেন। তাঁহার দেশাত্মবোধ নৈষ্ঠিক ভক্তের আত্মনিবেদনের মত—

"পাঁচটি বছর যায়, যদিও দেখি না তায়
যদিও অনেক দূরে আছি ব্যবধান,
তথাপি করেছি পণ, এই রক্ত এ জীবন,
সাধিতে তাহারি হিত তাহারি কল্যাণ ;
আমি তার নির্বাসিত অধম সন্তান।"[২১৯]

কবি স্বদেশের জন্য তাঁহার জীবনকে পণ রাখিয়াছিলেন, অস্থি-রক্ত-মাংস-মজ্জা সহ ভালবাসিয়াছিলেন। কারণ 'সাধিতে তাহারি হিত তাহারি কল্যাণ', আর এই সাধন-যজ্ঞে কল্যাণ-স্পর্শের জন্য প্রয়োজন সবার মিলিত শক্তি। কবি তাই বলেন—

"এস ভাই ভিন্নভাব করি পরিহার,
শুধু এই মহাপাপে, জননীর অভিশাপে,
নয়নের অশ্রুজল ঘোচে না কাহার,
শুধু এই ভ্রাতৃভেদে, দুঃখিনী জননী খেদে
জীবনে পড়িয়ে আছ মৃতের আকার,
শুধু এ পাপের জন্য, অঙ্গ বঙ্গ অচৈতন্য,
বীর জাতি বীরভূমি রাজপুতনার,
শুধু এ পাপের জন্য দুর্দশা সবার।"

---

২১৯. তুলনীয় :—

"মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে।
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক প্রাণ, যাক প্রাণ—মা আমার, মা আমার।"
—কামিনী রায় : 'মা আমার'।

কবি গোবিন্দদাস কোন সম্প্রদায়ের কবি নন—মানব জাতির কবি, তাই জাতির কলঙ্ক-মোচনের জন্য তিনি সকলকে লইয়া জীবনযজ্ঞের শেষ পূর্ণাহুতি দিতে চাহিয়াছিলেন। কবি তাই জীবন-রথের সারথিকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"আবার লইয়া রথ, উজলিয়ে এ ভারত
যদি হে আসিলে জগন্নাথ,
কিন্তু কেন রথ খালি, হে কৃষ্ণ, হে বনমালী,
কোথা সে অর্জ্জুন তব সাথ ?
কোথা রাজা যুধিষ্ঠির, কোথা বৃকোদর বীর
সহোদর কোথা সে নকুল,
আজিও অজ্ঞাতবাস, আজো বিরাটের দাস,
আজিও কি ভাঙ্গে নাই ভুল ?
কোথা বীর ধনঞ্জয়, রহিয়াছে এ সময়
কেন সে হয় না আগুসার,
ক্লীব কাপুরুষ বেশে, ঘৃণিত দাসত্ব ক্লেশে,
জীবন যাপিবে কত আর ?"

—জীবনের সার্থকতা জীবন-ধর্মে। সেই ধর্ম—মানবধর্ম। আর মানব-ধর্ম বাঁচিয়া থাকে সমাজ-ধর্মে। এই সমাজের উন্নতিই দেশের উন্নতি, দেশের শ্রীবৃদ্ধি। কবির "দুর্গোৎসব", নিরন্ন কবি", "বসন্ত পূর্ণিমা," "তাড়কার বন", "জন্মাষ্টমী", "স্বাধীনতা" এবং "স্বদেশ" প্রভৃতি কবিতা-গুলিতে এই কথাই বারবার বলা হইয়াছে। কবি তথাকথিত প্রচারধর্মী স্বদেশপ্রেমিকের মত হঠাৎ একদিন স্বদেশকে "মা" বলিয়া মনে করেন নাই, জন্মসূত্রেই মাকে জানিয়াছেন, চিনিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন। জন্মসূত্রের সঙ্গেই যেমন ভাগ্যসূত্র জড়িত থাকে, তেমনি কবির জীবনের সঙ্গে যুক্ত আছে স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতা।

(৫) বিদ্রূপ-রসাত্মক কবিতাঃ—

কবি গোবিন্দদাসের বিদ্রূপাত্মক ও রসাত্মক কবিতাগুলি "Stoical Satire" পর্যায়ের। অত্যাচার, অনাচার, ব্যভিচার, অসাম্য ও পাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এই পর্যায়ের কবিতার বিষয়বস্তু। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে এই পর্যায়ের বহু কবিতার নিদর্শন মেলে। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপ-রসাত্মক রচনা "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা", [২২০] "রুচি বিকার" প্রভৃতি অপেক্ষাও কবি গোবিন্দদাসের "মগের মুলুক", "বিক্রমপুরে বসন্ত" এবং "বিচিত্রপুর" প্রভৃতি বিদ্রূপ-রসাত্মক কবিতাগুলি আরও বেশী উত্তেজক ও হৃদয়বিদারক কবিতা। আর এই সব কবিতায় পাশ্চাত্ত্য কবিদের প্রভাব বা ছায়া পড়ায় সবাই বিস্মিত। অভিমান-ক্ষুব্ধ কবির বক্তব্য—

"বিশাল জগৎ মাঝে দয়া মায়া নাহি সাজে ?
শুধু কি শাস্তির দাতা তুমি ভগবান !
দিন যায় মাস যায় যুগে যুগে হায় হায়,
নাই কি ব্যথার শেষ, নাই সমাধান ?
তোমার এ অবহেলা, পণ্ডিতেরা কয় লীলা !
আমি শুধু জানি এ যে ক্ষুধার জ্বলন।
হও তুমি লীলাময় তাতে নাহি বৃদ্ধিক্ষয়
আমি শুনি ছাওয়ালের ক্ষুধার কাঁদন !"

---

২২০. হুতোম প্যাঁচার নক্‌সাঃ—কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) ছদ্ম-নামে "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা" লিখিয়া একদিনেই বাংলা সাহিত্যে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম খণ্ড ১৮৬২ সালে এবং দুই ভাগ একত্রে ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। হুতোমের বিদ্রূপাত্মক ভূমিকাটিই প্রধান। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সাধুভাষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও অগোগোড়া কলিকাতার চলতি বুলিতে গ্রন্থ লিখিয়া নিপুণ ও তীক্ষ্ণ ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। এক কথায়, কালী-

এই ছত্র কয়টি আমাদের স্মরণ করাইয়া দিবে শেলীর "Queen Mab"-এর Ahasuers-এর আর্তনাদ—"God Omnipotent,

Is there no misery ? must our punishment
Be endless ? Will long ages roll away,
And see no term ? Oh ! wherefore has
thou made
In mockery and worth this evil earth ?

আবার যখন স্বভাবকবি বলেন—

"শক্তির স্বেচ্ছাচার, দেশজুড়ে অত্যাচার
যারে ধরে একেবারে দেয় গুড়া করে !
তোষামোদ ঘৃণা করি, হুজুরের মোহর-কড়ি
মানুষেরে কিনে নিয়ে অমানুষ করে ॥
বিবেকের কথাগুলি দিতে হয় জলাঞ্জলি
ক্ষমতার পায়ে যবে নিজেরে বিকায় ।
পরিব না ছোট হ'তে না থাকিলাম দুধে ভাতে
পারিব না সম্মানেরে তুলিতে শিকায় ॥"

কবি গোবিন্দদাস সারা জীবন 'শক্তির স্বেচ্ছাচার' এবং "দেশজুড়ে অত্যাচারে"র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন ; মানুষকে অমানুষ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছেন ; ক্ষোভে বা প্রলোভনে অথবা ভয়ে 'বিবেকের কথাগুলি জলাঞ্জলি' দিতে পারেন নাই। এইখানেই তাঁহার সম্মান, এইখানেই তাঁহার জয়। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে শেলীর বাণী—

প্রসন্ন সিংহের বিদ্রূপ-রসাত্মক গ্রন্থ "হুতোম প্যাঁচার নকসা" বাংলা সাহিত্যে অসামান্য কীর্তি বলিয়া গৃহীত হইবে।

"Power, like desslating pestilence,
Pollutes whate'er it touches; and obedience,
Bane of all genius, virtues, freedom, truth
Makes slaves of men, and of the human
frame
A mechanized automation.

শেলী তাঁহার "Song—To the men of England" কবিতায় লিখিয়াছেন—

"Men of England, wherefore plough
For the Lords who lay ye low ?"
Wherefore weave with toil and care
To rich robes your tyrant wear ?"

আর কবি গোবিন্দদাসের গান—

"কাহার তরে চাষ কর ভাই
কাহার তরে চাষ ?
যে জমিদার সর্বনাশা
তাহার তরে চাষ ?
তাঁত বুনেছিস কাহার জন্য ?—
কাড়ছে যেজন গ্রাসের অন্ন ?
ফরাসডাঙ্গা ঢাকাই পরে'
যারা তোমায় ফকির করে,
তাদের জন্য কাপড় বুনিস্
আমরা তাঁতি ভাই !"

১৩১৮ সালে বৈশাখ মাসে "ঢাকা রিভিউ" পত্রিকায় তাঁহার "পদ্ম" শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহাও ব্যঙ্গ কবিতা। এই সম্পর্কে

"প্রবাসী" লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "পদ্ম" কবিতায় স্বভাবকবির মাধুর্য ও সারল্য নাই এবং তাঁহার স্বকীয় বিশেষত্ব দান্তরায়ীভাবে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ছদ্মবেশী 'পদ্ম'-কে উপলক্ষ্য করিয়া কবি কোন ছদ্মবেশী মানুষকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।" "প্রবাসী" ঠিকই বলিয়াছেন। কবি তদানীন্তন ভাওয়াল রাজ্যের জনৈক কর্মচারীর উদ্দেশ্যেই এই বিদ্রূপ-রসাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার "বিক্রমপুরে বসন্ত", "বিচিত্রপুর এবং "মগের মুলুক"—এইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে ভরা রসাত্মক কবিতা এবং নামেই ইহার উদ্দেশ্য প্রতিফলিত। এই গ্রন্থের "দ্বিতীয় খণ্ডে" কাব্য-গুলি পাঠ করিলেই বোঝা যাইবে যে, গোবিন্দচন্দ্র দরিদ্র ব্যক্তি তাহাতে পূর্ববঙ্গবাসী, এজন্য এক শ্রেণীর হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি রুচি ধরিয়া গোবিন্দচন্দ্রকে কাব্য-জগৎ হইতে অপসৃত করিবার চেষ্টায় আছেন। রবীন্দ্রনাথের রুচি ধরিয়া ভয়ে কেহ কথা বলিতে সাহসী হন না; কিন্তু দরিদ্র গোবিন্দদাসকে লইয়া কেহ কেহ বড়ই মাথা ঘুরাইতেছেন। গোবিন্দচন্দ্র মনের কথা লেখেন, প্রাণ-খোলা, ভাব-খোলা,—কোন ভাব তিনি মানেন না, উপদেশের কথা শুনেন না। এ বড় বিষম দায়! * * * ফুল ফোটে, চাঁদ হাসে, পাখী গায়, সাগর গর্জন করে, কাহারও কথা মানে না। কবি সেই তানে যখন তান মিশাইয়া জগতের উপরে উঠেন, তখন তিনি কেন জগতের কথা শুনিবেন? গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীন স্বভাব-কবি"। (নব্যভারত)।

(৬) নানা বিষয়ক কবিতা :—

স্বভাবকবি গোবিন্দদাস বিভিন্ন বিষয়ের উপর কবিতা লিখিয়া-ছিলেন। এই সব "কবিতার মধ্যে বাঙ্গালী রমণীর চিত্র, বাঙ্গালীর পল্লী-জীবনের নিখুঁত ছবি, তাঁহার হাতে অত্যন্ত খাঁটিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নৈসর্গিক দৃশ্যেও কবি গোবিন্দদাস আত্মহারা, তিনি যেন সৌন্দর্যের আত্মবিস্মৃত উপাসক। একটি 'ঝিঙ্গা ফুল', দুইটি

'গোদাজামের গাছ'; 'আসন্ন সন্ধ্যা'; 'নির্জন নদীতীর'; 'সন্ধ্যায় শূন্যমাঠ'; 'নদীতটের শ্মশান'; ভাওয়ালের গজারী বন;* ক্ষুদ্রতোয়া ভিলাই নদী; পদ্মার বিশাল দৃশ্য দেখিয়া কবির প্রাণের ভিতর যে সুর বাজে, তাহাতে কৃত্রিমতা নাই।"[২২১]

কবি গোবিন্দদাসের বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার মধ্যে আছে (১) প্রার্থনা ও নির্ভর বিষয়ক কবিতা; যেমন—'বেদমন্ত্র', 'প্রণাম' ইত্যাদি। (২) প্রেম ও মৃত্যু বিষয়ক কবিতা; যেমন—'মা-মরা মেয়ে', 'শ্মশানে সম্ভাষণ', 'শরতের মা' প্রভৃতি। শেলীর 'Death' শীর্ষক বিখ্যাত কবিতার "Misery, my sweetest friend—Oh! weep no more!" ছত্রের প্রতিধ্বনির মতো শোনায় শোকভার-জর্জরিত স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের আর্তনাদ—

"আর্তনাদ হাহাকার চিরসাথী যে আমার,
দুঃখ, শোক—দুই বন্ধু মোর!
যাবার সময় এলো স্তব্ধ হ'বে কোলাহল,
এখন থামুক কাঁদা তোর।"

কবি স্বদেশের জন্য সারাজীবন 'আর্তনাদে হাহাকার' করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশ ও সমাজ লইয়াই তাঁহার আত্মবিলাপ। তাই (৩) "স্বদেশ-বিষয়ক" কবিতায় পাওয়া যায় 'বসন্ত পূর্ণিমা', 'সৌরভ', 'নির্বাসিতের আবেদন', 'আমার চিতায় দিবে মঠ' প্রভৃতি।

কবি, ধর্ম-ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি খাঁটি হিন্দু ছিলেন এবং বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি কাহারও অনুকরণ বা অনুসরণ করেন নাই। স্বকীয় প্রতিভায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা "কালের কপোলতলে শুভ্র ও সমুজ্জ্বল" হইয়া থাকিবে। কবি নবীনচন্দ্র সেনের

---

* গজারী—পূর্ববঙ্গে শালবৃক্ষ গজারী নামে পরিচিত।

২২১. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী: স্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ২৯৯-৩০০।

পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভাব-ভাষা অপহরণ করেন নাই। তবে তাঁহার (৪) "পূজা-উৎসব বিষয়ক" কবিতাগুলির মধ্যে "দুর্গোৎসব" কবিতাটি নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে"র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। যেমন—

> "ভারতে শারদ-শুক্লা ষষ্ঠী নিশি শেষ,
> ধীরে ধীরে তারাগুলি লুকাইলে সব,
> দম্পতী নয়নে আছে ঘুমের আবেশে,
> ডাকেনি এখনো পাখী প্রকৃতি নীরব!
> কেন আজি শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর মহারোল
> কাঁপাইয়া ভারতের প্রদোষ অম্বর
> মুহূর্তে,—প্রকৃতি সুপ্ত—ভীম গণ্ডগোলে
> জাগাইল? কি আনন্দে প্রমত্ত অন্তর?
> কি আনন্দ সঞ্চারিল বাঙ্গালীর ঘরে
> হৃদয়ে উন্মাদ রক্ত আছাড়িয়া পড়ে!"

কবির 'দুর্গোৎসব' ছাড়াও 'সারস্বত উৎসব', 'নববর্ষ', 'ভাওয়ালে ভাইফোঁটা', 'ভাওয়ালে বিজয়া' প্রভৃতি কবিতাগুলি তৎকালীন সমাজ-জীবনের এক সুদৃশ্য এ্যালবাম্!

অনেকে বলেন, কবি গোবিন্দদাসের সঙ্গে স্কট্‌ল্যাণ্ডের কবি বার্ণস (Robert Burns)-এর সাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদেরও অভিমত সমালোচকদের পক্ষে। উভয়েই প্রেমের কবি, উভয়েই গ্রাম্য-কবি। তবে বার্ণস্ 'কৃষক কবি' নামে পরিচিত এবং গোবিন্দদাস ময়মনসিংহের সারস্বত কবি হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। উভয়ের গীতি-কবিতাগুলির ভাব-ভাষা-ভঙ্গী সহজ-সরল-স্পষ্ট-সাবলীল। উভয়েই স্বাভাবিক কবিত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কবি হওয়াই যেন উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। "মনে হয়, প্রতীচ্যের

পরলোকগত বার্নস যেন প্রাচ্যের এই গোবিন্দদাসে প্রকটিত। কবিতার ভাবে-মাধুর্যে-সরলতায়-ঝঙ্কারে দুইজনেই এক পর্যায়ের। দুইজনেই অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীকুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীন বনবিহঙ্গের মত সুস্বর লহরীতে এককালে সমগ্র দেশকে মাতাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু বার্নস্ প্রতীচ্যে যে সম্মান লাভ করিয়াছেন, গোবিন্দদাসের নিকট তাহা সুদূরপরাহত! আশ্চর্য!"[২২২]

———

২২২. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী :—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ৩০১-৩০২।

॥ কবি গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ কবিতার নাম ও রচনাকাল ॥

স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার নির্বাচন সহজ-সাধ্য নয়। এই সম্পর্কে 'নানা মুনির নানা মত'। বিভিন্ন মতের ও পথের সমন্বয় সাধন করিয়া এবং সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীর যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কবির কিছু শ্রেষ্ঠ কবিতার নাম ও রচনাকাল পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করিলাম। (সম্পূর্ণ রচনাবলী 'দ্বিতীয় খণ্ডে')।

(১) প্রার্থনা ও নির্ভর ঃ

১। বেদমন্ত্র—১৩১৬।
২। জয় জগদীশ্বর—১৩২৪।
৩। আমি তোমার—১২৮৬।
৪। কে আছে আমার—১২৯৩।
৫। কোথায় যাই—১২৯৫।
৬। পাপ-পুণ্য—১২৯৭।
৭। দিন ফুরায়ে যায়—১৩২২।
৮। কেন বাঁচালে আমায়—১৩২২।
৯। ধ্বংসের পথে—১৩০৯।
১০। কর্তব্য—১৩১০।

(২) স্বদেশ—স্বরাষ্ট্র—সমাজ—আত্মবিলাপ ঃ

১১। মৃত্যুশয্যায়—১২৯০।
১২। বসন্ত-পূর্ণিমা—১২৯১।
১৩। প্রতিহিংসা—১২৯৯।
১৪। নির্বাসিতের আবেদন—১৩০২।
১৫। কংগ্রেস—১৩০৩।
১৬। বাঙ্গালী—১৩০৩।

১৭। আমরা হরিহর—১৩১২।

১৮। স্বদেশ—১৩১৪।

১৯। তাড়কার বন—১৩১৫।

২০। আমার চিতায় দিবে মঠ—১৩১৮।

২১। থাকুক আমার বিয়া—১৩১৮।

২২। আমার বাড়ী—১৩২০।

২৩। হিন্দু-মুসলমান—১৩২০।

২৪। সৌরভ—১৩২৪।

২৫। অসুরপূজা—১৩২৫।

(৩) প্রেম ও মৃত্যু ঃ

২৬। দুখিনী—১২৯০।

২৭। সারদাসুন্দরী—১২৯২।

২৮। আত্মহত্যা—১২৯২।

২৯। জগচ্চন্দ্র দাস—১২৯৪।

৩০। তোমারে কেবল—১২৯৫।

৩১। শ্মশানে সম্ভাষণ—১২৯৫।

৩২। শরতের মা—১২৯৬।

৩৩। অতুলচন্দ্র—১৩০০।

(৪) পূজা ও উৎসব ঃ

৩৪। নববর্ষ—১২৯১।

৩৫। নববর্ষ—১২৯১।

৩৬। সারস্বত উৎসব—১২৯৮।

৩৭। কার্তিক পূজা—১৩০১।

৩৮। পূজা দেখা—১৩০৫।

৩৯। জগন্নাথের রথযাত্রা—১৩১৫।

(৫) প্রেম-প্রীতি-প্রণয় ঃ

৪০। এই এক নূতন খেলা—১২৭৯।

৪১। মদনের দিগ্বিজয়—১২৮৫।

৪২। কি দিবে ?—১২৯৩।

৪৩। দেখিলাম কই ?—১২৯৩।

৪৪। প্রেমোন্মীলন—১২৯৩।

৪৫। আমি দিব ভালবাসা—১২৯৪।

৪৬। ছুঁয়ো না—১২৯৪।

৪৭। আমরা—১২৯৫।

৪৮। সখী—১২৯৫।

৪৯। চন্দ্র—১২৯৫।

৫০। রমণীর মন—১২৯৫।

৫১। উলঙ্গ রমণী—১২৯৭।

৫২। পরনারী—১২৯৭।

৫৩। আমারি যে দোষ—১২৯৭।

৫৪। আমারি কি দোষ—১২৯৭।

৫৫। দেখিবে কি আর ?—১২৯৮।

৫৬। কে বেশি সুন্দর—১২৯৮।

৫৭। আমার ভালবাসা—১৩০১।

৫৮। সে কেমন ?—১৩০১।

৫৯। বলিকার বাণিজ্য—১৩০২।

৬০। সরলা—১৩০২।

৬১। শক্র—১৩০৩।

৬২। বালিকার খেলা—১৩০৩।

৬৩। বুঝিতে নাহি চায়—১৩০৩।

৬৪। দেখিলে তারে—১৩০৩।

৬৫। সে বুঝেছে ভুল—১৩০৩।

৬৬। নৃসিংহ—১৩১০।

৬৭। কান্না অভিমান—১৩১০।

৬৮। তুমি না থাকিলে—১৩১২।

৬৯। কবে মানুষ মরে গেছে—১৩১৭।

(৬) ব্যঙ্গ—বিদ্রূপ—কৌতুক ঃ

৭০। বালিকার প্রেম—১২৮৫।

৭১। কেহ কারো নয়—১২৯২।

৭২। প্রণয়—১২৯৫।

৭৩। কলঙ্ক—১২৯৫।

৭৪। রমণী—১২৯৫।

৭৫। নারীর প্রাণ—১২৯৬।

৭৬। আমার দেবতা—১২৯৬।

৭৭। সামান্য নারী—১২৯৬।

৭৮। রমণীর প্রেম—১২৯৬।

(৭) বিবিধ কবিতা ঃ

৭৯। নিমন্ত্রণ—১২৯২।

৮০। বিক্রমপুর—১৩০০।

৮১। ভাওয়াল—(৬)—১৩০১।

৮২। ভাওয়ালে বিজয়া—১৩০২।

৮৩। ভাওয়ালে ভাইফোঁটা—১৩০২।

৮৪। কালীয় দমন—১৩০২।

৮৫। ফিরে যাই—১৩০৩।

৮৬। আমি ও সে—১৩০৭।

৮৭। জগৎকিশোর—১৩১০।

৮৮। জিতেন্দ্রকিশোর—১৩১০।

৮৯। স্বাধীনতা—১৩১৬।

৯০। পিপড়া—১৩১৭।

৯১। একলা নিতাই—১৩১৮।

৯২। বজ্র পেলে কই—১৩১৮।

৯৩। পুংসবন—১৩২১।

৯৪। তৃণ—১৩২১।

পরিশিষ্ট—খ

॥ কবি-জীবনের স্মরণীয় জীবনপঞ্জী ॥

(১) স্বভাবকবি গোবিন্দদাস ভাওয়ালের অন্তর্গত জয়দেবপুরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী (৪ঠা মাঘ, ১২৬১ বঙ্গাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতা রামনাথ দাসের মৃত্যু হওয়ায় যে দারিদ্র্যের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে, তাহাই তাঁহার সারা জীবনের নিত্যসঙ্গী হইয়া দাঁড়ায়।

(২) জয়দেবপুর—ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় অবস্থিত। এখানে ভাওয়ালের রাজবাড়ীতে কবি শৈশবে লালিত-পালিত হন; পরবর্তী জীবনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন; আবার রাজমন্ত্রীর প্ররোচনায় ১২৮৪ সালে রাজ-পরিবারের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ ছিন্ন হয়।

(৩) কবি গোবিন্দদাস বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার সময় হইতেই কবিতা রচনা করেন। তখন তাঁহার বয়স তেরো কিংবা চৌদ্দ বৎসর মাত্র। কবির অল্প বয়সে রচনা "প্রসূন" এখন আর পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া, কৈশোরে, আর যে-সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও প্রায় বিলুপ্ত।

(৪) কবির প্রথমা পত্নীর নাম সারদাসুন্দরী, দ্বিতীয়া পত্নীর নাম প্রেমদা। সারদাসুন্দরীর গর্ভে কবির প্রমদা ও মণিকুন্তলা নামে দুইটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর প্রেমদার গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র জীবিত সন্তান —শ্রীযুক্ত হেমরঞ্জন দাস।

(৫) ১২৮৯ সালের শ্রাবণ মাস পর্যন্ত কবি ময়মনসিংহের জমিদার কেশব-চন্দ্রের চাকরি করেন। কিন্তু পরে কেশবচন্দ্রই তাঁহাকে বিতাড়িত করেন। ফলে, ঐ সালের ভাদ্রমাসে কবি ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া জন্মভূমি জয়দেবপুরে চলিয়া আসেন।

(৬) কবির কলিকাতা দর্শনের ইচ্ছা বহুদিনের। সেই সময় অর্থাৎ ১২৮৯ সালে বন্ধুবর দেবেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী মহাশয় তাঁহার মোকর্দমার জন্য কলিকাতায় আসেন। কবিও যথাসময়ে গোয়ালন্দ হইতে রেলগাড়ী-যোগে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। নিমতলার রমানাথ লোহার স্ট্রীটে দেবেন্দ্র

কিশোর বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দদাস তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। এবং প্রায় চারমাস সেখানে অবস্থান করিয়া কলিকাতার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখেন।

(৭) ১২৯২ বঙ্গাব্দ কবির জীবনে এক স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর কবি তাঁহার প্রথমা পত্নী সারদাসুন্দরীকে হারান। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ, রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকায় কবির প্রাণসমা প্রিয়তমার মহাপ্রয়াণ ঘটে।

(৮) ১২৯৩ সালের ৩০শে শ্রাবণ কবির একমাত্র সহোদর জগচ্চন্দ্র দাস নিদারুণ যক্ষ্মারোগে মারা যান। জগচ্চন্দ্র ময়মনসিংহে "সাহিত্য সমিতি"র তত্ত্বাবধায়কের কার্য করিতেন। তিনি নির্ভীক গোবিন্দদাসের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

(৯) ১২৯৫ সালের পৌষ মাসে কবি একবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর তখন রাজা ছিলেন। সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় কবি অবস্থান করিতেন। কবি এই সময়কার বর্ণনা দিয়া বলিয়াছেন—"বিষ্ণুবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নিতম্বিনী চট্টোপাধ্যায়ের আদর-যত্নে অতি সুখে ছিলাম। আগরতলার পাহাড়ে ও মণিপুরী পল্লীতে গিয়া বেড়াইয়া দেখিয়াছি। 'চম্পামুড়া' কবিতা 'চম্পামুড়া' দেখিয়াই লিখিয়াছিলাম। 'ফুলরেণু'তে ছাপা হইয়াছে।"

(১০) ১২৯৫ সালের শেষভাগে কবি গোবিন্দদাস বারাণসী, গয়া, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্যটন করিয়া আসিয়াছিলেন। ৺হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কৃপায় এই সুযোগ ঘটিয়াছিল।

(১১) কবি গোবিন্দদাসের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-কাব্য "মগের মুলুক" ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ১৩ই চৈত্র (১৮৯৩ খ্রীঃ, ২৫শে মার্চ) প্রকাশিত হইলে কবির নাম সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মুদ্রিত পুস্তিকাগুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই "মগের মুলুক" প্রকাশের জন্য ভাওয়ালের রাজমন্ত্রী কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'প্রকৃতি'-সম্পাদকের নামে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে যে মামলা দায়ের করিয়াছিলেন, তাহা শেষ পর্যন্ত আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যায়। প্রচলিত আছে যে, এই মামলা নিষ্পত্তির জন্য সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র মহাশয় কালীপ্রসন্ন ঘোষকে পত্র লিখিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, "মগের

মুলুক” প্রকাশের জন্য ‘প্রকৃতি’র সম্পাদককে ক্ষমা প্রার্থনা-সহ ঘোষ মহাশয়কে আট হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

(১২) ১৩০০ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাব ঘটে—“সায়াহ্ন—ছাব্বিশে চৈত্র, তেরশত সন।” তাঁহার তিরোধানের পর গোবিন্দদাসের রচিত কবিতা সাহিত্যসম্রাটের স্তুতিগানে সার্থকতা লাভ করে। যথা—

“প্রতিভার দীপ্ত রবি, বাঙ্গালীর মহাকবি,
কেন অস্ত যাও আজ অগস্ত্য গমনে ?
ঢালিয়া আঁধার ঘন ভাষা-ফুলবনে ?”

(১৩) কবি গোবিন্দদাস, বিক্রমপুরের কেবল যে নিন্দাই করিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, যশঃ-কীর্তনও করিয়াছেন। ১৩০০ সালে তিনি “বিক্রমপুর” নামক কবিতায় বিক্রমপুরের অতীত কীর্তিকাহিনী ও লুপ্ত মহিমার কথা উদাত্ত সুরে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু “বিক্রমপুরে বসন্ত” কবিতার উদ্দেশ্য কবিপত্নীর পিতামহীকে সংযত করা।

(১৪) ১৩০২ সালে কবির তৃতীয় গীতিকাব্য “কস্তুরী” প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হইয়াছে। এই কাব্যেও কবি “কোথা বাড়ী কোথা ঘর, কি শুধাও ভাই ?” বলিয়া বিলাপ করিয়াছেন। তাহা ছাড়াও, এই কাব্যে ভাওয়ালের অধঃপতনের কারণ এবং তাঁহার নির্বাসনদণ্ডের কথা ইঙ্গিতে বোঝানো হইয়াছে।

(১৫) ১৩০৩ সালে কবির রচিত ‘নির্বাসিতের আবেদন’ কবিতাটি “চন্দন” নামক গীতিকাব্যে প্রকাশিত হয়। কাব্যটিতে সমগ্র দেশবাসীর নিকট নির্বাসিত কবির আবেদন, বেদনা ও প্রার্থনা ধ্বনিত হইয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেশবাসী কবির কাতর প্রার্থনা ও আবেদনে সাড়া দেয় নাই—‘সত্য সেলুকস! কি বিচিত্র এই দেশ!’

(১৬) ১৩১১ সালে কবি একটি কবিতা মুদ্রিত করিয়া তাহা বাঁধাইয়া গৃহে টাঙ্গাইয়া রাখেন; উদ্দেশ্য—তাঁহার সন্তানগণের ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে সুগঠিত হয়। তাহা ছাড়া, কবিতাটিতে কবির ধর্মমত ও চরিত্রের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে। যথা—

পরিশিষ্ট—খ

"শ্রীহরি শ্রীবিষ্ণু ভগবান্
দীনবন্ধু করুণা-নিধান
এ গৃহের গৃহী তিনি, এ বিশ্ব-মন্দিরে যিনি,
সর্বত্র করেন অধিষ্ঠান!
তাঁর পূজা তাঁর অর্চ্চনায়
অবিচল ভকতি শ্রদ্ধায়,
রহ রত সেবক-সন্তান,
ধনে জ্ঞানে লক্ষ্মী সরস্বতী,
হেথা সদা করিবে বসতি,
লাভ হবে সৌভাগ্য-সম্মান।

অনাথ আতুর অন্ধজনে
কাঙ্গাল বৈষ্ণব ভিক্ষুগণে,
যথাশক্তি করিও প্রদান,
শোকে দুঃখে জ্বলে যার হিয়া,
সান্ত্বনা প্রবোধ তারে দিয়া,
তার শোকে করিও নির্বাণ!

যে কেহ আসিবে এই দ্বারে,
বিমুখ ক'র না কভু তারে
সবে স্নেহ রাখিও সমান,
সর্বভূতে সম দয়া যার,
শত্রু মিত্রে সম ব্যবহার,
কৃষ্ণ তার করেন কল্যাণ!

পরহিংসা পরনিন্দা পাপ,
ঘটে তাহে মহা পরিতাপ,
এ গৃহে পায় না যেন স্থান!
কাহারো ক'রনা অপকার,
বিপন্নেরে করিও উদ্ধার,
তাহে হন তুষ্ট ভগবান্।

সকলের দর্প অহঙ্কার,
দর্পহারী করেন সংহার,
গৌরবে হয়োনা হতজ্ঞান।
বিনয়ে থাকিও অবনত,
নিজ নিন্দা শুনি শত শত,
ভুলেও দিও না তাহে কান।

অধর্মের বিনাশ নিশ্চয়,
ধর্মের নিশ্চয় হয় জয়,
সদা ধর্মে থেকো আস্থাবান্,
ঢেউসম পাপের উন্নতি,
পুণ্যের নাহিক অধোগতি
চির দৃঢ় গিরি গরীয়ান্।

এই গৃহ—এই দেবালয়,
সতত পবিত্র যেন রয়,
পাতকে ক'রনা কভু ম্লান,
সৎ কথা সৎ আলাপনে
হরিনাম কীর্তনে শ্রবণে,
সে আসে, জুড়ায় যেন প্রাণ।"

(১৭) ১৩১২ সালে কবি 'কি কঠিন' নামক একটি কবিতা লেখেন। "বৈজয়ন্তী"-কাব্যে তাহা মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার একস্থানে আছে—

"মুহূর্ত্ত করেছি ভুল অতি সূক্ষ্ম একচুল!
এখন জীবনব্যাপী এত হাহাকার।
যদিও বুঝিয়া আজ, শুধু ঘৃণা শুধু লাজ
দিবানিশি অনুতাপ পরিতাপ সার।"

ইহার মূলে পত্নী সারদাসুন্দরীর মৃত্যুর প্রভাব পড়িয়াছে কি না কে জানে?

(১৮) ১৩১৬ সালে ৬ই বৈশাখ ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় রক্তামাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য দার্জ্জিলিং-এ

গমন করেন এবং সেখানে হঠাৎ ২৫শে বৈশাখ রাত্রিকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার তিরোধান উপলক্ষ্যে কবি "শোকগাথা" নামে যে কবিতাটি লেখেন, তাহাই ঐ সালে "শোক ও সান্ত্বনা" নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়।

(১৯) ১৩১৭ সালে ভাওয়াল রাজপরিবারে আবার ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ "ভাওয়ালের বড় কুমার" রণেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় অকালে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু ভাওয়ালের পক্ষে এক মর্মান্তিক ঘটনা। ইতিপূর্বে মধ্যমকুমার গত হইয়াছেন, এখন জ্যেষ্ঠ কুমার গেলেন। বাকী রইলেন শুধু সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনারায়ণ রায়। ইঁহারা তিনজনই অল্পবয়স্ক যুবক ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস বড় রাজকুমারের মৃত্যুতে যে "শোকোচ্ছ্বাস" লিখিলেন, তাহা ১৩১৭ সালে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

(২০) ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "নব্যভারতে" 'আমার চিতায় দিবে মঠ' নামক কবিতা প্রকাশিত হয়। রোগে-শোকে-অনাহারে-স্বল্পাহারে মৃতপ্রায় কবি সাশ্রুনয়নে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই করুণ ও মর্মস্পর্শী—

"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে—
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?
আজ যে আমি উপোস্ করি, না খেয়ে শুকায়ে মরি ;
হাহাকারে দিবানিশি ক্ষুধায় করি ছট্‌ফট্
ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মলে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?" ইত্যাদি

(২১) ১৩২২ সালে কবি আরোগ্যান্তে "কেন বাঁচালে আমায়" শীর্ষক যে কবিতাটি লেখেন, তাহা 'সৌরভ' পত্রিকায় কার্তিক-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি হৃদয়বিদারক—

"কেন বাঁচালে আমায় ?
আমি ভেবেছিনু হরি, এবার করুণা করি
ঘুচাইবে অভাগার এ ভবের দায়,
যত দুঃখ যত ক্লেশ, সকল হইবে শেষ
কাঁদিতে হবে না আর ব্যথা বেদনায় !

আমি ত ভাবিনি রোগ, ভেবেছি মাহেন্দ্রযোগ,
তিলে তিলে পলে পলে আশায় আশায়,
ভেবেছি মরণ মাঝি, লইতে আসিবে আজি,
অচিরে ভেটিব গিয়ে তব রাঙ্গা পায়!"

(২২) ১৩২৫ সালে কবির "মরণ-মাঝি" কবিকে পার করিবার জন্য আসিলেন। ১৩ই আশ্বিন (১৩২৫) শেষ রাতে ৫টা ১৫মিঃ সময় সারাজীবনের অবহেলিত কবি অবহেলিত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঢাকার শ্যামপুর শ্মশানে কবির পঞ্চভূতে গড়া দেহ পঞ্চভূতেই মিলিয়া গেল।

পরিশিষ্ট—গ

।। কবির স্মৃতিবহ পত্রাবলী ।।

কবি গোবিন্দদাস যে-সব চিঠিপত্রাদি লিখিয়াছেন, তাহা পত্রসাহিত্যের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস। তাঁহার চিঠিগুলি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক, কিন্তু সামাজিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত। এখানে আমরা কবি-জীবনের স্মৃতিবহ কয়েকটি পত্রের উল্লেখ করিতেছি।—

(১) ১৩১৮ সালে ৭ই ভাদ্র কবি একটি পত্রে লিখিয়াছেন, "আমার জীবনে বিশেষত্ব কিছুই নাই। সংসারে অনন্ত অসংখ্য অকর্মণ্য জীবন কালসাগরে বহিয়া চলিয়াছে। কে তাহার খোঁজ লয়? তাহার উদ্দেশ্য কি ভগবান জানেন; কিন্তু তেমন নিরুদ্দেশ্য জীবন-কাহিনী শুনিতে কেহ আগ্রহ করে না। তবে আমার*** ক্ষুদ্র জীবনের সহিত বাঙ্গালার একটা মস্ত সাগর-জীবনের যোগ আছে, * * *। আমার জীবন-কাহিনী অতি সামান্য হইলেও লোকে শুনিলে শুনিতে পারে ***। সাগর-সঙ্গম তীর্থ নহে কি? বালীর কথা ছাড়িয়া দিয়া রাবণের দিগ্বিজয় পড়িলে অসম্পূর্ণ রহে না কি?"

—পত্রখানি কবি-জীবনের দিশারী। পত্রখানি পড়িলে কবি অক্ষয়কুমারের কথা মনে পড়ে—

পরিশিষ্ট—গ

"নহে কোন ধনী, নহে কোন বীর,
নহে কোন কর্ম্মী—গর্বোন্নত শির,
কোন মহারাজ নহে পৃথিবীর,
নাহি প্রতিমূর্ত্তি ছবি ;
তবু কাঁদ কাঁদ, জন্মভূমির
সে এক দরিদ্র কবি।"

—বলা বাহুল্য, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে কবির খুব বন্ধুত্ব ছিল। কবির মতে, তাঁহার মত "পরমাত্মীয় অকপট সুহৃৎ" আর কেহই নাই।

(২) ১৩০৭ সালের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত কবি সূর্যকান্ত মহারাজের বেগুনবাড়ীতে চাকরি করেন। চাকরিকালীন একবার প্রজামণ্ডলী বিদ্রোহী হইয়া গোবিন্দদাসকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু কৃপাময়ের কৃপায় রক্ষা পান। গোবিন্দদাস বিদ্রোহী প্রজামণ্ডলীকে দমন করিবার জন্য রাজাকে অনুরোধ জানাইলে, রাজা তাঁহাকে বেগুনবাড়ী হইতে তারাটিতে স্থানান্তরিত করেন। তারাটি কাছারী বেগুনবাড়ী অপেক্ষা ক্ষুদ্র। তাই .তারাটিতে পরিবর্তন কবি তাঁহার কর্মোন্নতির পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গে ১৩১৮ সালে ৭ই ভাদ্র কবি একটি পত্রে লেখেন—"'বেগুনবাড়ী' ৩।৪ বৎসর থাকিবার পর 'তারাটি' কাছারীতে বদলী হই। সেখানে প্রায় বৎসরাধিক কাল কার্য করিয়াছিলাম। শেষে পীড়িত হইয়া বিদায় লই। ছুটির পর আর কাজে যাই নাই।"—কবির এই সময় চাকরি-জীবন অত্যন্ত ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, কোন দিনই কবির চাকরি-জীবন ভাল লাগে নাই। তাই হয়ত ১৩০৩ সালে গোবিন্দদাসের কর্মহীন অবস্থায় কবি অক্ষয়কুমারের প্রচেষ্টায় কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "স্টেটে" কাজ দিতে চাহিলেও কবি কাজ করেন নাই। বোধ হয়, কবির অভিমান ও আত্মসম্মানবোধই কবিকে এই কাজ হইতে বিরত রাখিয়াছিল। 'চাকরি' প্রসঙ্গে কবির একটি উক্তি স্মরণীয়:—"চাকরি চিরকালই আমার নিকট অতি ঘৃণিত ও কষ্টকর বোধ হইয়াছে। অথচ চাকরি ভিন্ন জীবনধারণের অন্য উপায় ছিল না।"

(৩) ১৩১৮ সালে ৭ই ফাল্গুন কবি যে পত্র লেখেন, তাহাতে বোঝা যায় ; কবি আর বেশী দিন বাঁচিবেন না। কারণ ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমারের

মৃত্যু হওয়ায় সাহায্য হইতে বঞ্চিত হওয়া এবং কনিষ্ঠ কুমারের আর্থিক সাহায্য বন্ধ হওয়ায় কবির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে কবি বলেন—"জয়দেবপুরের বড় ও মেজো কুমার মারা যাওয়ায় তাহাদের সাহায্য বন্ধ হইয়াছে। ছোট কুমারের নিজ খরচেই কুলায় না। মাসিক ১১০০ টাকা তিনি পান। তাহা তাঁহার প্রাইভেট্ খরচেই ব্যয় হয়, এজন্য তিনি আমাকে কিছু দিতে পারিতেছেন না বলিয়া জানাইয়াছেন।" বলা বাহুল্য, পত্রটি যত-না বেদনাদায়ক, তাহার চেয়েও বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ।

(৪) ১৩২২ সালে ৫ই-ভাদ্র কবি ঢাকার চিকিৎসালয় হইতে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই বোঝা যায় যে, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে শ্রীমধুসূদন এবং কান্তকবি রজনীকান্ত দাতব্য চিকিৎসালয়ে যেরূপ নিরুপায় হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; কবিরও অবস্থা তদ্রূপ। কবি লিখিয়াছেন—'আমি প্রায় দেড় মাস যাবৎ কার্বঙ্কল রোগে আক্রান্ত হইয়া কাতর আছি। ১লা শ্রাবণ ইহা জয়দেবপুরে কাটাইয়াছিলাম, কিন্তু সেখানেও 'ড্রেস' করার সুবিধা না হওয়ায় ৭ই শ্রাবণ এখানে আসিয়া ভর্তি হইয়াছি।" এই পত্রখানি স্মরণীয় এই জন্য যে, ইহার পর রোগশয্যাশায়ী কবি গোবিন্দদাসের কথা কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। যথা—"বাঙ্গালী" নামক দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্থান পায়—"কবি গোবিন্দদাস রোগশয্যায় হাসপাতালে"।

(৫) ১৩২২ সালে ১৪ই ভাদ্র কবি ঢাকার দাতব্য চিকিৎসালয় হইতে আর একখানি স্মরণীয় পত্র লেখেন—"আগামী কল্য বাড়ী যাইব মনে করিয়াছি। এক মাস আটদিন মিটফোর্ড হস্পিটালে বাস করিয়া আসিয়াছি। হস্পিটালের কর্মচারী, ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়েরা সকলেই আমার প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমাকে একটি ভিন্ন কোঠায় থাকিতে দিয়াছিলেন, খাবার ও বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। হস্‌পিটালে আমি কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা বা কষ্টভোগ করি নাই। ঘা শুকাইলেও শরীর ভাল বোধ হইতেছে না।

* * *

"পদ্মাও এমন ভাঙ্গিতেছে যে, বামনগাঁয় এবারও থাকিতে পারি কি না, তাহার স্থিরতা নাই। *** এ অবস্থায় এই শিশু-সন্তানাদি লইয়া কোথায় যাই, কি করি, ভাবিয়া পাই না। জগদীশ্বর এই শেষকালে সর্বশূন্য করিবার যোগাড়

করিয়াছেন।"—পত্রখানি পড়িলে আধুনিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের যে ঔদাসীন্যের সমালোচনা করা হয়, তাহার একটি ভাল দিকের পরিচয় মেলে। আরও মেলে কবির ঈশ্বরভক্তি ও ধৈর্যশক্তির পরিচয়।

(৬) ১৩২৫ সালে ঢাকা নগরীতে সাহিত্য-সম্মেলন হইয়াছিল সম্মেলনের তারিখ ১৩২৪ সালের ৩০শে চৈত্র এবং ১৩২৫ সালের ১লা বৈশাখ। প্রচলিত মত এই যে, কবি গোবিন্দদাস যথাসময়ে নিমন্ত্রণপত্র পান নাই বলিয়াই সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার বিপরীত মতও শোনা যায়।' তবে সম্মেলনের প্রথম দিনে শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী মহাশয় দাস কবির অনুপস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত তথ্য প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে কবি তাঁহার মৃত্যুর প্রায় এক মাস পূর্বে ১৩২৫ সালে ১২ই ভাদ্র ঢাকা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেই বিষয়টি বোঝা যায়—"ঢাকার সাহিত্য-সম্মেলনে আমার নামে যে বাড়ীতে পত্র গিয়াছিল, তাহা অসময়ে,—সম্মিলনশেষে। আমি তখন ঢাকায় অসুখ ছিল বলিয়া যাইতে পারি নাই।" আসল কথা, কবি আত্মশ্লাঘাকে ঘৃণা করিতেন। তাই ঢাকার বিখ্যাত সাহিত্যিক মহলে যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন। তাহা না হইলে ১৩২৫ সালে সাহিত্য-সম্মেলনে তিনি হয়ত যথাসময়ে আমন্ত্রিত হইতেন।

(৭) ১৩২৫ সালে ৩২শে শ্রাবণ কবি গৌরীপুর পরিত্যাগ করিয়া মুক্তাগাছা গমন করেন। সেইখান হইতে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ভাওয়াল রাজ সরকার হইতে কবির নামে বাকী খাজনার যে নালিশ করা হয়, তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা কবি লিখিয়াছেন—

"ভাওয়ালের জোতজমির খাজনা দিতে পারি নাই বলিয়া রাজসরকার হইতে নালিশ হইয়াছিল। * * * ইহার চিন্তায় ভাবনায় দিনরাত্রি অস্থির আছি। মুক্তাগাছায় যাহা কিছু সাহায্য পাই, তাহার জন্য গতকল্য এখানে আসিয়াছি। দুর্বৎসর বলিয়া ম্যানেজার এখন টাকা দিতে পারিবেন না বলিতেছেন, কিন্তু রাজা হুকুম দিয়াছিলেন। এখন দেখি কি হয়। ম্যানেজার আবার বলিতেছেন ৫।৭ দিন বিলম্ব করিলে কিছু দিতে পারিব কি না তাহাও নিশ্চয় বলিতে পারি না। অথচ এই টাকা না পাইলে নিশ্চয় নিলাম হইয়া যাইবে। কি উপায় করিব ভাবিয়া পাই না।" বাংলাদেশে জমিদারী প্রথা

তথা সামন্তপ্রথার কি রূপ, তাহা এই পত্রটিতে পাওয়া যায়। রাজা-হুকুম দিয়াছেন, অথচ 'ম্যানেজার' সেই হুকুম কার্যকর করিতেছেন না। ইহা যেন 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'-র অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায় —"বাবু যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ"।

(৮) মৃত্যুর চারদিন পূর্বে কবি যে পত্র লেখেন তাহাই তাঁহার শেষ পত্র। ১৩২৫ সালে ৯ই আশ্বিন কবি লিখিতেছেন—"আমার অবস্থার কথা কি লিখিব ? আজিও বাড়ী যাইতে পারি নাই, কারণ ১লা অক্টোবর নিলামের তারিখ। ঐ তারিখের পরে ছাড়া আর যাইবার উপায় নাই। জগদীশ্বর রক্ষা করেন কি না দেখিব। বড় ছেলেটা পূর্বেই পড়া ছাড়িয়াছে; বরুণকেও খরচের অভাবে ঢাকায় রাখিয়া পড়াইতে পারিতেছি না। গ্রামের স্কুলেও ভর্তি করে না। এই ত অবস্থা!" ইত্যাদি।

—এই অবস্থায় কবিকে পরপারের ডাকে সাড়া দিতে হয়। অথচ মৃত্যুর পূর্বে বাড়ী যাইবার জন্য কবির প্রাণ যে ব্যাকুল হইয়াছিল, তাহা তাঁহার পত্র হইতে বোঝা যায়। কবি তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় পুত্রের নাম 'বরুণ' রাখিয়াছিলেন। কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরীর গর্ভে তাঁহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে কবি, তিন পুত্র ও দুই কন্যা জীবিত দেখিয়া গিয়াছেন। কবি গোবিন্দদাসের মৃত্যুর পর নিদারুণ পতি ও পুত্রশোকে অবসন্ন হইয়া কবির দ্বিতীয়া পত্নী প্রেমদাসুন্দরী ১৩২৮ সালে ৯ই কার্তিক পরলোকগমন করেন।

'জীবন প্রভাতে'—১২৮৬ সালে লাঞ্ছিত কবি লিখিয়াছিলেন—

"সবাই আমারে করে নাম ঘৃণা
অনেক সয়েছি, আর ত পারি না
দেও হে আশ্রয়, প্রাণেশ আমার—"

তাঁহার সেই কাতর প্রার্থনা ১৩২৫ সালে ১৩ই আশ্বিন জীবন-রাতের শেষ প্রভাতে (শেষ রাত্রে ৫টা ১৫ মিঃ) জগদীশ্বর পূর্ণ করিলেন।

পরিশিষ্ট—ঘ

॥ কবি গোবিন্দদাস ও সাময়িক পত্র ॥

স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জীবনে সাময়িক পত্রের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। তিনি বহু সাময়িক পত্রে কবিতা লিখিয়াছেন। একসময় "বীণা", "নবজীবন", "কৌমুদী", "ভারতমিহির" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কবিতা গৌরববৃদ্ধি করিত। "বান্ধব", "প্রকৃতি", "জন্মভূমি" প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি একসময় লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া, তাঁহার সমকালীন বহু সাময়িক পত্রিকা, যথা—"আর্য-কায়স্থ প্রতিভা", "সৌরভ", "প্রতিভা", "নারায়ণ", নবপর্যায়ে "বঙ্গদর্শন", "মানসী", "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" প্রভৃতি পত্রিকাতেও কবির কবিতা প্রকাশিত হইত। কিন্তু কবি গোবিন্দদাসের কাব্য-জীবনে "নব্য ভারতে"র স্থান সবার উপরে। কবি "নব্যভারতে"র নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং ১২৯০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩২৫ সাল পর্যন্ত "নব্যভারতে"র জন্য অবিশ্রান্তভাবে লিখিয়া গিয়াছেন।

১। ১২৮৫ সাল হইতে কবি গোবিন্দদাসের রচনা যে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজকৃষ্ণ রায়ের "বীণা" পত্রিকা হইতে। এই সালে 'কার্তিক' সংখ্যায় কবির "একদিন" নামক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সমালোচকদের মতে, ইহাই কবির মাসিক পত্রিকায় সর্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা। যথা—

একদিন।

একদিন

বিকালে বাগানে গিয়া, মৃগশিশু কোলে নিয়া,
প্রেয়সী তমালতলে রহিয়াছে বসিয়া ;
সুচিকণ কেশগুলি, সমীরণে দুলি দুলি,
অর্ধ-অনাবৃত-বক্ষে পড়িতেছে খসিয়া।
আদরে ধরিয়া বুকে, লাগাইয়া মুখে মুখে,
হরিণ-শিশুর সহ গলাগলি করিয়া,

অনন্ত-অমৃত-রাশি, হাসিছে গোলাপী হাসি
সোনামুখে,—প্রিয়তমা মন লয় হরিয়া।
প্রেয়সীর রঙ্গ দেখি, ভাবিলাম "হলো এ কি ?"
হাসি করতালি দিয়া, মুখে কথা সরে না !
নিরখি পুলক মম, জিজ্ঞাসিল,—"প্রিয়তম !
কেন আজি এত হাসি—গালে যেন ধরে না ?"
কহিলাম,—"প্রাণেশ্বরি ! লোণা জলে ভয় করি,
সাগরে থাকিতে নারি, গেল শশী বিমানে,
তা'তে আরো সর্বনাশ, পোড়া রাহু করে গ্রাস,
এত যে বিপদ হবে, আগে বল কে জানে ?
শিবের ললাটদেশ, আশ্রয় করিল শেষ,
সেখানেও বিষ-বহ্নি ! তাও গেল ছাড়িয়া ;
অতি গোপনীয় স্থলে, আসিল ঘোমটা তলে ;
তব সেই মুখশশী !—প্রাণ নেয় কাড়িয়া !"

১২৮৬ সালে "বীণা" পত্রিকায় কবির "ইহা কিছু নয়" নামে আর একটি কবিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির শ্বশুরবাড়ীর সম্মুখে যে দীর্ঘিকা আছে, তাহার উল্লেখও পাওয়া যায় এই কবিতাটিতে—

"শারদ মধ্যাহ্ন, মাঝে শ্যামল পুকুর,
এপারে ওপারে কথা রহে বহুদূর !
দক্ষিণের মৃদু বায়ু ধীরে দিল আনি
শ্রবণে প্রতপ্ত সুরা জানি তবে জানি !"

২। ১২৮৬ সালে কবি যখন ময়মনসিংহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার "পরশুরামের শোণিত তর্পণ" কবিতাটি "বান্ধব" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "বান্ধব" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ব্রজনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কবিতাটি প্রকাশ করেন এবং ইহার সম্পাদকীয় কলমে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করেন। কিন্তু তখনও তিনি জানিতেন না যে, কবিতাটি আসলে (তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রু) কবি গোবিন্দ-

দাসের রচনা, জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই উহা "বান্ধবে" প্রকাশিত হইত না। যথা—

"সাগরের যেন নীল জলরাশি
বিভেদ করিয়ে উঠিছে প্রকাশি,
কমলার চারু সুবিমল হাসি,
তেমনি উঠিছে উষা,
প্রভাতী-মঙ্গল পাখীরা গাইল,
প্রকৃতি বিবিধ কুসুমে পূজিল,
তরুণ অরুণ পরাইয়া দিল,
কিরণ কিরীট ভূষা।" ইত্যাদি

সমগ্র কবিতাটি দ্বিতীয় খণ্ডে ("প্রেম ও ফুল" কাব্যে) প্রকাশিত হয়। উৎসাহী পাঠকবর্গ উহা পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন কবির ভাষা কেমন গৌরবময়ী ও অলঙ্কারময়ী। কবিতাটি রচনার সময় কবি গোবিন্দদাস চতুর্বিংশতিবর্ষীয় যুবক। জয়দেবপুরে থাকাকালীন অর্থাৎ বিদেশে যাওয়ার পূর্বে কবি এই কবিতাটি লেখেন।

৩। ১২৮৭-৮৮ সালে কবি গোবিন্দদাস শিকারপ্রিয় জমিদার কেশবচন্দ্রের অধীনে প্রথমে "জমা সেরেস্তায়" এবং পরে "মুন্সী" পদে কাজ করিবার সময় যে-সব কবিতা রচনা করেন, তন্মধ্যে "শিকার" কবিতাটি উল্লেখযোগ্য। ১২৯৪ সালে "নবজীবন" পত্রিকায় ইহা প্রকাশিত হয়। শিকারে সংশ্লিষ্ট থাকায় কবিতাটির জন্ম হইলেও ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী শাসক ও ঘাতকের হাত হইতে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করা। কবিতার উপসংহারে কবি লিখিয়াছেন—

"এ কি এ মুহূর্তে হায়, দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ণবক্ষে মৃতের আকার,
বীরেন্দ্র শার্দ্দূলরাজ, এত যে অযত্নে আজ,
বনেই পতিত বনবীর অহঙ্কার?
হা হৃদয় কি অজ্ঞান, এই আত্মবলিদান,
এই আত্মবধ চিত্র দেখি পুনর্বার,
সমাহিত স্মৃতি-রোগ জাগালে আবার!"

—কবিতাটির নাম "শিকার" হইলেও ইহার মূল সুর হইতেছে—দেশাত্মবোধ। কবিতাটি রূপকাত্মক ও দেশাত্মক। বলা বাহুল্য, কবি গোবিন্দদাসের শিকার-সম্পর্কীয় আর কোন কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্মজীবনে গোবিন্দদাস অধিকাংশ সময়েই সেরপুরে কাটাইয়াছেন। সেই সময় সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকারের "নবজীবন" জয়যাত্রার পথে। সেই সময় গোবিন্দদাসও "নবজীবনে" রীতিমত লিখিতেন। ১২৯৩-৯৪ সালে কবি গোবিন্দদাসের বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল।

৪। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ৬ই ভাদ্র "প্রকৃতি" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে আত্মপ্রকাশ করে। এই পত্রিকার ২য় বৎসরের ১ম সংখ্যায় (১২৯৯ সালের ৫ই ভাদ্র) কবি গোবিন্দদাসের বিখ্যাত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রসাত্মক কাব্য "মগের মুলুকে"র প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়। অবশিষ্ট অংশগুলি ক্রমশঃ ১৯শে ভাদ্র; ৯ই আশ্বিন; ২৪শে পৌষ; ২রা মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। শেষ হয় ২৩শে মাঘের সংখ্যায়। কাব্যখানি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কবি গোবিন্দদাসের নাম সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হয় এবং সংবাদসমূহ মুখর হইয়া উঠে। অল্প সময়ের মধ্যে কবি গোবিন্দদাস পূর্ববঙ্গে "মগের মুলুকে"-র কবি হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 'সপ্তম' অধ্যায়ে "মগের মুলুক ও কবি গোবিন্দদাস" শীর্ষক রচনায় করা হইয়াছে।

৫। ১২৯০ বঙ্গাব্দে "নব্যভারত" প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবি গোবিন্দ-দাসের প্রথম প্রকাশিত কবিতা—"সতীদেহস্কন্ধে মহাদেবের নৃত্য"। এই কবিতাটিকে কেন্দ্র করিয়াই "নব্যভারত" সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে কবির বন্ধুত্ব উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। কবিতাটির বিষয়বস্তু ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

"নব্যভারতের" জন্য রচিত কবির শেষ কবিতা 'অসুরপূজা' ১৩২৫ সালে আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির শৌর্য-বীর্যের স্তুতিগান এবং স্বদেশপ্রেমের মাহাত্ম্য প্রচার করা হইয়াছে। সর্বশেষে প্রতারক, প্রবঞ্চক, আততায়ী ও বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত সাড়া জাগায়। 'অসুর' শব্দের কদর্থ থাকিলেও কবি অসুরকে সম্মান দিয়াছেন এবং বন্দনা করিয়াছেন—

"ধন্য তুমি হে বীরেন্দ্র অসুর দুর্বিজয়।
শৌর্য তোমার, বীর্য তোমার, অনন্য অক্ষয়।
ধন্য তোমার স্বদেশপ্রীতি
ধন্য তোমার অসুর নীতি,
ধন্য তোমার পুণ্য-স্মৃতি বিনাশ করে ভয়।"

৬। ময়মনসিংহের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় ১৩১৯ সালের কার্তিক মাস হইতে "সৌরভ" নাম দিয়া একটি সুদৃশ্য মাসিক পত্রিকা পকাশ করেন। মজুমদার মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কবি গোবিন্দদাস 'সৌরভ' নাম দিয়াই একটি সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন। ১৩২৪ সালে উহা সৌরভ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটির এক স্থানে আছে—

"বিলাসে বিহ্বল বঙ্গ মোহে অচেতন,
চাহিয়া দেখে না পাছে, কত নীচে নামিয়াছে,
কোথা হ'তে হইয়াছে কোথায় পতন!
কোথা ধর্মে অনুরক্তি, কোথা সে বিশ্বাস ভক্তি,
কোথা সেই সত্যনিষ্ঠা কোথা সংযমন!
সকলি বিলাসে ভোর, নাহি কারো গায় জোর,
পড়িলে বিপদে ঘোর কাঁপে কলাবন।
ব্যাপিয়া সারাটা বঙ্গ, কেবলই * * * রঙ্গ
তাহারি ঔষধ খোঁজে তারি বিজ্ঞাপন।"

কবি গোবিন্দদাস চিরদরিদ্র ছিলেন বলিয়াই তাঁহার আহারও ছিল তদনুরূপ। তিনি মাছ খাইতেন, অথচ মাংস খাইতেন না; অথচ শিকারে আগ্রহ ছিল। ধূমপান সুরাপান কিংবা মাদক দ্রব্য জাতীয় কোন নেশার প্রতি তাঁহার আসক্তি ছিল না। কেবল আহারের পর তাম্বূল চর্বণ করিতেন। তিনি জীবনে মিতব্যয়ী ছিলেন, অথচ ঋণভারে বিব্রত হইতেন। "সৌরভে"-র জন্য কবির শেষ কবিতা "ঋণ"। যথা—

"সাগরের বারিকণা রবি করে ধায়,
সে আগে বোঝেনি ও যে এত বোঝা ভার।
দিনে দিনে পলে পলে ধারে জমিয়া সে,
ভীষণ মেঘের রূপে তাহারেই গ্রাসে।" ইত্যাদি।

১৩২৫ সালে কবি গোবিন্দদাস ঋণে খুব জড়িত হইয়া পড়েন। কবিতাটি তৎকালীন মনোভাবেরই ফল বলা যাইতে পারে।

পরিশিষ্ট—ঙ

॥ কবির হস্তাক্ষর লিপি ॥

[কবির হস্তাক্ষর লিপিটি কবি-বন্ধু ৺যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সৌজন্যে এবং কবি-পুত্র শ্রীযুক্ত হেমরঞ্জন দাসের প্রচেষ্টায় প্রাপ্ত। এইজন্য আমরা উভয়ের নিকট ঋণী ও কৃতজ্ঞ।]

আমি আমি ধরেছে বাণী,
দিনে ভুলে দিলে ধরি,
নাইরে তাহা কুলো হাঁড়ি
বাপ দাদার সেভাবে ধরে!
তাই অভাগী, আমি বলি
তোমরা আমায় চিনতে শিখেছ!

৪

আমি আজ
স্বদেশ-চ্যুত বিদেশগামী,
স্বদেশে সব-প্রত্যাশী,
না জানিয়ে মরেছি আমি,
ব্যাসকাশী—এ পাপের ভয়!

লোকে বলে, এমন দারুণ জাতি,
অজ্ঞানতার হতাশা,
তিন ভাষায় এক বেদে বাস—
কি মহার্ঘ, কি দুর্লভ!
আমি বলি, তোমরা আমায় চিনতে শিখনি!

৫

হেথা, জননী বঙ্গমা মানি,
যে মোর চোখে দিতে বালি,
এ কিঙ্কি ক্যায় সবাই ব্যাপী
আত্মভুক্তি মর্ম!

জীবনে না এক সত্য কাজ,
বুকের লোহার ঝাঁঝ আর্তি,

সেই সিন্ধু দুই কূলে পাশ
উঠেছে সব ভাষায়!
ওরা, মিছে মিছে বাঁধ বাঁধা,
সকল লোকের চোখের ধাঁধা,
এদের, ভেসাতে পাই,— হাতে আঁধা,
আমাদের 'হ' নামের বটে;

ওদিকে কোথা আগমনি,
এমন, দুখাকে পাশে প্রাণে বাঁচি,
এরা, শক্ত চোখে এমন অন্ত—
আমাদের দুর্গ ভর্তি!

আমি বলি, তোমরা আমায় চিনতে শিখনি!

৬

আমার বন্ধু আসছে কাছে,
ওপারে ভুলে দিতে যাচ্ছে,
বিজন কোলে সাইনা আছে
কেমন স্নেহ মেখেছে,

ওদের দুঃখ অনলে পোড়ে,
আছে কিছু চাইতে তবে,
সুদূর লোকে পাঁচ পড়ে
তোমার দরজা শোকে!

কত বন্ধু দেখেছি দেখো,
মুক্ত স্বাধীন দেশে,
তাদের কোলে আমার কোলে
কাঁদে জল আমার কাছে,

শেষটা খেয়ে অনাহারে,
খুঁজে ঔষধ উপচারে,
সাহিত্যের যে ভাই বন্ধু
বিষম দুঃখ, বিষম ঋণ!
আমি মলে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বাঙালী!

স্বর্গ নিশ্চয় নরক হতে,
আমার জন্য আসন পাতে,
দেখতে আমার শোক সভা
আসে নিয়ে অলকাই!
সত্যই কি অমন কাজ
বাঙালীকে করেছে বাঁচাই?

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র দাস

৭

যা হোক, আমি মলে পর,
পুত্র পরিজন
তোমাদের এ আমার বন্ধু [অস্পষ্ট]
অথবা তোমাদের সাহিত্যপট,
চিতায় মঠ যা দিবে কেহ,
তার চেয়ে অদ্ভুতের,
ছায়া-চিত্র বাঁধায়ে কেহ
কেউ বা দিবেন চিত্রপট!
হবে তোমার শোক-সভা,
চক্ষে চশমা শ্বেত সব,
ওষ্ঠে চুরুট ধূম্রস্তর,
করতালি চট্ চট্,

* কোন বন্ধু স্কুলে তাঁহার নিকট সংবাদ, আমি মরিলে আমার চিতায় একটী মঠ দিতে চাহিয়াছিলেন, ইহা তদুপলক্ষে লিখিত।

॥ ভাওয়াল ও ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা ॥

ভাওয়াল জয়দেবপুরের নাম হয়ত অখ্যাত বা অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইত, যদি না বিখ্যাত "ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা" এবং স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জন্মভূমি না হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে এই ভাওয়াল ছিল অরণ্যসঙ্কুল এবং মনুষ্যবাসের অযোগ্য। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভাওয়ালের তৎকালীন কালেক্টর লিখিয়াছেন—"অরণ্যের অর্ধাংশ ছিল বন্য হস্তী ও হিংস্র পশুর বিচরণস্থল।"[১] আর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—"এই বিভাগের উত্তর-সীমা ময়মনসিংহ, পূর্ব সীমা লক্ষা নদী মহেশ্বরদী এবং সোনারগাঁও; দক্ষিণ-সীমা বুড়ীগঙ্গা নদী, পশ্চিম সীমা তুরাগ নদী এবং চন্দ্রপ্রতাপ। এই বিভাগের কোন কোন স্থল তুরাগ নদীর পশ্চিম এবং লক্ষার পূর্ব পারও আছে। কিন্তু নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ঐ সকল স্থান চন্দ্রপ্রতাপ এবং সোনারগাঁয়ের অন্তর্গত। এই বিভাগের দক্ষিণাংশে ঢাকা নগরী সংস্থাপিত। জয়দেবপুর, টৌক, টঙ্গী, রূপগঞ্জ, কাপাইসা, ডেমরা, একডালা এবং জামালপুর ইহার প্রসিদ্ধ গ্রাম।"[২] গ্রামসংখ্যা—২৭৯৩,[৩] জমি প্রায় ৫৭৯ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—হিন্দু ২৭৬০৫ এবং মুসলমান ৩৭৭৮১; মোট = ৬৫৩৮৬। ভাওয়ালে অধিকাংশ জমি পতিত, উচ্চ এবং জঙ্গলময়। সর্বত্রই গজার বৃক্ষে পরিপূর্ণ এবং তাহার ভিতর দিয়া ক্ষুদ্রতোয়া 'চিলাই' নদী প্রবাহিত। ভাওয়ালে কোন বড় নদী নাই, কেবল মাত্র 'বালু' ও 'টঙ্গী' নদী বিদ্যমান। ভাওয়ালের বন জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য মহিষ বেশী দেখা যায়। ভাওয়ালের অধিবাসীর মধ্যে শুধু হিন্দু ও মুসলমানই বাস করে না, 'ফিরিঙ্গী' ও

---

১. B. C. Allen: Eastern Bengal District Gazetteers, Page 8.

২. Descripiive Geography and a Brief Historical Sketch of the Dacca District: ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ; প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্তৃক মুদ্রিত; পৃঃ ৪।

৩. কেদারনাথ মজুমদার: ময়মনসিংহের বিবরণ; পৃঃ ১৭।

'বনুয়া' প্রভৃতি জাতিও বাস করে। তাহা ছাড়া, 'বংশী' ও 'কোচ' নামক দুইটি[১] পার্বত্য জাতিও বাস করে। ফলে, লোকসংখ্যা সর্বমোট প্রায় ৬৬ হাজারের মত। এই বনজ ও প্রাণীজ সম্পদে ভরা ভাওয়াল-জয়দেবপুর সত্যই প্রকৃতির এক রমণীয় স্থান। কলের ধ্বনিতে এখানে লোকের ঘুম ভাঙ্গে না, ভাঙ্গে পাখীর কলধ্বনিতে। নদীর কুলু কুলু শব্দে ঘুম আসে, আবার নিশীথে ঘুম ভাঙ্গে হিংস্র পশুর গর্জনে। প্রকৃতির কোলে মানুষ ও পশুর সহাবস্থান সত্যই অপূর্ব!

এই অপূর্ব বনভূমির সৌন্দর্যের মধ্যে সৌন্দর্যের পূজারী স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। এই পরিবেশে একমাত্র 'প্রকৃতির বরপুত্র' জন্মগ্রহণ করে। কবি গোবিন্দদাস এই প্রকৃতির দানে পুষ্ট, সমাজের নিগ্রহে পিষ্ট এবং দারিদ্র্যের পীড়নে অতিষ্ঠ। তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে শান্তি আনিত ভাওয়ালের রমণীয় পরিবেশ। তাই তাঁহার সমগ্র কাব্যে ভাওয়ালের মহিমা কীর্তন পরিবেশিত হইয়াছে। তাই তিনি "ভাওয়ালের কবি" নামে পরিচিত।

সত্যই "ভাওয়ালের একদিকে যেমন পার্বত্য প্রদেশের রমণীয় শোভা, অপর দিকে তেমনি কোথাও শ্যামায়মান শস্যক্ষেত্রের নয়নাভিরাম দৃশ্য, কোথাও বা স্নিগ্ধ পবনান্দোলিত, কমল কুমুদ জলপুষ্প-সুশোভিত, নানা জাতীয় জলচর বিহঙ্গম-মুখরিত, নাতিবৃহৎ সাগরতুল্য জলাভূমি বা বিল। জলাভূমির তীরে তীরে কোথাও শরবন এবং ঘন শষ্প বিদ্যমান। তাহাতে জলচর পক্ষীগণ নিশা যাপন করে। আবার কোথাও বা তৃণাচ্ছাদিত পথহীন, জনহীন প্রান্তর। সে দৃশ্যে পথিকের মন উদাস হইয়া যায়।"[২]

এই পরিবেশেই কবি গোবিন্দদাস 'স্বভাবকবি' হন। ভাওয়ালের এই অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য কবির নিকট "স্নেহের প্রতিমাখানি, অরণ্যের মহারাণী"রূপে প্রতীয়মান। তাঁহার কবি-মানসে ভাওয়ালের "মোহনরূপ, লাবণ্যের শত স্তূপ"-রূপে প্রতিভাত। কবির নিকট 'ভাওয়াল' যেন কত জনমের পরিচিত লীলাভূমি, জগতের সব সৌন্দর্যের মনভূমি এবং আনন্দের ঐশ্বর্যভূমি!

কবি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন ভাওয়ালের জমিদার ছিলেন—রাজা কালী-নারায়ণ রায়। এই কালীনারায়ণ রায়ের ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ বলরাম রায়

১. জ্ঞানেন্দ্রকুমার : বংশপরিচয় (৩য় খণ্ড); পৃঃ ৯৪।
২. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী : স্বভাবকবি গোবিন্দদাস, পৃঃ ১৪।

চৌধুরী ভাওয়ালের জমিদারি লাভ করেন। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর অন্তর্গত 'বজ্রযোগিনী'র বিখ্যাত পুশিলাল ব্রাহ্মণ্যবংশসম্ভূত বিখ্যাত পণ্ডিত রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ বলরাম, ভাওয়াল ভূস্বামী 'দৌলত গাজী'র দেওয়ান ছিলেন।

"ভাওয়ালের অন্তঃপাতী চৈরাগ্রামে যবন জাতীয় গাজী বংশীয়েরা বিলক্ষণ সম্ভ্রান্ত ছিলেন। তদ্বংশীয় পহলুনলা গাজী সম্রাটের নিকট হইতে বর্তমান চাঁদ-প্রতাপ, কাশীমপুর, তালেপবাজ, সুলতান প্রতাপ ও ভাওয়াল—এই পাঁচ পরগণা একত্রে বন্দোবস্ত করিয়া লন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী সা করকরমা গাজী ঐ জমিদারী ভোগ করেন। ইনি ছয় পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে সমস্ত জমিদারী পুত্রগণকে বিভক্ত করিয়া দিয়া যান এবং পুত্রদের প্রত্যেকের নামানুসারে যার যার বংশের নাম রাখা হয়। 'ভাওয়াল গাজী' নামক এক পুত্রের নামানুসারে এই দেশের নাম 'ভাওয়াল পরগণা' রাখা হয়। বড় গাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাহাদুর গাজী কর্তৃত্ব লাভ করেন। তৎপর তাঁহার পুত্র মহাতাপ গাজী, তৎপর তৎপুত্র কাজীল গাজী, তৎপর তৎপুত্র নূরগাজী কর্তৃত্ব করেন। নূরগাজীর পুত্র হীরা গাজী ও দৌলত গাজী। ইঁহারা ক্রমে ভাওয়ালের কর্তৃত্বপদ লাভ করেন। হীরা গাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দৌলত গাজী শাসনকর্তা হন।"[১]

তারপর কালের পরিবর্তনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়। বজ্রযোগিনীর রত্নেশ্বর ভট্টাচার্যের প্রপৌত্র কুশধ্বজ চক্রবর্তী মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের উকিল ছিলেন। নবাব তাঁহার কর্মতৎপতায় ও দক্ষতায় তাঁহাকে "রায়" উপাধিতে ভূষিত করেন। এই নবাব সরকারের আমলে কুশধ্বজ দৌলত গাজীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং জয়দেবপুরের পশ্চিম পার্শ্বে চাঁদনা গ্রামের জায়গীরদারি লাভ করেন। কালক্রমে নিজের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতায় তিনি দৌলত গাজীর প্রধান দেওয়ান পদে আসীন হন। এই পদমর্যাদার সুযোগে তিনি 'স্বজনপোষণ' নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বলরাম দেওয়ানি-পদে নিযুক্ত হন এবং তাঁহার কূটবুদ্ধিবলে ভাওয়ালের রাজলক্ষ্মী "পুশিলালের ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। ভাওয়ালের জমিদারী গাজী মুনিবের

১. জ্ঞানেন্দ্রকুমার : বংশ পরিচয় (৩য় খণ্ড) ; পৃঃ ৯৮।

পরিবর্তে ব্রাহ্মণ কর্মচারী জানকীনাথ রায়ের নিজস্ব হইয়া পড়িল।"[১] বলা বাহুল্য, বলরাম রায়ই ভাওয়ালে জানকীনাথ রায় নামে পরিচিত হন।

সামন্ত প্রথায় ভূস্বামীরা এক একজন 'ক্ষুদে নবাব'। ফলে প্রজাদের সঙ্গে ভূস্বামীদের সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না, ছিল প্রভু-ভৃত্যের শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক। অনেক সময় এই সম্পর্ক এত তিক্ত আকার ধারণ করিত যে, মাঝে মাঝেই 'প্রজা-বিদ্রোহ' লাগিয়া থাকিত। এই বিদ্রোহের ভয়েই জানকীনাথ নিজে সমস্ত সম্পত্তি ভোগ না করিয়া কালীকিশোর ঘোষ চৌধুরী[২]র পূর্বপুরুষকে সাত আনি, ও 'পানাসোণা'র পূর্বপুরুষকে দু আনি দিয়া জমিদারী লাভ করেন। এবং নবাব-দরবারের প্রচুর উপঢৌকন পাঠান। এই ব্যবহারে নবাব খুশী হইয়া জানকীনাথ রায়কে "চৌধুরী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র শ্রীকৃষ্ণরায় হিজরি ১০৮৮ সালে ৬ই জেলহজ্জ তারিখে তৎকালীন দিল্লীর বাদশাহার নিকট হইতে নায্যমূল্যে বা স্বীকৃতির অঙ্গীকারে জমিদারির সনদ লাভ করেন এবং চাঁদনা গ্রাম ত্যাগ করিয়া "পীরা বাড়ী" নামক স্থানে নূতন বাসস্থান গড়িয়া তোলেন। তাঁহার পুত্র জয়দেবরায় 'পানাসোনার দু আনি' অংশ হস্তগত করিয়া 'নয় আনি' অংশের মালিক হওয়ায় প্রবল প্রতাপশালী হইয়া উঠেন এবং "পীড়াবাড়ী"র নাম পরিবর্তন করিয়া রাখেন "জয়দেবপুর"। এই "জয়দেবপুর"ই সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করে স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের আবির্ভাবে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে যখন 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিল; তখন দেওয়ানি ক্ষমতা-প্রাপ্ত 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' জয়দেবের প্রপৌত্র লোক-নারায়ণকে ভাওয়ালের জমিদাররূপে মানিয়া লয়। কারণ লোকনারায়ণ কোম্পানীর একান্ত অনুগত ছিলেন। তারপর "১১৯৮ সনে লোকনারায়ণ রায়চৌধুরী ও কৃষ্ণশ্যামকিশোর চৌধুরীর নামে ২৫,১৬০ টাকা সিক্কাতে ভাওয়াল সম্বন্ধে দশশালা বন্দোবস্ত হয় এবং তৎপর ১২০১ সালে নয় আনি ৯নং মহাল ১১,৭৭৪ টাকা সিক্কাতে গোলকনারায়ণ রায়চৌধুরীর নামে এবং সাত আনি ১০নং মহাল ১,৩৩,৩৮৬ টাকা সিক্কাতে কৃষ্ণকিশোর রায়চৌধুরীর নামে পৃথক তালুক হইয়া

---

১. জ্ঞানেন্দ্রকুমার: বংশ-পরিচয় (৩য় খণ্ড), পৃ:—১০১।

২. কালীনারায়ণ রায়ের পিতা গোলকনারায়ণের সমকালীন ভাওয়ালের সাত আনির জমিদার ছিলেন।

পড়ে।[১] ইতিমধ্যে লোকনারায়ণ রায়ের বংশে জমিদারি চলিতে থাকে এবং তাহাতে লোকনারায়ণের ভ্রাতা নরনারায়ণকে খুন করা হয়।

ভাওয়ালের রাজপরিবারের ইতিহাস—এক কলঙ্কিত ও অভিশপ্ত পরিবারের ইতিহাস। এই পরিবারের বহু দান, সৎকার্যে অনুষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্যে প্রতিষ্ঠান থাকিলেও রাজলক্ষ্মীর প্রবেশ ঘটিয়াছে কুসুমাস্তীর্ণ পথে নয়—রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথে। "লোকনারায়ণ ছিলেন স্বৈরাচারী শক্তিধর পুরুষ। তাঁর যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁর পুত্র গোলকনারায়ণের বয়স মাত্র তিন বৎসর। জমিদারি ক্ষমতা দখলের লোভে পুনরায় রাজপ্রাসাদে দেখা দেয় ষড়যন্ত্র চক্রান্ত। জ্ঞাতি-কুটুম্বদের চক্রান্তে লোকনারায়ণের বিধবা স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী দেবী নাবালক পুত্রসহ রাজগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তিনি কোম্পানি সরকারের সাহায্যে পুনরায় ভাওয়ালের জমিদারি লাভ করেন। এইভাবে কালীনারায়ণ রায়ের পিতা গোলকনারায়ণ রক্তপিচ্ছিল পথে পুনরায় ক্ষমতা দখল করেছেন। কালীনারায়ণ ছিলেন পূর্বপুরুষদের যোগ্য উত্তরাধিকারী। সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগে তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ; দাঙ্গা, খুন ইত্যাদিতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আমলের প্রথম দিকে ভাওয়ালের সাত আনির অংশীদারদের কাছ থেকে সাত আনি কিনে নিয়ে জমিদার হয়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত নীলকর মিঃ ওয়াইজ্। কিন্তু এক আকাশে দুটি সূর্য থাকতে পারে না এবং কুড়ি বৎসরের যুবক কালীনারায়ণ তা সহ্য করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং জমির মালিকানা নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হল। বহু খুন জখমের পরে মিঃ ওয়াইজ্ পশ্চাদ্‌পসরণ করতে বাধ্য হলেন। তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ৪,৪৬,০০০ টাকার বিনিময়ে তাঁর সাত আনির জমিদারি কালীনারায়ণের কাছে বিক্রি করে দিলেন। এতদিনে ভাওয়ালের ষোল আনি জমিদারি পুশিলালের বংশধরদের কুক্ষিগত হল। কালীনারায়ণ ইংরেজ অনুগৃহীত ছিলেন। পূর্ববঙ্গে ইংরেজ আনুগত্যের জন্য কালীনারায়ণই সর্বপ্রথমে 'রাজবাহাদুর' উপাধি পেয়েছেন।"[২]

---

১ জ্ঞানেন্দ্রকুমার: বংশ পরিচয় (৩য় খণ্ড); পৃঃ ১০৭।

২ B. C. Allen: Eastern Bengal District Gazetteers; Page—184.

গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরলোকগত ইন্দুময়ী দেবী ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়ীর লোকেরা মোহিনীবাবু এবং মিঃ ব্যানার্জিকে খবর দেন; তাঁরা জ্যোতির্ময়ী দেবীর বাড়ীতে এসে খোঁজ নেন। তাঁদের সঙ্গে সাধুর দেখা হয় না। আবার আজ সকালে গেছেন, সাধু জানায় বিকেলে সে দেখা করবে। এদিকে বাড়ীর লোকেরা সাধুকে এই বলে শাসায় যে, সে কথায় ও আচরণে নিজেকে মেজোকুমার বলে জাহির ক'রে ভীষণ ঝুঁকি নিয়েছে, পুরো পরিচয়, অতীত কথা না বলে সে যেতে পারবে না। এ অবস্থায় প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাধু সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ এক তদন্তের। সকাল থেকেই সাধুকে দেখতে লোক জড় হচ্ছে; উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য এত বেশী যে, অচিরাৎ কোন ব্যবস্থা না নিলে অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। আমি আপনার নির্দেশের প্রত্যাশায় রহিলাম।"

এই চিঠির একটি নকল বিভাবতী দেবীর নামেও 'অবগতার্থে' পাঠানো হয়।

জ্যোতির্ময়ী দেবী বলিয়াছেন '৩০শে এপ্রিল রাত্রি সাতটা বা সাড সাতটায় সে তাঁর বাড়ীতে আসে এবং বৈঠকখানায় বসে। ভুলুর কর্মচারী দুরন্ত সেখানে ছিল। আমার কর্মচারী অতুলবাবু, জিতেনবাবু এবং আরও কিছু ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁরা আমার ছেলের কাছে রোজই আসতেন তাস খেলতে। আমি পাশের ঘরে ছিলাম, চিকের আড়াল থেকে দেখছিলাম। দেখতে পেলাম সন্ন্যাসী কাঁদছে। জিতেন ভট্টাচার্যকে ডেকে পাঠালাম, জিজ্ঞেস করলাম কাঁদছে কেন? তিনি বললেন, সন্ন্যাসী কর্তাদের ফটোগুলো দেখছিলেন। জিতেন ওগুলো ঢাকা থেকে বাঁধিয়ে এনেছেন। 'কর্তা'দের মানে আমার ভায়েদের। সে রাত্রে আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা হয়নি।

পরদিন সাধু ভোর না হতেই চিল্লাইয়ে স্নান করতে গেল, সর্বাঙ্গে ভস্ম মেখে এল। সাধু নিরামিষ রান্না খেল। সে পাশের ঘরে বসল। সবার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও সবাই চলে গেলে সে যোগেনবাবুকে হিন্দিতে বলল, আমার বৈঠকখানা সাফ ক'রে দাও। সবার সন্দেহ হ'ল। এমন কথা বলল কেন? আমি তাকে বললাম, সে যেন ছাই না মাখে। সে বলল—কেন? পরদিন সে ছাই মেখেই এল। আমি বললাম, আমি না ছাই মাখতে মানা করেছিলাম? কাল যেন না মাখা হয়'।

তার পরদিন ৩রা মে, তার স্নানের সময় তার সঙ্গে গেল তার পুরানো খানসামা আনন্দ ও নগেন ভট্টাচার্য্য। ফিরে যখন এল, তখন গায়ে ছাই নেই। তখন

তার রং দেখলাম তাকিয়ে, মেজকুমারের সেই রং, ব্রহ্মচর্য্য-পালনে কিছু উজ্জ্বলতর ভস্মমুক্ত মুখ দেখলাম। রমেন্দ্রের মতো। চোখের পাতা গায়ের রং-এর তুলনায় কিছু কালো, গাড়ির চাকায় যে দাগ হয়েছিল, তা দেখলাম, দেখলাম কব্জিতে, পায়ের ওপরে কাটা দাগ। এমনি আরও অনেকেই দেখলেন।'

বলা বাহুল্য, জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁহার ছেলেকে দিয়া সাধুর গায়ের দাগগুলি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সাধু তাহাতে রাজী হন না।

জ্যোতির্ময়ী দেবী বলেন,—"পরদিন ৪ঠা মে। বুধু দাগগুলো দেখতে চেষ্টা করলে সাধু আপত্তি করল না। তিনি যে যে দাগগুলো বললেন, জাবুও সে সব দেখে নিল। তখন সকাল সাতটা; বাইরের কেউ ছিল না। সকাল ন'টায় লোক আসতে আরম্ভ হল। গায়ত্রী জপ করা হলে আমি তাকে বললাম: তোমার শরীরের দাগগুলো আমার মেজো ভাইয়ের মতো। তুমিই সেই। তোমার পরিচয় দাও। সে বলল, 'না, না, আমি সে নই, বিরক্ত কর কেন, আমি চলে যাব।' আমি বললাম, 'তোমাকে বলতেই হবে তুমি কে। না বললে হবে না।'

'আমি আমার ছেলেকে বললাম, সবাইকে বল, মেজোকুমারের সব দাগ দেখেছি আমি। আমার ছেলে ও বোন-পো তাই করল, আমি চিকের আড়ালে রইলাম। প্রজারা জেদ ধরল, বলতেই হবে। সে বলল, সে আত্মপ্রকাশ করল, আত্মপরিচয় দিল।'

বারো বছর আগে

২৫শে জুনের এক দল লইয়া মেজোকুমার দার্জিলিং রওনা হইলেন। সময়টা ১৯০৯-এর ২০শে এপ্রিল। যাত্রার পাঁচ-ছয় দিন আগেই সবকিছু বন্দোবস্ত করা ছিল, সেইমত মেজোকুমার দলবলসহ আসিয়া উঠিলেন চৌরাস্তার কাছে 'স্টেপ-এসাইডে'। এই দলে কুমার ছাড়া ছিলেন কুমারের স্ত্রী, তাঁর দাদা সত্যবাবু, ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্ত, মুকুন্দ গুঁই, বীরেন ব্যানার্জি, সি. জে. ক্যাব্রাল (দরজি), এণ্টনি মোরেল, খানসামা, দেহরক্ষী, আর্দালি, পাচক, গুর্খা প্রহরী, বেয়ারা, বাবুর্চি, ঝি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বিরাট দলে ভাওয়াল রাজপরিবারের আর একটি বৌ বা বৌয়ের ননদ অথবা কোন আত্মীয়ের জায়গা হয় নাই; কলা

হইল, বাড়িটা নাকি খুবই ছোট। বলা বাহুল্য, ভাওয়াল রাজপরিবারের ইতিহাসে ইহার আগে কখনো এই বাড়ীর বৌ ননদ বা আর কারও সঙ্গ ছাড়া কেবল স্বামীর সঙ্গে কোথাও যান নাই। অথচ এই তথাকথিত 'ছোট বাড়ি'র একতলায় ছিল সাত খানা ঘর এবং দোতলায় ছিল সাতখানা ঘর। তাহা ছাড়া, ভৃত্যদের ঘরও আছে।

২০শে এপ্রিল হইতে মৃত্যুর দিন অর্থাৎ ৮ই মে পর্যন্ত হিসাবে করিলে দেখা যায় যে, মেজোকুমাররা মোট ১৯ দিন দার্জিলিং-এ ছিলেন। অথচ দার্জিলিং-এ আসার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। কুমারেরা খুব একটা সংযত জীবন যাপন করিতেন না। মেজকুমারের ছিল সিফিলিস। কিন্তু সেই রোগের জন্য দার্জিলিং নয়। সুতরাং এমনিতেই ভাল চলিতেছিল। কুমারের কথায়: "ভালই চলছিল। দিন চোদ্দ-পনের পর অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম। রাত্রে পেট ফাঁপে। আশু ডাক্তারকে বললাম। পরদিন এক ইউরোপীয়ান ডাক্তার এলেন। ওষুধ দিলেন। খেলাম। তৃতীয় দিনেও সেই ওষুধ। ঐ রাত্রে আশু ডাক্তার একটা গ্লাসে ওষুধ দিলেন। বুক জ্বলতে লাগল, বমি করলাম, অস্থির হয়ে পড়লাম, চিৎকার করতে লাগলাম। কোন ডাক্তার এল না সে রাতে। পরদিন সকালবেলা ঘন রক্তবাহ্নি। দুর্বল হয়ে পড়লাম। তারপর জ্ঞানহারা। জানিনে কোন ডাক্তার এসেছিলেন কিনা। পরদিন পেট ফাঁপা। ৬ই ডাঃ ক্যালভার্ট এলেন, ওষুধ দিলেন। ৭ই সেই ওষুধ চলল। বুক জ্বলতে জ্বলতে বমি হল। ৮ই—রক্তবাহ্নি। অচৈতন্য। কোন ডাক্তার এসেছিলেন কিনা রোগী জানেনি। পরে ওষুধ বিশ্লেষণে জানা যায়, ওতে আর্সেনিকও ছিল।"

এই অবস্থায় সবারই ধারণা হইল যে, কুমারের মৃত্যু হইয়াছে। সাতটার কিংবা আটটায়। সুতরাং শ্মশানে শেষ কৃত্যের ব্যবস্থা করা দরকার। পুরাতন শ্মশান। দেহ নামাইবার একটু পরেই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আসিল। ফলে শ্মশান-যাত্রীরা শবদেহ ফেলিয়া দিয়া যে যেখানে পাইল ছুটিয়া আশ্রয় লইল। নিকটেই ছিল এক গুহা; তাহাতে ছিলেন জনা চারেক সন্ন্যাসী। তাঁহারা শবের কাছে আসিয়া দেখিলেন, দেহে প্রাণ আছে, মৃত নয়। তাঁহারা সঙ্গে করিয়া গুহায় লইয়া গেলেন। ঝড় বৃষ্টি থামিলে শ্মশান-যাত্রীরা আসিয়া দেখে চিতা আছে, শব নাই। ভয়ে ও আতঙ্কে তাহারা শূন্য চিতাতেই আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া

গেল। কিন্তু পরদিন সকালবেলা ঘটিল আরও এক চমকপ্রদ ঘটনা। অন্য কোন মড়াকে আগাগোড়া কাপড়ে মুড়িয়া লোক দেখানো এক মিছিল করিয়া 'কুমারের শ্মশান যাত্রা' হইল।

কুমারের অনেক রকমের রোগ বলা হইয়াছিল—ঘুষঘুষে জ্বর, ম্যালেরিয়া, বিলিয়ারি কলিক; প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনগুলির সঙ্গে তাহাদের খুব একটা মিল নাই; কোন টেলিগ্রামে সে উল্লেখমাত্র নাই।

যাই হোক, শ্মশান-যাত্রীদের কল্যাণে ঐ দুই ভাবে 'মৃত্যুর' পর মেজকুমারের যখন জ্ঞান ফিরিল, তখন তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে, তিনি সন্ন্যাসী-পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। শুরু হইল সন্ন্যাস-জীবন। বিষক্রিয়ায় স্মৃতিভ্রংশ হওয়ায় কুমার নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গেই চলাফেরা করিল। এই অভ্যস্ত জীবন হইতে একদা বিচ্ছিন্ন হইয়া কুমার আসিলেন ঢাকায়, সন্ন্যাসী বেশেই রহিলেন বাকল্যাণ্ড বাঁধে। তারপর চতুর্দিকের চাপে যখন তিনি আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হইলেন, তখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উড়াইয়া দিবার জন্য অবিচ্ছিন্ন চক্রান্ত চলিতে লাগিল। প্রজারা এই সাধুকেই মেজোকুমার জানিয়া খাজনা ও মর্যাদা দিতে চায়। কিন্তু মেজরাণীর দাদা সত্যবাবুর পরামর্শে সব কিছু 'গ্রাস' করার ইচ্ছায় পরিস্থিতি তাঁহার আয়ত্তে রাখার ব্যাপারে আপ্রাণ প্রচেষ্টাই অব্যাহত রহিল।

সরকার পক্ষ হইতে ১৪৪ ধারা জারি, সাধুকে 'প্রতারক' বলিয়াও ঘোষণা করা হইল। কিন্তু শুধু প্রজাদের নয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রবল বিশ্বাসের স্রোতে কোন প্রতিবন্ধকই টিকিল না। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় এই যে, মেজরাণী ও কখনও আসিয়া সাধুকে দেখিতে বা যাচাই করতে আসেন নাই। সন্ন্যাসীকে লইয়া যখন এইরূপ অবিশ্রান্ত হট্টগোল চলিতেছিল, তখন একবার বোর্ড অব রেভিনিউর মেম্বার কে. সি. দে. আই. সি. এস. আসিয়াছিলেন এবং জ্যোতির্ময়ী দেবী মারফৎ সাধুকে দরখাস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর একটি স্মারকলিপি পাঠানো হইল।

বিষয়টা চূড়ান্ত পরিণতিতে আসিয়াছিল ঢাকার প্রথম অতিরিক্ত জজের আদালতে। জজ ছিলেন মাননীয় পান্নালাল বসু। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে আগস্ট ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। এই দিনেই জজ বাদীর অনুকূলে তাঁহার ঐতিহাসিক রায় দেন। 'ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা'—কোন বিষ প্রয়োগে হত্যা

বা হত্যার চেষ্টার মামলা নয়। ইহা পরিচিত ও 'স্বত্ব সবস্তর' মামলা। ঢাকা অঞ্চল যখন ভাওয়াল সন্ন্যাসীকে লইয়া উত্তাল, তখন, অনেক ইস্তাহার পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা অধিকাংশ সন্ন্যাসীর পক্ষে; চারটি দৈনিকও প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি বইয়ের জন্য, ডাঃ আশুতোষ দাশগুপ্তের মানহানির অভিযোগে, লেখক ও মুদ্রাকরের সাজা হইয়াছিল। তাহাতে ডাঃ দাশগুপ্ত বিষপ্রয়োগ করিয়াছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছিল।

'ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা' ভিন্ন জাতের এক চাঞ্চল্যকর মামলা। কিন্তু 'আইন' তার নির্দিষ্ট পথে চলে বলিয়াই মেজোকুমারের পরিচয় ঠিক করিতে সব ঘটনা-প্রসঙ্গকেই আনিতে হয়। মেজোকুমারের পক্ষে মেজোকুমারকে লইয়া ১,০৬৯ জনের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৭৩ জন প্রজা সহ ৯৬৭ জনই বলিয়াছেন—ইনিই মেজোকুমার। মেজো রাণীর পক্ষে ৪৭৯ জন সাক্ষী; তন্মধ্যে ৩৭৪ জন বলিয়াছেন, 'ইনি মেজোকুমার নন'।

জজ পান্নালাল বসু মহাশয় অসাধারণ দক্ষতায় বিবাদী পক্ষের সমস্ত তথ্য, জবানবন্দী, বিবৃতি, প্রেসক্রিপসান্, দলিলপত্র বিশ্লিষ্ট করিয়া একটি অপরিহার্য উপসংহারেই পৌছাইয়াছেন—

"আমি সযত্নে সমগ্র সাক্ষ্য বিবেচনা করেছি। সনাক্তকরণের প্রশ্নে অনেক কথাই হয়তো অসম্পূর্ণ থেকেছে। কিন্তু একটা তথ্যই সব কিছুকে ম্লান ক'রে দিতে পারে। সনাক্তকরণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যে আমি বিশ্বাস করেছি। সমাজের সমস্ত স্তরের সাধু প্রকৃতির সৎমানুষেরা সাক্ষ্য দিয়েছেন, এমন সব শিক্ষিত মানুষও যাঁরা নিছক রোমাঞ্চ-তাড়িত নন বা একটা প্রতারককে সমর্থন ক'রে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যের ঝুঁকি নেবার মানুষ নন। বাদীর শরীরের সমস্ত চিহ্নই যাচাই করা হয়েছে, অবয়ব ইত্যাদির, একাস্ততা অঙ্কের মত নির্ভুল। ১৯২১-এর ৪ঠা মের আগে কোন ষড়যন্ত্র হয়েছে এমন কোন প্রমাণও কেউ উপস্থিত করিতে পারেন নি। এই আত্মপরিচয়ের ২৪ দিন পর ২৯শে তিনি কালেক্টরের সামনে উপস্থিত হন। ১৯২১-এর মে থেকেই তাঁর বোনেরা তদন্তের আবেদন জানিয়ে আসছেন। জমিদারীতে অনেক বিঘ্ন ঘটেছে; তাঁর নামে চাঁদা উঠেছে, খাজনা বন্ধ হয়েছে; কিন্তু তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়নি। কোন কিছুরই সম্মুখীন হতে চান নি রায়

সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বাহাদুর, মেজোরাণীর দাদা। তিনি বোনের বকলমে মেজকুমারের সম্পত্তি ভোগ করছিলেন। তিনি সব কিছু অস্বীকারের, প্রতিবন্ধকতা-সৃষ্টিরই চেষ্টা করেছেন। মেজরাণীর নিজের ইচ্ছা বলে কিছু ছিল না।

অতঃপর জজ পান্নালাল বসু সাধুকেই মেজকুমার বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং তাঁহার সম্পত্তির অধিকারে অনুকূল ডিগ্রী জারী করেন। হাইকোর্টেও এই রায় বহাল থাকে।

নিঃসন্দেহে 'ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা'—পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মামলা এবং দীর্ঘতম মামলা। এই মামলার রায় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

এই মামলার সঙ্গে যে রাজপরিবারের ইতিহাস এবং উত্থান-পতন যুক্ত তাঁহার সঙ্গে স্বভাবকবি গোবিন্দদাসের পরিচয় অনেক দিনের। বলতে গেলে, এই রাজপরিবারের ছত্রছায়ায় কবি গোবিন্দদাস যেমন লালিত-পালিত, তেমনি আবার অন্যায় বিচারে ও অত্যাচারে জন্মভূমি ভাওয়াল হইতে নির্বাসিত। তাই ভাওয়াল প্রসঙ্গে আসে "ভাওয়াল কবি গোবিন্দদাস" এবং "ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা'র কথা। এই দুইটি বিষয় না জানিলে "ভাওয়ালের" উপর কোন গবেষণা বা আলোচনা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তাই স্বভাবকবি গোবিন্দদাস প্রসঙ্গেই "ভাওয়াল সন্ন্যাসী মামলা"র একটা রূপরেখার পরিচয় দিলাম। "ভাওয়ালের" একটা ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয় আর দশটা পরগণার মতই ছিল। কিন্তু ভাওয়ালের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস ও ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার ইতিবৃত্ত হইতে।

---

*ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠা হইতে সংগৃহীত।

পরিশিষ্ট—ছ

॥ ভাওয়াল-জয়দেবপুরের মানচিত্র ॥

বাংলাদেশে ভাওয়াল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—"(১) এই বিভাগের উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, পূর্ব সীমা লক্ষ্মীনদী মহেশ্বরদী এবং সোনার গাঁও; দক্ষিণ সীমা বুড়ীগঙ্গা নদী, পশ্চিমসীমা তুরাগনদী এবং চন্দ্রপ্রতাপ।"*

(২) এই বিভাগের দক্ষিণাংশে ঢাকা নগরী অবস্থিত। জয়দেবপুর, টৌক, টঙ্গা, রূপগঞ্জ, কাপাইসা, ডেমরা, একডালা এবং জামালপুর প্রসিদ্ধ গ্রাম।

(৩) ভাওয়াল পরগণার—

গ্রামসংখ্যা—২,৭৯৩।

জমি প্রায়—৫৭৯ বর্গমাইল অর্থাৎ

১১,২০,৯৪৪ বর্গ বিঘা ভূমি

লোক সংখ্যা—৬৫,৩৮৬। তন্মধ্যে

হিন্দু—২৭,৬০৫

মুসলমান—৩৭,৭৮১

(৪) (ক) ভাওয়ালে **ভদ্রলোকের** সংখ্যা অল্প।

(খ) ভাওয়ালে অধিকাংশ **ভূমিই পতিত** ও **জঙ্গলময়**। **উচ্চ** এবং **সর্বত্র সমতল নহে**।

(গ) ভাওয়ালে কোনও বৃহৎ নদী নাই—কেবল 'বালু' ও টঙ্গী নদী নাম্নী দুইটি ক্ষুদ্র নদী আছে।

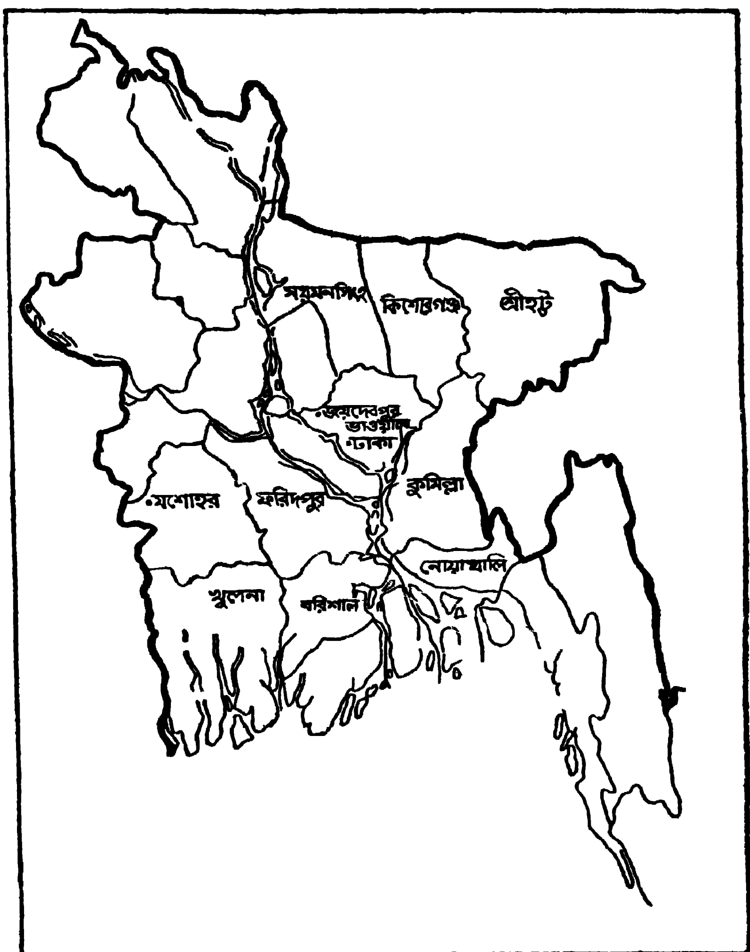
(ঘ) জয়দেবপুরের কিয়দ্দূর উত্তর হইতে উত্তরে বহুদূর পর্যন্ত **"গজার"** বৃক্ষে পরিপূর্ণ। [পূর্ববঙ্গে শালবৃক্ষ 'গজারী' নামে অভিহিত।]

(ঙ) জঙ্গলে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মহিষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বাস করে।

(চ) ভাওয়ালে হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী, বনুয়া প্রভৃতি বাস করে। এখানকার **বংশী** ও **কোচ** নামক দুইটি পার্বত্য জাতি উল্লেখযোগ্য।

---

* "ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ"—প্রসন্নকুমার ভৌমিক কর্তৃক মুদ্রিত, পৃঃ ৪।



ভাওয়াল-জয়দেবপুরের মানচিত্র

পরিশিষ্ট—জ

॥ প্রমাণপঞ্জী ॥

(বর্ণনানুক্রমিক)

১। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম ও ২য় খণ্ড)।

২। ঐ —আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)।

৩। অমূল্যধন রায়ভট্ট—বৈষ্ণব-চরিত অভিধান।

৪। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৫। অক্ষয়কুমার মৈত্র—ফিরিঙ্গি বণিক।

৬। অমিয় বসু—বাংলায় ভ্রমণ (১ম ও ২য় খণ্ড)।

৭। অমরেন্দ্রনাথ রায়—স্বর্গীয় কবি গোবিন্দচন্দ্র। 'ভারতবর্ষ', পৌষ, ১৩৩৫।

৮। অক্ষয়কুমার মৌলিক বিদ্যাভূষণ—স্মৃতি পূজার কথা। 'নব্যভারত', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৯। অমৃতলাল চক্রবর্তী—গোবিন্দ প্রসঙ্গে। 'সৌরভ', আষাঢ়, ১৩২৬।

১০। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

১১। আনন্দচন্দ্র রায়—বারভূঞা।

১২। ডঃ উমা রায়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব।

১৩। কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—মধ্যযুগে বাঙ্গালা।

১৪। কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য।

১৫। ঐ —বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়।

১৬। কালীপদ দাস—চারণকবি মুকুন্দদাসের গীতাবলী।

১৭। কেদারনাথ মজুমদার—ময়মনসিংহের বিবরণ।

১৮। কামিনীকুমার সেন—পূর্ববঙ্গের স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

১৯। কৃষ্ণদাস কবিরাজ—চৈতন্যচরিতামৃত। পণ্ডিত সীতাপতি ভট্টাচার্য সম্পাদিত (৩য় সং)।

২০। খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত—পদামৃত মাধুরী।

২১। ঐ —বৈষ্ণব রস-সাহিত্য।

২২। ডঃ ক্ষুদিরাম দাস—বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি।

২৩। ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার সাধনা।

২৪। ঐ —বাংলার বাউল।

২৫। গোপাল হালদার—বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড)।

২৬। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী—কবি গোবিন্দদাস। 'বীরভূমি', চৈত্র, ১৩১৮।

২৭। জীবনবল্লভ চৌধুরী—স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। 'নতুন বাংলা', শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৭৫।

২৮। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার—বংশ-পরিচয় (৩য় খণ্ড)।

২৯। জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়—অনাহারে মরণ। 'নব্যভারত', আষাঢ়, ১২৯৯।

৩০। তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্ত—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।

৩১। ঐ —প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা।

৩২। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী—নব্যভারতের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস।

৩৩। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম ও ৫ম খণ্ড)।

৩৪। ঐ —বঙ্গ-সাহিত্য পরিচয়।

৩৫। ঐ —বৃহৎ বঙ্গ।

৩৬। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল—বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস।

৩৭। ডঃ নীহাররঞ্জন রায়—বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)।

৩৮। নিখিলনাথ রায়—যশোহর-খুলনার ইতিহাস।

৩৯। নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙ্গালী।

৪০। নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ অভিধান।

৪১। প্রমথনাথ তর্কভূষণ—বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম।

৪২। প্রসন্নকুমার ভৌমিক—ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক বিবরণ।

৪৩। বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড—চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।

৪৪। বৃন্দাবনদাস—শ্রীচৈতন্যভাগবত। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত।

৪৫। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান (১ম ও২ য় সং)

৪৬। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা—১৩০৪, ১৩০৮, ১৩১৮, ১৩২২, ১৩৪২।

৪৭। বিষাদ-কালিমা। 'নব্যভারত', আষাঢ়, ১৩০৪।

৪৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—গোবিন্দচন্দ্র দাস।

৪৯। ঐ —কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

৫০। ভূদেব চৌধুরী—বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা।

৫১। ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। (১ম পর্যায়)।

৫২। মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য (১ম খণ্ড)

৫৩। যদুনাথ দাস—শাখানির্ণয়ামৃতম্।

৫৪। যতীন্দ্রমোহন রায়—ঢাকার ইতিহাস।

৫৫। রামগোপাল দাস—শাখাবর্ণন।

৫৬। রাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী—কবি গোবিন্দদাস। 'নব্যভারত', অগ্রহায়ণ, ১৩২৫।

৫৭। লোচনদাস—চৈতন্য মঙ্গল। মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত।

৫৮। শিবরতন মিত্র—জাতীয় কবি গোবিন্দদাস। 'নব্যভারত', কার্তিক, ১৩৩১।

৫৯। শঙ্করীপ্রসাদ বসু—মধ্যযুগের কবি ও কাব্য।

৬০। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা।

৬১। ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ ৩য় সং)।

৬২। ঐ —মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী।

৬৩। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা।

৬৪। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—প্রাচীন বাংলার গৌরব।

৬৫। হেমচন্দ্র চক্রবর্তী—স্বভাবকবি গোবিন্দদাস।

৬৬। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—কংগ্রেস।

৬৭। হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়—আমরা বাঙ্গালী।

৬৮। হরিদাস দাস—বৈষ্ণব অভিধান (১ম-৪র্থ খণ্ড)।
৬৯। ঐ —গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন।
৭০। ঐ —গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ।
৭১। Ajit Kumar Mukherjee—Folk Art of Bengal.
৭২। B. C. Allen—Eastern Bengal District Gazetteers.
৭৩। Bengalee, 4th March, 1893 ; No. 9.
৭৪। Bengalee, 8th April, 1893 ; No. 14.
৭৫। Sir Jadunath Sarkar—History of Bengal (Vol. II), Dacca University Publication, 1948.
৭৬। Dr. Radhakamal Mupherjee—The Changing Face of Bengal,

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

